এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

এটি এক সমাজচ্যুত নারীর আত্মকথা। এই আত্মকথা আমাকে অন্তত তিনবার কাঁদিয়েছে। মূল উর্দু বইটি যখন নিজের জন্য পড়ছিলাম, তখন একবার। যখন পাঠকের জন্য বাংলায় অনুবাদ করছিলাম, তখন একবার। এরপর অনূদিত কপিটি যখন পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে পাঠ করছিলাম, তখন আরেক বার।

আমি এর উর্দু কপির সন্ধান পেয়েছিলাম ইন্টারনেটে। তারপর অনলাইনেই পড়া শুরু করেছিলাম। নেশায় পড়ে লেখালেখির নিয়মতান্ত্রিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু তা-ই নয়, ওই দিনগুলোতে ঢাকা শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার। রাস্তায় ছিল প্রচণ্ড যানজট। তখন মোবাইলের স্ক্রিনে এই বইটি পড়ছিলাম, আর যানজটের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন কি সিট না পেয়ে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও পড়েছিলাম বইটি এবং একসময় মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেলে ভীষণ কষ্টও অনুভব করেছিলাম।

সমাজচ্যুত এই নারীর আত্মকথায় উঠে এসেছে এক করুণ ইতিহাস। ক্রমাগত এমন ইতিহাস দুনিয়াকে গ্রাস করছে। আমাদের দেশেও নিয়মিত রচিত হচ্ছে এমন হাজার কাহিনী।

তরুণ সমাজের জন্য এই বইয়ে রয়েছে শেখার মত অনেক বড় সবক। অভিভাবকদের জন্যও রয়েছে অনেক দিকনির্দেশনা। শুধু এজন্যই আমি বইটি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছি। আশা করি আপনিও বই পড়বেন।

-মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

design : print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

[আলেমে দীন, লেখক, অনুবাদক, মুহাদ্দিস ও খতীব]

পিতা: মাওলানা মুহাম্মাদ এমদাদুল্লাহ রহ.

মাতা: মুসাম্মাত হালীমা খাতুন

পিতামহ: হাজী আবু তাহের আনসারী রহ.

জন্ম: ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ ইং

পিতামহ ছিলেন সিরাজগঞ্জ-বগুড়ার মাদরাসাশিক্ষার পথিকৃৎ। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বহু মাদরাসা। সেগুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জের বেতুয়া মাদরাসা, আলিমপুর মাদরাসা, দত্তবাড়ী মাদরাসা ও বাগবাটী মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পিতা মাওলানা এমদাদুল্লাহ ছিলেন খতীব, মুহাদ্দিস ও হাকিমী চিকিৎসক। তিনি শিক্ষকহিসাবে প্রায় আজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন সিরাজগঞ্জের খুকনী দারুল উলুম মাদসারায়।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীমের লেখাপড়ার হাতেখড়ি খুকনী দারুল উলুমেই। আর সমাপ্তি ঢাকা'র ফরিদাবাদ মাদরাসায়। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় দাওরায়ে হাদীসে মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করার মাধ্যমে।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লিখছেন এবং (আরবী-উর্দু থেকে) অনুবাদ করছেন। মাঝখানে কিছু বইপুস্তক সম্পাদনাও করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

হুদহুদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তাঁর কিছু বই–

- ইতিহাসের সূর্যোদয়
- নারীসমাজের ভুল ও প্রতিকার
- জীবন উপভোগ করুন (Enjoy Your Life)
- পরকাল (Life After Life)
- মৃত্যুর বিছানায়
- আমি যেভাবে পড়তাম
- হে আমার ছেলে
- প্রিয় বোন, হতাশ হয়ো না

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম বর্তমানে জামালুল কুরআন মাদরাসা, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-এর মুহাদ্দিস এবং পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদের খতীব।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হোসাইন

পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

আমি কারও মেয়ে নই

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

প্রকাশনা
৪৮ [আটচল্লিশ]

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৮

প্রকাশক
রুহামা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২৬০ টাকা মাত্র

সূচি

আমাদের কৈফিয়ত

এটি সমাজচ্যুত এক নারীর আত্মকথা। এই আত্মকথা আমাকে অন্তত তিনবার কাঁদিয়েছে। মূল উর্দু বইটি যখন নিজের জন্য পড়ছিলাম, তখন একবার। যখন পাঠকের জন্য বাংলায় অনুবাদ করছিলাম, তখন একবার। এরপর অনূদিত কপিটি যখন পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে পাঠ করছিলাম, তখন আরেক বার।

আমি এর উর্দু কপির সন্ধান পেয়েছিলাম ইন্টারনেটে। তারপর অনলাইনেই পড়া শুরু করেছিলাম। নেশায় পড়ে লেখালেখির নিয়মতান্ত্রিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু তা-ই নয়, ওই দিনগুলোতে ঢাকা শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার। রাস্তায় ছিল প্রচণ্ড যানজট। তখন মোবাইলের স্ক্রিনে এই বইটি পড়ছিলাম, আর যানজটের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন কি সিট না পেয়ে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও পড়েছিলাম বইটি এবং একসময় মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেলে ভীষণ কষ্টও অনুভব করেছিলাম।

সমাজচ্যুত এই নারীর আত্মকথায় উঠে এসেছে এক করুণ ইতিহাস। ক্রমাগত এমন ইতিহাস দুনিয়াকে গ্রাস করছে। আমাদের দেশেও নিয়মিত রচিত হচ্ছে এমন হাজার কাহিনী।

তরুণ সমাজের জন্য এই বইয়ে রয়েছে শেখার মত অনেক বড় সবক। অভিভাবকদের জন্যও রয়েছে অনেক দিকনির্দেশনা। শুধু এজন্যই আমি বইটি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছি।

বইটি আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান হুদহুদ প্রকাশন থেকে ছেপে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আশা করি, হুদহুদের অন্যান্য বইয়ের মত এটিও আপনারা পরম আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবেন।

এখানে পাঠককে একটি কথা মনে করিয়ে দিই। হুদহুদের বই প্রচুর পরিমাণে নকল হচ্ছে। এজন্য কেনার আগে হুদহুদের বই কি না, তা একটু নিশ্চিত হওয়ার চেস্টা করুন। কেউ হয়তো বলবেন, আপনাদের বইতে যা থাকে, নকল বইতেও তা-ই থাকে। তা হলে নকলটা কিনলে অসুবিধা কীসের?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে না নিয়ে আপনার মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে গ্রহণ করুন। তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, জনাব! কেউ যদি সহীহ বুখারীর একটি কপি চুরি করে আনে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে, তা হলে কি তার ফায়দা হবে না?

ব্যাপারটা এখানেই। কোন বিষয়ের গোড়ায় যদি একটু হারামের মিশেল থাকে, তা হলে সেখান থেকে আর যা-ই হোক, রূহানী উন্নতির আশা করা বোকামী। এজন্য বর্তমান যুগে বইপুস্তকের ক্রয় আর অধ্যয়ন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আখলাক-চরিত্রের পতন আরও বেগবান হচ্ছে। আপনি আবারও বলতে পারেন যে, এমন হারামের মিশেল কেউ দিয়ে থাকলে, সে-ই দায়ী থাকবে; আমাদের কী?

আপনার করণীয় এতটুকু যে, নকলবাজকে সহায়তা করা থেকে বিরত থাকুন। পরোক্ষ হারামকে নিরুৎসাহিত করুন। বই পাঠ করে রূহানী উন্নতির শিখরে আরোহন করুন।

নকল এড়াতে বইয়ের লেখক ও অনুবাদকের পরিচিতি যাচাই করুন। প্রকাশের সন ও বারকোড দেখুন। প্রয়োজনে আমাদের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হোন।

আলহামদু লিল্লাহ। হুদহুদ কোন নকল বই ছাপে না। হুদহুদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার আগ থেকেই যদি কোন বইয়ের অনুবাদ বাজারে বর্তমান থাকে, তা হলে হুদহুদের অনুবাদ সেটার সাথে মেলালেই

প্রমাণিত হবে যে, নতুন করে তরজমা করা হয়েছে এবং আগেরটার চেয়ে উন্নত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ বইটি, অথবা হুদহুদের যেকোন বই অধ্যয়নের পর যদি আপনার কোন পরামর্শ, অভিযোগ কিংবা আপত্তি থাকে, তা হলে মোবাইলের মেসেজ, ফেসবুক বা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন।

বইটি পড়ে যদি আমাদের দেশের কোন একজন তরুণ-তরুণীও জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়, তা হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মেহনত কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন, ঢাকা
১ লা রবিউল আওয়াল, ১৪৩৯ হি. ২০/১১/১৭ ইং
মোবাইল: ০১৭১৭ ০৬৮৭৬২ (কথা বলার সময় আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।)

পরিচিতি

তিনি আমাকে নিজের নাম বলেননি। তার নির্দিষ্ট কোন ঠিকানাও নেই। ১৯৭০'এর জুলাইয়ে এক বন্ধু মারীতে প্রথম বার এই নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দেখায় আমি তাকে এতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলাম যে, ইনি একজন সুন্দরী এবং উঁচু পর্যায়ের পতিতা নারী।

বন্ধুর ইচ্ছা ছিল, আমি যেন এই নারীর জীবনবৃত্তান্ত লিখি। তিনি জানতেন যে, অন্যায়, সাজা ও সামাজিক সৌন্দর্য আর কদর্যতা আমার পছন্দের বিষয়বস্তু। পেশাদার অপরাধী- যাদের মধ্যে দাসবণিক, পতিতা ও স্মাগ্লার অন্তর্ভুক্ত আছে। আমি তাদের অন্তরীণ দুনিয়ায় গিয়ে দেখেছি, অবলোকন করেছি এবং সেই রহস্যঘেরা আর ভয়ঙ্কর দুনিয়ার নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং তাদের মানসিকতা যাচাই করেছি। আড়াই বছর হাজতখানা, জেলখানা ও বিভিন্ন স্টেশনের মাটি পরখ করেছি। নিজের অভিজ্ঞতা দুটি গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধের আকারে পেশ করেছি, যেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আর সাময়িকীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এই নারীর সাথে দেখা হলে তার জগতের তার মত আরও কয়েক জন নারীর কথা আমার মনে পড়ে গেল, যারা তার মতই সুশ্রী ও আকর্ষণীয়া ছিল। তাদের চেহারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু কাহিনী সবার অভিন্ন। আমি এই নারীকেও সেই কাহিনীর অংশ মনে করলাম। আমি তখন 'হেকায়েতে'র প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রথম সংখ্যার প্রস্তুতির জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছিলাম। এই মহিলার কাহিনী ছিল অনেক দীর্ঘ। শুনবার ও লিখবার সময় আমার হাতে ছিল না। আমি তাকে

বললাম, আমার প্রথম সংখ্যা হবে সেপ্টেম্বরের যুদ্ধসংখ্যা। তার জন্য আমি সাক্ষাৎকার নিয়ে বেড়াচ্ছি।

'তা হলে আপনি শহীদদের নামে বিসমিল্লাহ করছেন?' তিনি ওজর না শুনেই বললেন। 'আমার কাহিনী এই বিশেষ সংখ্যায় এলে আমার অস্থির আত্মা কিছুটা স্বস্তি পেত। আমার সোহাগ শহীদ হয়ে গেছেন।' একথা বলতে বলতে তার চোখে পানি এসে গেল।

সোহাগ? ... শহীদ? ... একজন পতিতার সোহাগ শহীদ হয়েছেন?

আমি চমকে গেলাম এবং তার জীবন-বৃত্তান্ত শোনার জন্য বসে পড়লাম। কিন্তু বিবরণ এত দীর্ঘ ছিল যে, এক সংখ্যার কয়েকটি পৃষ্ঠায় আঁটানো সম্ভব ছিল না। তবে তার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমার প্রথম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ইং)-এ তার জীবন-বৃত্তান্তের একটি অংশ 'আমি কারও মেয়ে নই' নামে প্রকাশ করে দিলাম। কিন্তু তার সোহাগের শাহাদতের কাহিনী উল্লেখ করা গেল না। কেননা, বিষয়টি ছিল অনেক দীর্ঘ। আমি এই মহিলার কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, আমাকে ডাকবেন। আমি তার পুরো দাস্তান লিপিবদ্ধ করে বইয়ের আকারে ছেপে দিব।

তিনি কোথাও লা-পাত্তা হয়ে গেলেন। ম্যাজিকের মত। নজরে পড়ার পর সাথে সাথে গায়েব। যে বন্ধু তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করিয়েছিলেন, তিনি তাকে খুঁজতে থাকেন। লাগাতার দুই বছর পর্যন্ত। শেষে তাকে পাওয়া গেল। এরপর শুরু হল তার সাথে আমার কানামাছি। কখনও লাহোর থেকে তিনি ফোন করেছেন যে, অমুক জায়গায় আসুন। কখনও মারী থেকে ট্রাঙ্ক কল পাওয়া যায় যে, সন্ধ্যানাগাদ মারী এসে পড়ুন। একবার তিনি করাচীতেও ডেকেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন শহরে প্রায় বিশটি সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় তার সাথে এবং আমি তার সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করি।

যারা এই কাহিনী ১৯৭০'এর সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় পড়তে পারেননি, তাদের জন্য মে ১৯৭৪'এর সংখ্যায় ঘোষণা দিয়ে

ছেপেছিলাম যে, এই কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। আমি এই দাস্তান তার যবানেই পেশ করছি। কোন মতামত বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে এতটুকু অবশ্যই বলব যে, এটা শুধু এই মহিলার জীবন-বৃত্তান্ত নয়, বরং এটা আমাদের সমাজ ও আমাদের বিভিন্ন বদ আমলের বিবরণ।

এই বিবরণ কেন পেশ করছি? এই প্রশ্নের উত্তর এই মহিলার ভাষায় শুনুন-

'আমি এই কাহিনী এজন্য শোনালাম না যে, আপনি আমার উপর অভিশাপ দিবেন, অথবা আমার প্রতি অনুকম্পা দেখাবেন। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ছেলেমেয়ের উপর দয়া করুন। আমার থেকে শিক্ষা নিন। আমার কাহিনী শোনার পর মাথা নীচু করে চিন্তা করুন যে, অভিশাপের উপযুক্ত কি আমি, না কি অন্যকেউ? আমি তো মেথর। যখন আপনার বাড়ির বর্জ্যভরা টুকরি মাথায় নিয়ে আপনার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হই, তখন আপনি নাকে হাত বা রুমাল চেপে দূরে সরে যান।... পতিতাবৃত্তির অপরাধে শুধু আমাকে গ্রেফতার করলে আপনার সোসাইটি পবিত্র হবে না। একটু চিন্তা করে দেখুন যে, বিদেশীরা কীভাবে আপনাদের নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ছাঁচে গড়ে তুলছে। আমার উপর ফতোয়া জারি করার আগে ওইসব জায়গা একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন, যেগুলো আমি শনাক্ত করে দিয়েছি। আমার কাহিনী স্বতন্ত্র বা নতুন নয়। আপনাদের সোসাইটি এমন কাহিনীমালা দিয়ে ভরে আছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমি নিজের দাস্তান শুনিয়ে দিলাম।'

'হেকায়েতে' এই মহিলার কাহিনী দুইবার প্রকাশিত হলে 'হেকায়েতে'র ঠিকানায় তার নামে অসংখ্য চিঠি আসে। তাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তি মহিলাকে তওবা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী করার পরামর্শ দেন এবং তারা সুসংবাদ শোনান যে, খোদা তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। দুইজন আবেগী জোয়ান ওইসব ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যারা এই মহিলাকে ধোঁকা দিয়েছে। বাকি দুইশত তিন ব্যক্তি মহিলার সাথে শাদী করার খায়েশ প্রকাশ করেন।

আমি তাকে এসব পত্র দেখিয়েছি। তিনি সবগুলো পত্র মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। কোন কোন পত্র পড়ে তিনি মুচকি মুচকি হেসেছেন। কোনটি পড়ে তার মাথায় বাজ পড়েছে। কিছু পত্র এমন ছিল, যেগুলোর ভাষা তার চোখে পানি এনে দিয়েছে। তিনি বললেন, 'এদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জওয়াব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আপনি কখনও পুস্তকটি ছাপেন, তা হলে সেখানে তাদের শোকর আদায় করে দিবেন।' তিনি আমাকে তার শহীদ ক্যাপটেনের প্রথম ও শেষ চিঠি নিজের এটাচি কেস থেকে বের করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, 'এই একটি চিঠি, যা আমার সাথে কবরে যাবে।'

আমি এই চিঠির ফটোকপি করেছি। চিঠিটি পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে। মহিলার ইচ্ছানুসারে ফটোকপিতে ক্যাপেটেনের নাম দেওয়া হচ্ছে না এবং পুস্তকটি সেই শহীদের নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

এনায়েতুল্লাহ
মহাপরিচালক, মাসিক হেকায়েত
লাহোর

আমি কে?

আমি একটি ফেরেব, আপনাদের বিভিন্ন প্রকার ধোঁকা যাকে জন্ম দিয়েছে। আমার বয়স এখন ত্রিশের উপরে। চেহারায় সেই রওনক এখন আর নেই, যা কয়েক বছর আগেও ছিল। রাত জাগরণ, আর অপকর্ম আমার চেহারায় প্রথম দিকের স্নিগ্ধতা থাকতে দেয়নি; তবে আমার প্রতারণার আকর্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য আসেনি। মানুষ এখনও আমাকে দেখে থমকে যায়। তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে আসে এবং সামনে গিয়েও পেছন ফিরে দেখতে থাকে। নারী যত আবৃত থাকে, ততই তাকে খুবসুরত মনে হয়। সেইসব নারী বোকা, যারা মাথার ওড়না ফেলে দেয়, চুল উদলা রাখে। কাঁধ পর্যন্ত বাজু খোলা এবং বুক অর্ধনগ্ন রেখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এমন প্রদর্শনী নারীর আকর্ষণ নষ্ট করে। রহস্যের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণ। নারী অজানা ভেদ হয়ে, রহস্যময় হয়ে এবং কালো বোরকায় আবৃত হয়ে থাকলে পুরুষ বোকা বনে যায় এবং সেই রহস্য উদ্ধার করার জন্য মুখের দাবি অনুসারে মূল্য প্রদান করে। শুধু একপলক দেখার জন্য শতশত বার তদবীর করে।

যদি কোন বাগানে, কোন বাসস্টপেজে, মারীর মাল রোড, লাহোর বা করাচীর কোন আকর্ষণীয় স্থানে আপনি কোন নারীকে নাকমুখ কালো বোরকা আর নেকাবে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান, যার শুধু শুভ্র কপাল দেখা যায়, যেই কপালের উপর কিছু চুল দোল খাচ্ছে, আর তার ডাগর ডাগর চোখদুটি আপনাকে দেখে মিটমিটিয়ে হাসছে এবং খুব সূক্ষ্ম চালে আপনাকে ইশারা দিচ্ছে, তা হলে পথিমধ্যে থেমে তাকে দেখবেন না এবং তার কাছেও যাবেন না। কেননা, সে একজন

ডাইনি হয়ে থাকবে, যে আপনাকে কখনও ছাড়বে না। সে আমি হয়ে থাকব। আমি আমার সোহাগ ধ্বংস করেছি। এখনও সোহাগ ধ্বংস করে বেড়াচ্ছি।

আমি পেটের দায়ে পতিতা নই। আমি বাজারে উপবিষ্টা রেণ্ডী নই। আমি উপন্যাস রচয়িতার বেশ্যা নই। আমি সেই নারীর প্রেতাত্মা, যাকে খোদা মেয়ের নিষ্পাপ রূপ দিয়ে জমীনে পাঠিয়ে ছিলেন এবং যার পদতলে জান্নাত রেখেছিলেন। আমার অনুসিন্ধুৎসুরা আমাকে মর্তের হুর মনে করে; কিন্তু আমি কালো বোরকায় আবৃত জাহান্নাম। আমি সম্মানিতা নারীর বিভ্রান্ত আত্মা। প্রশ্ন আমি কে?

আমার নাম কী?

আমি কোথায় থাকি?

কার মেয়ে, কার বোন, আর কার স্ত্রী?

আমার কাহিনীতে এসব প্রশ্নের কোন একটির উত্তরও আপনি পাবেন না। এসব প্রশ্ন আমি এখন আর জরুরী মনে করি না। আপনি জেনেই বা কী করবেন? আমি কোন জায়গার বাসিন্দা অবশ্যই; কিন্তু এখন কোন এলাকারই বাসিন্দা নই। এক মা, এক বাপ এবং দুটি ভাইয়ের বোন। আমি একজনের স্ত্রীও ছিলাম। স্বামী জীবিতও আছে এবং তিনি এখনও স্বামী; তবে অন্যকারও। আমি কারও স্ত্রী হয়ে থাকতে পারিনি। আমার প্রতিটি রাত মধুরাত হয়ে থাকে এবং প্রতিটি ভোর ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসে। নিজের মা, নিজের বাবা, নিজের ভাই ও স্বামীর জন্য বাঁচতে গিয়েই মরেছি। স্বামীর কাছ থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছি, তখন আমি তার কাছে দেনমহর ও মাসিক খরচ দাবি করিনি। তালাকের দায় আমার উপরই বর্তায়। আমি কোন শরীফ লোকের স্ত্রী হওয়ার যোগ্য ছিলাম না।

আমার নাম? হাঁ, আমি যখন জন্ম নিয়েছিলাম, তখন মাবাবা আমার নাম রেখেছিলেন। আমার মহল্লা, আমার সমাজ অনেক দিন হয়, সেই নামের উপর থুথু নিক্ষেপ করেছে। আমি নিজেই সেই নাম স্মৃতির ফলক থেকে মুছে ফেলেছি। এখন আমার কোন নাম নেই।

আমার খদ্দেররা যার যার পছন্দমত আমার নাম রেখে দিয়েছে। সারগোধার এক জমীদার গ্রীষ্মকালে মারী আসেন। পনেরো-বিশ দিন আমাকে সঙ্গে রাখেন। তিনি আমাকে বিল্লু বলে ডাকেন। ইসলামাবাদের এক ডিপটি সেক্রেটারী আমাকে মুন্নী বলেন। গুলবার্গের শাহযাদা আমাকে সুইটি বলেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত এক খদ্দের আমাকে জানও বলেছিলেন। বয়স্ক খদ্দেররা খুব আজব আজব নামে আমাকে সম্বোধন করে থাকেন।

নাম আমার একটিই পছন্দ হয়েছিল। আমি কখনও কখনও নিজের সাথে কথা বলি। তখন আমি নিজেকে সেই নামেই সম্বোধন করি। এই নাম হচ্ছে 'যীবী' । পাকসেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন আমাকে এই নাম দিয়েছিলেন। ইনিই প্রথম ও শেষ ব্যক্তি, যাঁকে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কামনা করেছিলাম। তিনি আমার খদ্দের ছিলেন না। আমার জালে তিনি ফেঁসে গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি কাছে আসার পর আমি তাঁর জালে ফেঁসে গিয়েছিলাম। তিনি আমার ভিতরে বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। বলতে পারব না, তাঁর কাছে যীবী নাম কেন পছন্দ ছিল। তিনি আমাকে যীবী বলতে লাগলেন, তখন এই নাম আমার কাছেও ভালো লাগতে শুরু করল। আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন নিজের ফরয কাজ সম্পন্ন করার পর শাদী করতে। ১৯৬৫'এর আগস্টে একথা বলে তিনি অধিকৃত কাশ্মীর চলে গেলেন। বলেছিলেন, ফিরে এসে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলব; কিন্তু ফিরে আসেননি। আজ পর্যন্ত আসেননি। আর কোন দিন আসবেনও না। অধিকৃত কাশ্মীরে তিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁর পূর্ণ গল্পটা সামনে গিয়ে শোনাব। তাঁর কথা মনে হলে আমি কষ্ট পেতে থাকি। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে যে, নিজেকে শহীদের স্ত্রী বলতে পারলাম না। এখন নিজের সত্তার সাথে কোন শহীদের সংযোগ করতে লজ্জাবোধ হয়।

এমনিতে আমার পুরো জীবনই বেদনাদায়ক। তারপরও আমার জীবনে এমন কিছু মুহূর্তও আছে, যেগুলো দুঃখবেদনায় টুইটম্বুর। প্রথম দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলাম শৈশবে। শিখরা আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে

দিয়েছিল। আমাদের স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং আমরা পায়ে হেঁটে পাকিস্তানে এসেছিলাম। চার বছর আগে আমার পিতা মারা গেছেন। বেচারা সময়ের আগেই বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার চিন্তা ভিতরে ভিতরে পুষতেন। একথা সম্পূর্ণই সঠিক যে, মেয়ের বাবার ইজ্জত কাঁচা সুতোয় ঝুলে থাকে। যুবতী মেয়ে যেকোন সময় এই সুতো ছিঁড়ে ফেলতে পারে। আমিই ছেলেবেলায় বাবার ইজ্জতের সুতো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। এই রোগই তাঁকে এত তাড়াতাড়ি কবরে নিয়ে গেল। আমার দুঃখ শুধু এটুকু নয় যে, আমার পিতা ফৌত হয়ে গেছেন। এই দুঃখও আছে যে, আমি তাঁকে মরতে দেখিনি। তাঁর মৃতদেহ দেখিনি। মাকে কাঁদতে দেখিনি। এর কিছুদিন আগে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

বাবার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে হাহুঁতাশ করতে পারনি। ভাইদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারিনি। আমি তাঁর মুখ দেখিনি। বলতে পারব না, মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে স্মরণ করেছিলেন কি না। হতে পারে, শেষ সময়ে তিনি খোদার শোকর আদায় করে থাকবেন। কেননা, তিনি এই দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছিলেন। আমার অপবিত্র অস্তিত্বই ছিল তাঁর রোগ। আমার পাপের দায় তাঁর উপরও বর্তায়; কিন্তু এখন আমি সবার গুনাহ নিজের হিসাবে লিখে নিয়েছি।

আমার শৈশব মরে গেল

ঘটনাচক্রে আমি আমার বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম। আমি তো আমার পরিবার, মহল্লা ও সমাজের জন্য ভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কখনও কখনও একেক জনকে দেখে ফেলতাম; আমাকে কেউ দেখত না। একদিন আমার এক পুরনো সখীকে দেখে ফেললাম। আমি সইতে পারলাম না। আমি একটি বাগানে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। চেনাজানা লোকজন নজরে পড়ছিল। কিন্তু বোরকার কারণে কেউ আমাকে চিনতে পারছিল না। সখীকে দেখার পর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। এই সখী ছিল আমার খুব প্রিয়। আমি তাকে থামালাম। চেহারা থেকে নেকাব সরালাম না। তাকে ডাক দিলে সেও আমাকে চিনে ফেলল। প্রথমে সে অবাক হল, তারপর কাঁদতে শুরু করল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কোথায় থাকি? বিয়ে করেছি কি না? স্বামী কেমন? বাড়ি আসি না কেন?

আমি তাকে মিথ্যা জওয়াব দিলাম। আমি তাকে বললাম যে, বিয়ে তো করিনি, তবে স্বামীর কোন অভাব নেই। সে আমাকে জানাল যে, আমার পিতা মারা গেছেন। আমাদের মহল্লায়ই সে থাকত। সে আমাকে আরও জানাল যে, আগামী কাল দশটায় জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। আমি পরের দিন দশটায় কবরস্তানের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় একঘণ্টা পরে জানাযা এল। আমার দুই ভাই এবং মহল্লার অনেক লোকজনকে দেখলাম। আমি বোরকার ডাবল নেকাব ফেলে ছিলাম। জানাযা দেখে আমি দ্রুত হেঁটে কবরস্তানে উপস্থিত হলাম। কবরস্তান দূরে ছিল না। সেখানে গিয়ে জানাযার জায়গার কাছে একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। যখন আমার পাশ

দিয়ে জানাযা অতিবাহিত হল, তখন অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম। দৌড়ে গিয়ে বাবার পায়ে পড়ে মাফ চাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। বাপবেটির দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এমনই ছিল শেষ সাক্ষাৎ। আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম এবং খুব কষ্টে কান্না নিয়ন্ত্রণ করলাম। আমি সেই কবরের মাথার দিকে বসে পড়লাম, যেটার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মা বিধবা হয়ে গেছেন। আমি সেই অচেনা কবরের উপর হাত রেখে এত কাঁদলাম যে, হেচকি বন্ধ হয়ে গেল। ঘর থেকে উধাও হওয়ার সময়কাল তখন চার-পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পর আমার ভাইদেরকে দেখছিলাম, এমতাবস্থায় যে, আমার বাবার জানাযা আমার কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

একটু এগিয়ে গিয়ে আমার এক ভাই জানাযা কাঁধে নিল। তখন আমার সেই সময়ের কথা মনে পড়ে গেল, যখন আমার বাবা আমাকে কাঁধে নিয়ে পাকিস্তানের সীমানায় দাখিল হয়েছিলেন। সে ছিল ১৭ আগস্ট ১৯৪৭'এর বিকাল। তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। এই দুই ভাই-ই সাথে ছিল। তখন একজনের বয়স এগারো, আরেক জনের ষোলো। হিন্দুস্তানের পানির শেষ ঢোক পান করেছিলাম পাকিস্তান সীমান্তের দুই-তিন মাইল দূরের একটি নোংরা ঝিল থেকে। আমি আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত একজন বেশ্যা, আব্রুবিক্রেতা। অনেকে বলে, আমার মত বেশ্যাদের দীনধর্ম আর কৃতিত্ব বলতে কিছু নেই; তবে আমি আগস্ট মাসের ইজ্জতের কথা ভুলতে পারি না। আগস্টের শহীদদের কথা ভুলতে পারি না, যারা পাকিস্তানের নামে প্রাণ দিয়েছেন; জীবিত ভস্ম হয়েছেন; হিজরতের পথে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। এসব কথা আগস্ট মাসে এতই মনে পড়ে যে, আমি কয়েক দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকি।

আমার ভালোবাসাও আগস্ট মাসে শহীদ হয়েছেন। আমি ৬৫'এর আগস্টে তাঁকে নিজ হাতে অধিকৃত কাশ্মীরের পথে খোদাহাফেয বলেছিলাম। আগস্টের বর্ষণকে মানুষ প্রেমময় বলে থাকে। শ্রাবণকে কবিসাহিত্যিকরা প্রেমভালোবাসার সঙ্গো জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যখন

শ্রাবণ মাস বৃষ্টি বর্ষণ করে, তখন আমি বলি, আসমান কান্নাকাটি করছে।

আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আগস্ট ১৯৪৭'এর সমস্ত বিবরণ না শোনাব, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের কাহিনীকে পরিপূর্ণ মনে করব না। হিন্দুস্তানের একটি গান্দা ঝিলের কথা আমি বলে এসেছি। আমি সেখান থেকে পানি পান করেছিলাম। সেখান থেকে পনেরো মাইল দূরে একটি বড় গ্রাম আছে। আমি সেটার নাম বলব না। দুই ভাইয়ের পরে আমি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার জন্মের পর আমার মাবাবা আনন্দোৎসব করেননি। আমাদের এখানে মেয়ের জন্মের পর আনন্দোৎসব করা হয় না। কোন কোন ঘরে মাতমও করা হয়। মাবাবার ভয় থাকে একটাই যে, মেয়ে যদি আমার মত হয়, তা হলে কাউকে মুখ দেখানোর মত পরিবেশ থাকবে না। যদি আমার মাবাবা আমার জন্মের পর আনন্দোৎসব না করে থাকেন, তা হলে ভালোই করেছেন। বড় হওয়ার পর আমি তাদেরকে বদনাম ছাড়া আর কী দিতে পেরেছি।

আমাদের গ্রামে ছোট একটি স্কুল ছিল। সেটাকে স্কুলই বলি। কেননা, এটা মসজিদ ছিল না; তবে দেখতে ছিল মসজিদের মতই। যতই আমার বয়স বাড়ছে, ততই এই স্কুল আমার স্মৃতিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। মস্তিস্কে এর কল্পনা দিনদিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বুড়োমত একজন উস্তাদ আমাদেরকে আরবী ও উর্দুর কায়দা পড়াতেন। শতকিয়াও মুখস্থ করাতেন। এই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হত। প্রথম শ্রেণিতে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ত। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ক্লাস আলাদা হয়ে যেত। আমরা চাটাইয়ের উপর বসতাম। একটি পুরনো ভবনে ছিল এই স্কুল। গ্রামের মুসলমানরা নিজেরাই এই স্কুল চালাত। ধর্ম ও উর্দু ভাষার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হত। আমি এই স্কুলে প্রথম শ্রেণি পড়েছিলাম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নতি পেয়েছিলাম, যেখানে শুধু মেয়েরা ছিল। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট বোলো জন। ওই সময় মেয়েদেরকে পড়ানোর রেওয়াজ ছিল না। আমার পিতা বলতেন, সেই যামানা বদলে গেছে,

যখন মেয়েদেরকে অশিক্ষিত রেখে বারো-তেরো বয়সে পর্দায় বসিয়ে দেওয়া হত। এরপর তারা সারা জীবন ঘরের বন্দীশালায় কাটিয়ে দিত।

দেশে কী হচ্ছে এবং কী হতে যাচ্ছে, তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। ছয়-সাত বছরের শিশুদের রাজনীতির সাথে কী সম্পর্ক? তবে দেশে যখন রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল, তখন আমার মত কত হাজার বা কত লাখ শিশু যে পিষিয়ে ফেলা হয়েছিল, জবাই করা হয়েছিল এবং জীবিত ভস্ম করে দেওয়া হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। আমি হাজার চেষ্টা করেও শৈশবের ওই দিনের কথা মস্তিষ্ক থেকে বের করতে পারব না, যেদিন শিখরা আমার সেই ছোট্ট স্কুলটিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সে সময় স্কুল খালি ছিল। দুই দিন আগে থেকেই মাবাবা আমাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতিরিক্ত ছুটির কারণে আমরা খুশি হয়েছিলাম; কিন্তু স্কুল কেন বন্ধ সেকথা আমাদেরকে বলা হয়নি। আমার একথাও মনে আছে যে, আমার পিতামাতা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে বাড়ি থেকে দূরে যেতে মানা করে দিয়েছিলেন। আমার পিতা বাড়ি থেকে ষাট মাইল দূরে সরকারী চাকুরি করতেন। অবস্থা খারাপ দেখে তিনি একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। কিন্তু এবার আসার পর তাঁর চেহারার রং ফিকে হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বিষণ্ন ছিলেন।

এরপর সেই দিন এল, যেদিন বাইরে শোরগোল আর দৌড়াদৌড়ি শোনা যেতে লাগল। কেউ বলল, শিখরা আমাদের স্কুল ও দুটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আব্বু বাড়িতে ছিলেন না। আমার দুই ভাইও বাড়িতে ছিল না। আমার মা পর্দা করতেন। তিনি বোরকা ছাড়া বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আমার পরোয়াই করলেন না। আমি তাঁর ভীতি দেখে কাঁদতে লাগলাম। তাঁর পেছনে পেছনে বাইরে বের হলাম। আমার মনে আছে, নারী ও শিশুর কারণে গলি ভরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু পুরুষ লোকও ছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে আমার মা গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমি তাঁকে দেখতে

পেলাম। আমার পিতা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন। মা কাঁদছিলেন এবং ভাইদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলেন। গলির মধ্যে যেসব মহিলা ছিল, তারা চিৎকার করছিল। স্বামী আর ছেলেদেরকে ডাকাডাকি করছিল তারা। বাবা মাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, শিখরা আমাদের স্কুল আর মসজিদগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বললেন, শিখরা গ্রামের মুসলমানদেরকে বলেছে, যদি মুসলমান জীবিত থাকতে চায়, তা হলে তারা যেন সন্ধ্যার আগে এখান থেকে চলে যায়; অন্যথায় সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হবে।

এটা ছিল ১৯৪৭'এর ১৫ ই আগস্টের দিন। সেদিন হিন্দুস্তানে স্বাধীনতার প্রথম দিন পালন করা হচ্ছিল। আমাদের শহরে হিন্দুস্তানীরা দুটি মসজিদ আর একটি স্কুল জ্বালিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার উৎসব পালন করল। পাকিস্তানে এসে আমি জানতে পারলাম, ১৫ আগস্টে পুরো হিন্দুস্তানে হিন্দুস্তানীরা মুসলমানদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে এবং এই রক্তের খেলা অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেদিন আমাদের এখানে শিখরা মুসলমানদের উপর অনেক বড় এহসান করেছিল। কেননা, তারা মুসলমানদেরকে জীবিত বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। তারা বলেছিল, আমরা অনেক ভালো সময় অতিবাহিত করেছি। এজন্য আমরা চাই না যে, আমাদের হাত মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হোক। সতর্কবার্তা হিসেবে শিখরা স্কুল ও মসজিদগুলোতে আগুন লাগিয়েছিল। নিজের ঘর থেকে কে বের হতে চায়। আমি বলতে পারব না, সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত কত মুসলমান বাড়ি থেকে বের হয়ে পাকিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তবে আমরা বের হলাম না।

এরপর ভয়ঙ্কর স্বপ্নের মত কিছু একটার কথা মনে আছে। রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। একটি জোরালো ঝটকা টানে ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন আমাকে কোলে নিয়ে দৌড়াচ্ছিল। আমি চিৎকার করলে বাবা'র আওয়াজ শোনা গেল। তিনি আমাকে আগলে রেখেছিলেন। এসব কী হচ্ছে, ভালো করে বুঝবার জন্য পুরোপুরি

জাগ্রত হতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু শৈশবের ঘুম আমার বিবেককে জাগ্রত হতে দিচ্ছিল না। স্বপ্নের মত আমার মনে আছে, আমার মা ও দুই ভাই সঙ্গে ছিল। একজনের বয়স ছিল বারো বছর, আরেক জনের ষোলো। একথাও মনে আছে যে, খুব শোরগোল, চেঁচামেচি হচ্ছিল এবং অনেক মশাল জ্বলছিল। লোকজন দৌড়াচ্ছিল। আমি কখনও জাগছিলাম; কখনও গভীর ঘুমে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। মনের ভিতরে যে ভয় প্রবেশ করেছিল, তার কথাও মনে আছে।

যখন আমি পুরোপুরি জাগ্রত হলাম, তখন আমার মাথার উপর কোন ছাদ ছিল না। আশপাশে ঘরের কোন দেয়ালও ছিল না। উপরে ছিল আসমান, আর নীচে ছিল জমীন। চারপাশে ছিল খেতখামার ও পতিত জমী। আমি খুব ভীতির মধ্যে অবস্থান করে চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। বড় ভাই আমাকে কাঁধে নিয়ে চলছিল। বাবা, ছোট ভাই ও মা সঙ্গে ছিলেন এবং আমরা সবাই চলছিলাম। আমাদের সামনেও কয়েকটি পরিবার চলে যাচ্ছিল এবং কিছু পরিবার আমাদের পেছনেও আসছিল। কিছু লোক ডানে বামেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। আমার মা কাঁদছিলেন। কাঁদছিল ছোট ভাইও। বড় ভাই বড় বড় শ্বাস ফেলছিল। সে হাঁপাচ্ছিল এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি সবার দিকে দেখছিলাম; কিন্তু ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করছিলাম না। কারণ, সবাই ছিল নীরব। আমি এদিক ওদিক, আগে পিছে দেখলাম, কিন্তু আমাদের গ্রাম দেখা গেল না। সবার নীরবতা আর চারপাশের কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। বড় ভাই আমাকে বলল, চুপ থাক; শিখরা এসে মেরে ফেলবে। এতে আমার ভয় বেড়ে গেল।

সূর্য উদিত হল। বাবা আমাকে হাঁটতে বললেন। বড় ভাই আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। আমি হাঁটতে লাগলাম। আমার পায়ে জুতো ছিল না। বাবা আমাকে খালি পায়েই তুলে এনেছিলেন। আমি বাবার আঙুল ধরে হাঁটছিলাম আর হাঁটছিলাম। একসময় পায়ে ব্যথা শুরু হল। সবাই দ্রুত গতিতে হাঁটছিল। আমি তাদের সঙ্গে থাকতে পারছিলাম না; পেছনে পড়ছিলাম। বাবা আমাকে উঠিয়ে কাঁধে বসালেন। আমি তাঁর মাথা শক্ত করে ধরলাম। ততক্ষণে সূর্য আমার মাথার উপর এসে

পড়েছিল এবং আমাদেরকে দগ্ধ করছিল। ক্ষুধা আর পিপাসা আমাকে পেরেশান করে ফেলছিল। আমি কয়েক বার পানি চাইলাম। বাবা প্রত্যেক বার বললেন, 'সামনে গিয়ে পান করাব।' দূরে একটি পানির চরকি দেখা গেল। সেটার কাছে একটি কাঁচা বাড়ি ছিল। বাবা সেদিকের রোখ ধরলেন। অনেক ক্ষণ পর সেখানে পৌঁছলেন; কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্যও অপেক্ষা করলেন না। সেখানে পাঁচটি লাশ পড়েছিল। একজন পুরুষ, একজন মহিলা আর তিনটি শিশুর লাশ। তাদের কাপড় রক্তে রঞ্জিত ছিল। শিশু তিনটির মধ্যে একটি ছিল দুধের বাচ্চা। আরেকটির বয়স দুই থেকে তিন বছর। আর তৃতীয়টি ছিল আমার বয়সের। আমি যেহেতু বাবার কাঁধে চড়ে ছিলাম, এজন্য লাশগুলো খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার পরিবার পানি না পান করেই সেখান থেকে দৌড় শুরু করল এবং আমি ফিরে ফিরে লাশগুলো দেখতে থাকলাম।

ভয়ে আমার যবান বন্ধ হয়ে গেল। লোকগুলোকে কে মেরেছে, সে কথা জিজ্ঞেস করতেও আমি ভয় পাচ্ছিলাম। পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, আমার ক্ষুধা ও পিপাসা উড়ে গেল। হয়তো আমার পুরো দেহ তখন কাঁপছিল। রাস্তায় বাবা আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে চাইলেন। তখন আমি চিৎকার শুরু করলাম। মেয়ের জন্য বাবারা রুস্তমের মত পালোয়ান হয়ে থাকেন। আমি বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলাম না; কিন্তু তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মা আমাকে কোলে নিলেন। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। আমরা এক জায়গায় থামলাম। সবাই বসে পড়ল। আমি বাচ্চা ছিলাম, ঘুমিয়ে গেলাম। এরপর ১৭ আগস্ট ১৯৪৭'এর সূর্য উদিত হল। রাতে কয়েক বার ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমরা জমীনের উপর শুয়ে ছিলাম। খেয়েছিলাম না কিছুই। সকালে ক্ষুধায় কাঁদতে লাগলাম। তখন বাবা আমাকে অনেক আদর করলেন এবং আমার যতটুকু বুঝ ছিল, ততটুকু বোঝালেন।

তিনি তখন অনেক কথা বলেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে শুধু একথা মনে আছে যে, পাকিস্তানে আমাদের নিজের বাড়ি থাকবে এবং সেখানে আমরা অনেক ভালো রুটিরুজি পাব। এরপর আমার চেয়ে বড়

ভাই, যার বয়স ছিল বারো বছর, সে আমার কাছে এসে বসল। সেও বাবার মত কথাবার্তা বলল। সে আমাকে বোঝাল পাকিস্তান কী জিনিস এবং হিন্দু ও শিখ আমাদের দুশমন ইত্যাদি। কথাগুলো আমার কাছে এত ভালো লাগল যে, আমি আর আমার ভাই শৈশবেই জোয়ান হয়ে গেলাম।

আমরা চলতে লাগলাম। প্রথম কদম তুলতেই আমার মধ্যে এমন পরিবর্তন এল যে, আমি পাথর হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার মা-বাবা আমার পেটে কিছু দিতে পারবেন না। তাঁরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তারপরও তাদের চিন্তা ছিল বাচ্চাদের নিয়ে। একই দিকে অনেক লোক যাচ্ছিলেন। বাবা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে তাদের সাথে মিলে গেলেন। তাদের সংখ্যা সামান্য ছিল না। কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরে এলেন। তাদের কাছে ভাজা বুট ছিল। তিনি একটি দানাও মুখে দিলেন না। বুট আমাকে আর আমার ভাইদেরকে দিয়ে দিলেন। আমার বড় ভাই মাকে দিলেন; কিন্তু তিনি নিলেন না। সুতলেজ [শতদ্রু] নদীর কিছু দূর পেছনে আমরা একটি ঝিল থেকে গান্দা পানি পান করলাম। এতে দেহে প্রাণের সঞ্চার হল এবং আমরা সুতলেজ নদীর পুল পার হলাম। এসব জায়গার নাম আমি অনেক পরে জানতে পেরেছি। আমরা গন্ডাশিংওয়ালা সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করলাম।

সেই বাড়ি আমাকে বাড়িছাড়া করে দিল

এই সফরের স্মৃতি আমার মস্তিষ্কে ছবি হয়ে রয়ে গেছে। এখনও কোন কোন সময় স্বপ্নে শিশুদের লাশ আর জ্বলন্ত মসজিদগুলো দেখতে পাই। শৈশব থেকে যেসব প্রশ্ন আমার মস্তিষ্কে দংশন করছিল, বড় হয়ে সেসবের উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানে এসে আমরা অনেক সুন্দর একটি বাড়ি পেয়ে গেলাম। বাবা সরকারী চাকুরিজীবী ছিলেন। তাঁর অধিদপ্তর ছিল এমন, অন্যান্য অধিদপ্তরের যার প্রভাব ছিল। তাঁর ইশারায় অনেক কিছু হয়ে যেত। আমরা যে বাড়িটি পেলাম, সেটা ছিল কোন হিন্দু আমীরের নতুন বানানো বড় খুবসুরত ও প্রশস্ত একটি বাড়ি। এমন খুবসুরত বাড়ি দেখে আমি যে পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম, তা বয়ান করা সম্ভব নয়। তাতে সবধরণের আসবাব ও ফার্নিশার অতিসম্প্রতি রাখা হয়েছিল। মনে হত, বাড়িটির বাসিন্দা এইমাত্র বের হয়ে গেছেন এবং বাড়িটি তিনি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন। এটা গুলবার্গ আর মডেল টাউনের মত কুঠি ছিল না। তবে কুঠি এর মোকাবেলায় কিছুই নয়। নতুন ডিজাইনের সোফা, পালং, ডাইনিং টেবিল, খুবসুরত চেয়ার, মোজাইককৃত মেঝে, প্রত্যেক কামরায় সিলিং ফ্যানসহ সবকিছুই ছিল। বাথরুম ও গোসলখানা এত সুন্দর ছিল যে, সেগুলো ব্যবহার করতে আমার ইতস্তত লাগত। উপরে ঝর্না লাগানো ছিল। কামরা ছিল আটটি। নীচে পাঁচটি, উপরে তিনটি।

এই বাড়ি দেখে আমরা সেই বাড়ির কথা ভুলে গেলাম, যেটা হিন্দুস্তানে ফেলে এসেছিলাম। আমরা গরীব ছিলাম না। মধ্যবিত্ত পর্যায়ের ছিলাম। আমাদের বাড়িটি ছিল পুরনো ধাঁচের। তবে

পাকিস্তানের এই বাড়িটি দেখে আমার কাছে মনে হত যে, আমরা দারিদ্র্যের নিগ্রহ থেকে বের হয়ে এসেছি। পুরো পাকিস্তানই আমার কাছে ওই বাড়ির মত সুন্দর দেখাতে লাগল। আর এটাই হচ্ছে সেই বাড়ি, যা আমাকে বাড়িছাড়া করেছে। কোথাও ঠাঁই নেই। আজ আমি সেই জীর্ণ কুটির খুঁজে বেড়াচ্ছি, যেটা আমি হিন্দুস্তানে ছেড়ে এসেছি। মনে হয় যেন, আমরা সেখানে আসবাবপত্র, ট্রাংক, বিছানা আর খাট ফেলে আসিনি; বরং নিজের সম্মান, খান্দানী মর্যাদা আর নিষ্পাপতা ফেলে এসেছি। পাকিস্তানের এই বাড়ি আমাদের দেমাগ নষ্ট করে দিল এবং আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এক লাফে আমীর বনে গেলাম।

মুসলমানের অনেক খুন-যখমের বিনিময়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে। মানব-ইতিহাসে হয়তো এর চেয়েও অধিক রক্তপাত কোথাও হয়ে থাকবে, সেটা আমার জানা নেই। আমি বলতে চাই, যে রক্তপাত এই স্বাধীনতার সময় হিন্দুস্তানে হয়েছে, হয়তো আগে কখনও তা হয়নি। দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেট হয়তো আর কোন দেশে চেরা হয়নি। গর্ভবতী মায়ের পেট ফেড়ে বাচ্চা বের করে সেটা আর কোথাও হয়তো বর্শীতে গাঁথা হয়নি। হাজার হাজার কিশোরীর ইজ্জত হয়তো আর কোথাও এভাবে লুণ্ঠিত হয়নি। শিশুদেরকে এভাবে জীবিত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি। ইজ্জত বাঁচানোর জন্য হয়তো আগে কখনও এত যুবতী কুয়ায় ঝাঁপ দেয়নি। এত যুবতী হয়তো আগে কখনও অপহৃত হয়নি। পর্দানশীন মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে হয়তো আগে কখনও মিছিল বের করা হয়নি। এত বিপুল সংখ্যক বাড়িঘর আর কোন দেশে হয়তো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি। এত লাখ মানুষ ভীত ও যখমে জর্জরিত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কাফেলার পর কাফেলা এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে হয়তো গমন করেনি। এত অধিক লাশ হয়তো আর কোন দেশে গমন করেনি, পাকিস্তানে যে পরিমাণ গিয়েছে। আর কোন কওম আপন পতাকার খাতিরে এ পরিমাণ ভয়ানক কুরবানী হয়তো কখনও দেয়নি, যা হিন্দুস্তানের মুসলমানরা দিয়েছে। কিন্তু এর সাথে আরেকটি ঘটনাও ঘটেছে, যা খুব কম মানুষই অনুভব করতে পেরেছে। তা হল এই যে, সীমান্তের ওপারে মামুলী ঘরে বসবাসকারী লোকজন পাকিস্তানে এসে প্রাসাদের মত বাড়ির

মালিক বনেছেন এবং কোন কোন প্রাসাদসম বাড়িতে বসবাসকারী লোক এখানে এসে রিফুজি ক্যাম্পে পড়ে গেছেন। পরে ঝুপড়ি, সংকীর্ণ ও অন্ধকার কোয়ার্টার বা মামুলী স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের দুর্ভাগ্যের কারণ ছিল এই যে, এরা আমার বাবার মত এমন কোন অধিদপ্তরের চাকুরিজীবী ছিলেন না, যারা পাহাড় খুড়ে দুধের নহর বের করতে পারেন। চালাকি আর হাতের কারিশমার সাথে তাদের পরিচয় ছিল না। সবর ও ধৈর্যের সাথে তারা বসে ছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন যে, তাদের কুরবানী বৃথা যাবে না এবং নিজ নিজ হক তারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু তারা আসমান থেকে এমনভাবে পড়েছেন যে, খেজুরবীথিকায়ও আটকাননি; সোজা জমীনে পড়েছেন এবং পরে জমীনের কীট বনে গেছেন।

কিন্তু আমি সেই বাবার মেয়ে ছিলাম, যিনি অধিদপ্তরের কোদাল দিয়ে পাহাড় খুড়ে দুধ বের করতে পারতেন। আমরা প্রাসাদসম বাড়ি পেয়ে গেলাম, যার মধ্যে ফার্নিশার বাদেও সিন্দুক ছিল এবং গদি ও রেজায়ী ভরা পেটিও ছিল। সিন্দুকগুলোতে অনেক রেশমি কাপড় ও শাড়ি ছিল। তা হলে আমাদেরকে আমীর বলা হবে না কেন? এর সঙ্গে আল্লাহ আমাদের প্রতি আরেক অনুগ্রহ করেছিলেন। আমার বাবা এত উন্নতি পেয়ে গেলেন, হিন্দুস্তানে যা তিনি স্বপ্নেও দেখতে পারতেন না। এ শুধু সম্পদের উন্নতি নয়; বরং পদমর্যাদার উন্নতি। উন্নতি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। প্রত্যেক অধিদপ্তরে হিন্দু বেশি ছিল। আমার বাবার অধিদপ্তর ছিল হিন্দু লোকজনে ভরপুর। তারা সবাই হিন্দুস্তানে চলে গিয়েছিল। বিভিন্ন দফতর চালানোর জন্য পুরনো লোকদের তালিকা তৈরী করা হয় এবং নিম্নস্তরের পদগুলো নতুন লোক দিয়ে পূর্ণ করা হয়। আমার বাবার অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। অফিসারের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এবং আমার বড় ভাইয়ের মস্তিষ্ক অফিসারের পদ থেকে আরও উপরে গিয়েছিল। এর অনুভূতি আমার তখন হয়, যখন আমি অফিসারের পদ ও আমীরীর নেশায় নিজের সতীত্ব লুটিয়ে ফেলেছি। আর আমি সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, যেখান থেকে ফিরে আসা এবং শরীফ মেয়ে সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

আমি আমার বাবার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। তিনি আগে সাদাসিধা পন্থায় কথা বলতেন এবং খুব স্বাভাবিক পোশাক পরতেন। কিন্তু পদোন্নতি পাওয়ার পর তার সাদাসিধা জীবন খতম হয়ে গেল। স্যুট পরতে লাগলেন; টাই বাঁধতে লাগলেন এবং কৃত্রিম ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। আমরা আগে মেঝের উপর দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খেতাম; কিন্তু বাবা এই নিয়ম বাতিল করে বললেন, ডাইনিং টেবিলে খাবার-দাবার খাও। চাকর-বাকর আবশ্যক মনে করা হল। বাবা অফিসের এক চাপরাসিকে বাড়িতে নিয়োগ দিলেন। তার বেতন দেওয়া হত দফতর থেকে। সে থাকত আমাদের বাড়িতে এবং বাড়ির চাকরহিসেবে খাটত। এ ছিল আমার বাবার প্রথম বেআইনী পদক্ষেপ। এটা সফল হল। এরপর আরও কতগুলো বেআইনী কাজের রাস্তা খুলে গেল। এসব রাস্তা আমাকে ধ্বংসের ঠিকানায় পৌঁছে দিল এবং এ পর্যন্ত আমি কয়েকটি পরিবার ও কয়েক জন সোহাগিনীর ভালোবাসাকে ধ্বংসের মঞ্জিলে পৌঁছে দিয়েছি।

কিন্তু বাবার (এবং পরবর্তীতে) ভাইদের বিপথগামিতার বিষয়টি তখন অনুভব করতে পারলাম, যখন আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। এর আগে এই প্রদর্শনী আর কৃত্রিমতা আমার কাছে খুব ভালো লাগত। এখানে আসার পরই আমাকে মেয়েদের একটি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা আমার হিন্দুস্তানী স্কুলের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। এটা ছিল পুরোপুরি একটি সরকারী স্কুল। স্কুলের আনুষঙ্গিক বিষয় ছিল অনেক। এখানেও মেয়েরা চাটাইয়ের উপর বসে পড়ত। শিক্ষক কোন বুড়ো মানুষ ছিলেন না; বরং কয়েক জন শিক্ষিকা ছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ধর্মীয় বিষয়াদির উপর খুব জোর দেওয়া হত। কিন্তু ছয় মাস পরে, যখন আমাদের ঘরে অফিসারি মনোভাব প্রবেশ করল, তখন স্কুলের মেয়েদেরকে আমার অপছন্দ হতে লাগল। আমি রেশমি কাপড় পরে স্কুলে যেতাম। এসব কাপড় সেইসব শাড়ি দিয়ে বানানো হয়েছিল, যেগুলো এই বাড়িতে সিন্দুকের ভিতর থেকে বের হয়েছিল।

স্কুলে আরেক সমস্যা ছিল। হিন্দুস্তান থেকে আগত মেয়েদেরকে শরণার্থী বলা হত। শরণার্থী পরিবারের মেয়েদের ফিস মাফ করে

দেওয়া হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগ মেয়ে নিম্নমানের কাপড় পরিধান করে আসত। কারও কারও কামিসের সাইজ বড় এবং কারও কারও ছোট ছিল। এসব কাপড় তারা খয়রাত হিসেবে কোন জায়গা থেকে পেয়েছিল। বেশিরভাগ মেয়ের চেহারা খাবারের স্বল্পতা আর সঙ্কটের কারণে হলুদ হয়ে গিয়েছিল। তারা আমার মতই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আর বাড়িঘর জ্বলতে দেখেছিল। মৃত্যুর ছায়ায় তারা ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পায়ে হেঁটে সফর করেছিল। পাকিস্তানে আসার পরও তাদের মস্তিষ্কে ভীতি উপস্থিত ছিল, যা তাদের চোখে স্পষ্ট দেখা যেত। যদি শিক্ষিকা কোন মুহাজির মেয়েকে ধমক দিতেন, তা হলে সে সন্ত্রস্ত হয়ে এমনভাবে চিৎকার করত, যেন তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। আপনি জানেন যে, একটি শিশু অন্য শিশুদের মধ্যে আহ্লাদ ও দুষ্টুমির বিচারে গৃহীত হয়। কিন্তু মুহাজির শিশুদের আহ্লাদ সীমান্তের ওপারে রয়ে গিয়েছিল। এসব মৃতপ্রায় শিশুদেরকে স্থানীয় শিশুরা শরণার্থী বলত।

এরপর শরণার্থী শব্দটি গালি হয়ে গেল। এর সূচনা করেছিলেন আমাদের একজন শিক্ষিকা। একদিন তিনি একটি মেয়েকে চারের নামতা শোনাতে বললেন। মেয়েটি আটকে আটকে এবং সন্ত্রস্ত হয়ে নামতা শোনাতে থাকল। শিক্ষিকা শাসিয়ে বললেন, ‘শরণার্থীদের মত মুখ বুজে শোনাচ্ছ কেন; ভালো করে শোনাও।’ ক্লাসের অন্য মেয়েরা খুব জোরে হাসতে লাগল। হাসতে লাগলেন শিক্ষিকাও। এরপর ‘শরণার্থী’ শব্দটি একটি গালি বনে গেল। আমিও শরণার্থী ছিলাম। আমি অন্য মুহাজির মেয়েদের মত পুরনো আর ময়লা কাপড় পরিধান করতাম না; কিন্তু শরণার্থী ছিলাম। একদিন সেই শিক্ষিকা আমার রেশমি কাপড়ের অহংকার ‘এই কাপড় তোমাকে কে দিয়েছেন?’ বলে চূর্ণ করে দিলেন।

আমি ছিলাম ছোট্ট শিশু; কিন্তু শিক্ষিকার এই প্রশ্ন খঞ্জরের নখের আমার অন্তরে আঘাত হানল। শরণার্থী শিশু হওয়ার কারণে আমার উপরও ভয় সঞ্চারিত ছিল। আমাদেরকে আদর করা উচিত ছিল এবং আমাদেরকে পাকিস্তানী মেয়ে বলে সজাগ করা উচিত ছিল। বোঝানো

দরকার ছিল যে, হিন্দুস্তানে আমাদের সাথে যাকিছু হয়েছে, সেগুলো আমাদের ভুলে যেতে হবে। কিন্তু উল্টো আমাদেরকে বোঝানো হল যে, আমরা অনাহূত মেহমান। ভাগ্যবিতাড়িত শিশু। পাকিস্তান শুধু তাদের, পাকিস্তানে যাদের জন্ম হয়েছে। শিক্ষিকা যখন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমার যবান বন্ধ হয়ে গেল। আমি শিক্ষিকার চেহারার দিকে দেখতে লাগলাম। পুরো ক্লাসের মেয়েরা আমার চেহারা দেখতে লাগল। বিষয়টি তামাশা হয়ে গেল। শিক্ষিকা শাসিয়ে বললেন, 'বলছ না কেন?' আমি জওয়াব দেওয়ার বদলে কেঁদে ফেললাম।

দেখুন জনাব, যদি আপনি মানুষের মন বোঝেন, তা হলে আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আমার মধ্যে এবং অন্যান্য শরণার্থী মেয়েদের মধ্যে এই আচরণের ফলে কেমন হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়ে থাকবে এবং প্রতিশোধ হিসেবে কেমন উত্তাপ জন্ম নিয়ে থাকবে। আমি শিক্ষিতা নারী। যখন কলেজ এবং ঘর থেকে ফেরার হই, তখন থার্ড ইয়ারে ছিলাম। যদি আমি পেশাদার পতিতা না হতাম, তা হলে আমার ছেলেমেয়ে থাকত এবং আমি তাদের মস্তিষ্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি হতে দিতাম না। কিন্তু আমি নিজে এই ধ্বংসাত্মক অনুভূতির শিকার হয়েছিলাম। আমি অন্য মেয়েদের বেলায়ও একথাই বলতে পারি যে, তারা আরও বেশি বুজে গিয়েছিল। আমি শরণার্থী; কিন্তু গরীব নই, এজন্য স্থানীয় মেয়েদের উপর প্রাধান্য বিস্তার আর প্রতিশোধহিসেবে আমি আরও ভালো কাপড় পরা শুরু করলাম। মেয়েদেরকে বলতে লাগলাম, আমি এত্ত বড় ঘরে থাকি। আমাদের ঘরে সোফা আছে; দরজা-জানালায় পর্দা লাগানো আছে এবং আমরা টেবিলে বসে আহার করি। আপনি বুঝে নিতে পারেন যে, আমার মানসিকতা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে আমি গলদ চিন্তায় লিপ্ত হয়ে গেলাম এবং আমার মধ্যে প্রদর্শনীর মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেল।

মুসলিম স্কুল থেকে মিশনারী স্কুলে

একদিন আমি বাবাকে বললাম, স্কুলে আমাকে শরণার্থী বলা হয়ে থাকে। আমি তাঁকে একথাও বললাম যে, এই স্কুল আমার পছন্দ নয়। তখন আমার বাবা পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। আমার দুই ভাইকে উন্নতমানের হাই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। বাবা আমার অভিযোগ শুনে আমাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করে দিলেন। দুই দিন পরে তিনি আমাকে আরেকটি স্কুলে নিয়ে গেলেন। স্কুলটি ছিল খুবই সুন্দর। এই স্কুলের ব্যাপারে সব কথা বিস্তারিত বলে যদি আপনাকে নিজের কাহিনী শোনাই, তা হলে ভালো হবে। অন্যথায় যেকথা বলার ইচ্ছা আছে, সে কথা পরিষ্কার করে বলতে পারব না। তার আগে স্পষ্ট করে দেওয়া আরও জরুরী মনে করি যে, আপনাকে আমি নিজের দাস্তান মানসিক তৃপ্তি পাওয়ার জন্য শোনাচ্ছি না। আমি মূলত ওইসব মাবাবাকে সতর্ক করতে চাই, যারা নিজের মেয়েদেরকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে গর্ববোধ করেন এবং বলে বেড়ান যে, তাদের মেয়ে ইংরেজী পড়ছে। জোয়ান হলে বাড়ি-গাড়িওয়ালা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবেন। আমি এসব মাবাবার সরল সমঝ দূর করতে চাই। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আমার আত্মজীবনী-মূলক সাক্ষাৎকারে আপনি মানসিক বিনোদনের অনেক উপকরণ পাবেন। নিজের সমাজের পুরুষদেরকে আমি যতটা জানি, ততটা আর কেউ জানে না। আমার কাছে এসে পুরুষ শুধু দৈহিকভাবেই উলঙ্গ হয় না; বরং সে নিজের অন্তরের কাপড় খুলেও আমার সামনে রেখে দেয়। পাকিস্তানের পৌরুষের উপর যৌন মাতলামী ছড়িয়ে পড়েছে। আপনাদের পত্র-পত্রিকা আর ফিল্মগুলো যুবকদের রোখ আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার আত্মজীবনী থেকেও হয়তো যৌন লজ্জত

হাসিল করে তারা আমার মূল উদ্দেশ্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষরা আমার আত্মজীবনী পড়লে যেন তাদেরকে এই চিন্তা বিচলিত করে যে, তাদের বোন, মেয়ে, ভাগিনী বা ভাতিজী, যে ইংরেজী স্কুলে পড়ছে, সে আবার আমার কাহিনীর নায়িকা হচ্ছে না তো?

এগুলো হচ্ছে খ্রিস্টানদের মিশনারী স্কুল, যেগুলো ইংরেজদের শাসনামলে খ্রিস্টবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য হিন্দুস্তানে খোলা হয়েছিল। এখানকার বড় বড় শহরে এগুলো আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আপনারা সেগুলো সম্পর্কে অনবগত নন। এগুলোর নাম সাধারণত এমন- জেমস মেরি কনভেন্ট, সেন্ট ক্যাথিড্রাল, ডন বস্কো ইত্যাদি। এসব নামই প্রমাণ করে যে, এগুলো কোন ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে। একসময় খ্রিস্টান মিশনারীরা অর্থাৎ ধর্মপ্রচারকরা এসব স্কুল অচ্ছুত ও মেথরদের জন্য খুলেছিল, যাদের জন্য হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের স্কুলগুলোতে ভর্তি নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টান মিশনারীরা এই শ্রেণিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসব স্কুল খোলে এবং প্রত্যেক স্কুলে গির্জাও নির্মাণ করে। স্কুলগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেগুলোতে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে যে, ভালো পরিবারের লোকজনও তাদের সন্তানাদিকে এখানে ভর্তি করানো আরম্ভ করে।

পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর এসব স্কুলের গ্রহণযোগত্যা বৃদ্ধি পায়। এর কিছু কারণ আছে। প্রথমত পাকিস্তানের আমলা ও আমীর শ্রেণির লোকজন নিজেদেরকে ইংরেজদের স্থলাভিষিক্ত মনে করে নিজের সন্তানাদিকে সাধারণ স্কুলে পড়ানো অপমান মনে করেন।

দ্বিতীয়ত সাধারণ স্কুলগুলোর অবস্থা দিনদিন ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ হয়েছে। শিক্ষকদের যোগ্যতার স্তর এত নীচে নেমেছে যে, তারা নগ্ন গালাগালিতে অভ্যস্থ এবং ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে লিপ্ত। এখন দেখুন, নিজেদের স্কুলের অবস্থা এমন যে, তার চেয়ে হয়তো ভাঙারীর দোকান বা মাছের বাজার ভালো। শিক্ষার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। খ্রিস্টান মিশনারীরা যখন পাকিস্তানী স্কুলগুলোর এমন অবস্থা দেখল, তখন তারা নিজেদের স্কুলে আরও

বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিল। এরপর এমন সময় এল যে, ওই স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ দুর্লভ হয়ে গেল। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, শিশু জন্মের পর সাথে সাথে তাঁর নাম কোন মিশনারী স্কুলে রেজিস্টারভুক্ত করে দেওয়া হয়। যখন তার বয়স পাঁচ ছয় বছর হয়, তখনও ভর্তির সুযোগ হয় না। তখন মুসলমানরা পাদ্রীদের সুপারিশ গ্রহণ করে সন্তানাদিকে ভর্তি করেন। এসব স্কুল যে, শিশুদের মস্তিষ্কে খ্রিস্টবাদের জীবানু ঢুকিয়ে দেয়, সে কথা অভিভাবকরা ভুলে যান।

কখনও কখনও আলেমদের নজরে পড়লে তারা এই কনভেন্ট কিসিমের স্কুলের বিপরীতে খবরের কাগজে কোন বয়ান ছাপিয়ে দেন অথবা মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করে দেন। কয়েক দিন পর্যন্ত শোরগোল শোনা যেতে থাকে যে, মিশনারী স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। এগুলো শিশুদের মধ্যে অনৈস্লামিক মনোভাব সৃষ্টি করছে। এরপর নীরবতা ছেয়ে যায়। খ্রিস্টানদের স্কুলের জনপ্রিয়তা এবং নিজেদের স্কুলের প্রতি ঘৃণাবোধের মধ্যে কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না। এই দুর্দশা থেকে শিশুদেরকে বাঁচানোর সমাধান হচ্ছে এই যে, আমাদের উর্দু স্কুলসমূহের মান মিশনারী স্কুলের বরাবর করতে হবে। সেগুলোর মধ্যে সেই আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে, যা মানুষ মিশনারী স্কুলগুলোতে দেখতে পায়। কিন্তু এদিকে কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না। এখন তো প্রত্যেক অলিগলিতে প্রাইভেট স্কুল খুলে গেছে, যেগুলো শিক্ষা নয়, বরং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ফিস আর ফান্ডের নামে পিতামাতার কাছ থেকে নির্দ্বিধায় অনর্থক পয়সা আদায় করে। মিলাদ মাহফিল ও খতমে কুরআনের বাহানায় শিশুদের কাছ থেকে চার আনা ছয় আনা নেওয়া হয়; কিন্তু হয় না কিছুই। বিপরীতে মিশনারী স্কুল প্রাণোৎসর্গ করে আন্তরিকতার সাথে মিশন সম্পন্ন করার কাজে লিপ্ত রয়েছে।

তবে মিশনারীদের স্কুল বন্ধ আর মুসলমানদের স্কুল শুধরে গেলে আমার কিছু যায় আসে না। আমার কোন সন্তান নেই, যার পড়াশোনা নিয়ে আমার দুঃচিন্তায় ভুগতে হবে। তা ছাড়া আমার কোন সন্তান

হবেও না। ধ্বংসের যে প্রান্তে আমার পৌঁছনোর কথা ছিল, সে পর্যন্ত আমি পৌঁছে গেছি। এখন একটিই আরজু, পাকিস্তানের শিক্ষা অধিদপ্তর, সরকার এবং পিতামাতা আমার পরিণতি থেকে সবক হাসিল করুক। আমি আপনাকে একথা বলে দিচ্ছি যে, আমার মত আরও কত মেয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারা মুখ খোলে না। সমাজে অথবা পরিবারে তারা সাজা ভোগ করছে।

লজ্জা-শরম উঠতে লাগল

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। আমার জন্য বইপুস্তক কেনা হল। সব ইংরেজী বই। যেগুলোর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রংবেরঙের ছবি ছিল। তারপর আমার জন্য ইউনিফর্ম সেলানো হল। ক্লাসরুমে গিয়ে ডেস্ক দেখে অনেক খুশি হলাম। কামরার দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন ছবি আঁকা ছিল। সামনে লটকানো ছিল হযরত ঈসা ও কুমারী মারইয়ামের ছবি। শ্রেণিকক্ষে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ত। কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না। শিশুরা ছিল খুব পরিচ্ছন্ন এবং তারা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলত। শিক্ষিকার আচরণ ছিল খুবই সুন্দর। কোন শিশু কিছু বুঝতে না পারলে শিক্ষিকা খুব আদর করে বুঝিয়ে দিতেন। প্রায় সব শিশুই ছিল আমীর ঘরানার। এ ব্যাপারে আমার বাবার ধারণা ছিল। এজন্য প্রতিদিন আমাকে চার-পাঁচ আনা দিতেন, যাতে কেউ আমাকে গরীব মাবাবার মেয়ে না মনে করে। আমি হীনমন্যতায় ভুগতাম। এজন্য চেষ্টা করতাম, কেউ যেন গরীব এবং শরণার্থী না মনে করে। সুতরাং আমি অভিনয় শুরু করলাম এবং মিথ্যা কথা বলে বলে প্রকাশ করতে লাগলাম যে, আমার বাবা অনেক বড় অফিসার এবং আমরা আমীর শ্রেণির লোক।

ঘরে মা আমাকে কুরআন পড়ানো শুরু করলেন, যাতে আমি বড় হয়ে প্রাচ্যের রীতিনীতির নারী হই। স্কুলের পরিবেশ ছিল অনৈসলামিক। সেখানে ছিল ইউরোপের স্বাধীনতা। সেখানকার পরিবেশে এতটাই আকর্ষণ ছিল যে, অনৈসলামিক কার্যকলাপ আর ইউরোপের স্বাধীনতা আপনা-আপনি আমাদের ধ্যান-ধারণা নিজের আদলে রূপান্তরিত করতে থাকল। ঘরে ছিল প্রাচ্যের পরিবেশ, আর

স্কুলে পশ্চিমা রীতিরেওয়াজ। পশ্চিমা কালচারই আমার কাছে বেশি ভালো লাগত। স্কুলে গিয়ে বাড়ির অক্টোপাশ থেকে মুক্তি লাভ করতাম। বাড়িতে এসে আমি সেই ক্লাসমেট মেয়েদের কাছে নিজের স্কুলের সৌন্দর্যের কথা বয়ান করতাম, যাদের সাথে আমি সেই নিম্নস্তরের স্কুলে পড়তাম। তারা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে দেখত। ফলে আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের নেশা ছড়িয়ে পড়ত। আমার উপর যতই ইউরোপের রং চড়তে লাগল, ততই আমি দীনধর্ম নিয়ে মজাক করতে অভ্যস্থ হতে থাকলাম। আমার মেধা ছিল কাঁচা। তাতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পন্থায় যে রং ভরা হচ্ছিল, সেটা পাকা হতে থাকল।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই যে, আমি নিজের নিষ্পাপতা থেকে, নিজের তাহযীব ও তামাদ্দুন থেকে কীভাবে দূরে যেতে থাকলাম এবং আমার মধ্যে কীভাবে বানোয়াটি ও লৌকিকতা সৃষ্টি হতে থাকল। স্কুলে পাকিস্তান ও ইসলামের নামনিশানাও ছিল না। বরং পরিবেশ ছিল এই যে, এই দুটি বিষয়কে পশ্চাদ্‌পদতা এবং মূর্খতার নিদর্শন মনে করা হত। শিশুরা ইংরেজী বলত এবং নিজেকে পাকিস্তানী পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত। আজ আমি অনুভব করছি, আমাদের সন্তানাদিকে প্রথম শ্রেণিতেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় যে, আমরা লক্ষ লক্ষ শিশুর কুরবানীর বিনিময়ে পাকিস্তান হাসিল করেছি। কিন্তু মিশনারী স্কুলে আমার মস্তিষ্ক থেকে পাকিস্তানের অস্তিত্বই মুছে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি পাকিস্তানের জীবন্ত ইতিহাস। এই পবিত্র ভূখণ্ডের জন্য আমি নিজেও কুরবানী পেশ করেছি।

ওই স্কুলে তখন আমার চতুর্থ বছর। সেসময় স্কুলের জনপ্রিয়তা ছিল গগণচুম্বী। কেবল কোন ভাগ্যবানই তাতে ভর্তির সুযোগ লাভ করত। ভোরে সারি সারি গাড়ি এসে শিশুদেরকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে। আবার ছুটির সময় স্কুলের বাইরে গাড়ির জট লেগে যেত। আমি পায়ে হেঁটে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম। গাড়িতে চড়ে স্কুলে যেতে পারতাম না বলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম। গাড়ির চিন্তা আমার

রগরেশায় সওয়ার হয়ে গেল। আমি সেইসব ছেলের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো শুরু করলাম, যারা গাড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া করত। এখানে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা না বললেই নয়। খোদা আমাকে গোরা রং আর এমন খুবসুরত চেহারা দিয়েছেন যে, স্কুলের সব ছেলেমেয়ে আমাকে আমীর মাবাবার মেয়ে মনে করত এবং বড় হয়ে যে আমার দিকে তাকিয়েছে, সে-ই কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছে। আমীর মাবাবার ছেলেমেয়েরা ক্যান্টিনে প্রচুর পয়সা খরচ করত এবং খুব ভালো ভালো জিনিস খেত; কিন্তু আমার কাছে বেশি হলে পয়সা থাকত চার আনা। বন্ধুত্ব করতে গিয়ে অনেক খরচ করতে হত, সেটা আমি ঘর থেকে চুরি করা শুরু করেছিলাম। বাবার অতিরিক্ত আমদানী শুরু হয়েছিল। আট আনা থেকে এক রুপি পর্যন্ত চুরি করলে ঘরের কেউ উপলব্ধি করত না। এসব পয়সার বিনিময়ে 'আমিও একজন আমীরযাদী' সেই মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করেছিলাম।

আমার মাবাবা খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। কেননা, তাঁদের মেয়ে ইংরেজী স্কুলে পড়ে এবং বড় হয়ে লেডি ডাক্তার হবে। ওহ! ইউরোপিয়ান নিয়মে পরিচালিত ইংলিশ স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাবাবা যদি একটু উঁকি দিয়ে স্কুলের ভিতরে দেখতেন! মুসলমান মেয়েদেরকে সেখানে কীভাবে নির্লজ্জতার দীক্ষা দেওয়া হয়, একটু হলেও তারা বুঝতে পারতেন। শিক্ষিকা আমাদেরকে বলতেন, আমেরিকা কত সম্পদশালী দেশ। এই একটি দেশই সমস্ত দেশের রক্ষক ও জীবিকা সর্বরাহকারী। দেশটি পাকিস্তানকে গম, নগদ অর্থ এবং গুড়ো দুধের কৌটা প্রদান করছে। আমাদেরকে সাহিত্য আর সিনেমার মাধ্যমে আমেরিকান তাহযীব-তামাদ্দুনে রঙিন করা হচ্ছিল। এই রং আমার খুব পছন্দ ছিল। বাবাকে আমি 'আব্বাজী' বলতাম; কিন্তু স্কুলে বলতাম, 'আমার ডেডি'।

তখন স্কুলে আমার সপ্তম বছর। বয়স চৌদ্দ। বড় ভাই বাবা'র সুপারিশক্রমে এমন এক দপ্তরে চাকুরি পেয়ে গেলেন, যেখানে অতিরিক্ত আয় ছিল অনেক। ভাই বলতেন, আমি কারও কাছে চাই না, কেননা আমি ঘুসের খুব বিরোধী; কিন্তু লোকজন আমার পকেটে

পয়সা গুঁজে দিয়ে আমার ঈমান খারাপ করে দিয়ে যায়। ঈমান কি মানুষ খারাপ করত, না কি আমার ভাই নিজে। ঘুস যত ঘরে আসতে থাকল, ঘর থেকে ঈমান তত বিদায় নিতে থাকল। শরম ও হেজাব উঠে যেতে থাকল। মায়ের কাছ থেকে কুরআনের সবক নেওয়া বন্ধ করে দিলাম। মা চাইতেন আমি যেন এখন বোরকা দিয়ে স্কুলে যাই এবং সেখানে গিয়ে খুলে ফেলি। কিন্তু আমার দুই ভাই শুধু বিরোধিতাই করল না; বরং তারা রীতিমত বোরকা নিয়ে মজাক করতে লাগল। মাকেও তাঁরা মডার্ন বানানোর চেষ্টা করল। আমার ছোট ভাই তখন কলেজে পড়ত। বাবা আর বড় ভাইয়ের অতিরিক্ত আমদানী তাকে পরিপূর্ণ মডার্ন বানিয়ে দিয়েছিল। তখন শুধু এটুকুই হত না; বরং মডার্ন ছেলেদেরকে টেডি বয়েজ বলা হত এবং তাদের চালচলন ছিল হিজড়াদের মত। তারা দুই ভাই আমাকেও মডার্ন বানাতে লাগল। অথচ আমি মডার্ন হয়েই গিয়েছিলাম। কেননা, চৌদ্দ বছরের মেয়ের পর্দা ছিল না। আমার মস্তিষ্ক থেকে মিশনারী স্কুল আমার আদর্শ আর ধর্মকে মুছে দিয়েছিল। আমি নিজের ভাষাকেও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিলাম। স্কুলে ইংরেজী বলতাম এবং মহল্লায় আধা ইংরেজী, কিছু উর্দু, আর বাকি পাঞ্জাবী শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতাম।

আজও আমার সেই সময়ের কথা মনে আছে। একদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় মাকে বলেছিলাম, 'আম্মি! লাঞ্চের সময় আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। স্কুলে ফাংশন আছে। আমি আফটারনুন টি নাগাদ এসে পড়ব।' আমার কথা মা হাসতে শুরু করেছিলেন। তিনি বললেন, 'বেটা! তুমি কী বললে, আমি তো ছাইও বুঝলাম না।' মায়ের হাসি দেখে আমার রাগ হয়েছিল। আমি কী বলেছিলাম, তা তিরস্কারের স্বরে মাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আজ কত বছর হয়ে গেছে। মায়ের সেই হাসি এখনও পরিষ্কার শুনতে পাই। সেই সময় তো মায়ের হাসিতে ভালোবাসা আর তাঁর অসহায়ত্ব ছিল; কিন্তু তাঁর যে হাসি এখন নির্জনে শুনতে পাই, তাতে তিরস্কার আর জহর মাখানো থাকে। মা আমাকে বলেছিলেন, 'বেটা! তুমি কী বললে, আমি তো ছাইও বুঝলাম না।' যদি আজ মা সামনে আসেন, তা হলে

আমি তাঁর পা ধরে বলব, মা! আমার দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, তুমি আমার নয়; বরং আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি। তার সাজা দেখো, আমি বিভিন্ন সড়ক আর হোটেলে একরাতের স্বামীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমার চৌদ্দ বছর বয়সের কথা বলছিলাম। আমি গাড়িওয়ালা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো শুরু করেছিলাম দুই বছর আগেই। কিন্তু কারও গাড়িতে খুব কমই লিফ্‌ট করার সুযোগ হত। কেননা, আমাদের বাড়ি ওই মহল্লায়ই ছিল। গাড়ি চলে যেত অন্য দিকে। বয়স চৌদ্দ হলে আমার বন্ধুত্ব ছিল একটি ছেলের সঙ্গে। তার বয়স ছিল ষোলো। আমার চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পড়ত। গাড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া করত সে। গাড়ি এক ড্রাইভার চালাত। সবদিক থেকে এই ছেলেটি আমার কাছে ভালো লাগত। দেখতেও সুন্দর ছিল। ধনী ছিল। অনেক সুন্দর ইংরেজী বলত। বয়সের তুলনায় একটু বেশি জোয়ান ছিল। আমি তো শিশু ছিলাম না। আমার দেহেও বেশ পরিবর্তন এসেছিল এবং চিন্তাচেতনায়ও। এই ছেলেটি আমার জন্য অনেক পয়সা খরচ করত। তার বাবা ছিলেন পুলিশের ডিএসপি। তার কাছে পয়সার অভাব ছিল না। আমিও গরীব নই, এমন ভাব প্রকাশ করার জন্য ঘর থেকে পয়সা চুরি করে আনতাম। মিথ্যা বলেও অনেক পয়সা নিতাম। আমার বড় ভাই তো টাকা নিয়েই খেলতেন। হারাম উপার্জন থেকে তিনি আমাকে অনেক পয়সা দিতেন। সেই বন্ধু আমার জন্য এতটুকু সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, স্কুল ছুটি হলে গাড়ি দিয়ে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেত। আমি ছিলাম নিষ্কর্মা মেয়ে। আমার রগরেশায় গাড়ি ভূতের মত সওয়ার হয়ে গিয়েছিল।

একদিন ছেলেটি আমাকে ইংরেজী ছবি দেখার জন্য দাওয়াত দিল। অন্যান্য শো-তেও সে আমাকে নিয়ে যেতে চাইত। এর আগে আমি দুইএকটি উর্দু ফিল্ম দেখেছিলাম। সেগুলোর রোমান্টিক সিন আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। ইংরেজী ফিল্ম দেখার সুযোগ এখনও হয়ে উঠছিল না। ছেলেটি দ্বিতীয় শো-তে সিট বুকিং দিল। আমি বাড়িতে মিথ্যা কথা বললাম যে, স্কুলে একটি ফাংশনের রিহার্সেল হবে। সেটা সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে। ঘরের লোকজন মেনে

নিল। আমি পাঁচটার সময় ঘর থেকে বের হলাম এবং স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিট পরে আমার বন্ধু এসে পড়ল। গাড়ি নিয়ে আসেনি। কারণ, গাড়ি তো ড্রাইভার চালাত। সে আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে গেল। এটা ছিল ইউরোপিয়ান স্টাইলের একটি ছোট হোটেল। এমন হোটেলে এর আগে কখনও আমি যাইনি। সেখানকার সাদা পরিচ্ছন্ন উর্দি পরিহিত বেয়ারা, চমৎকার ফার্নিশার আর পরিবেশের আকর্ষণ দেখে মনে হল, আমি এখনও দুনিয়ার কিছুই দেখিনি। আমি তখনও স্কুলের মধ্যেই মডার্ন হয়ে ছিলাম। হোটেলে যেসব লোক বসেছিল, তাদেরকে বড় বড় আমীর মনে হচ্ছিল। আমি যে পুরোপুরি মডার্ন হয়নি, সে কথা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। আমি অভিনয় শুরু করলাম।

এরপর আমরা সিনেমা হলে গিয়ে বসলাম। আমাদের সিট ছিল গ্যালারিতে, একেবারে শেষ সারিতে, এক কোণায়। পেছনে ছিল দেয়াল এবং ডানে-বামেও। ছবি শুরু হল। এ ছিল রঙিন সিনেমা। কয়েকটি দৃশ্যের পরই ফিল্মের মধ্যে চুমোচুমি আরম্ভ হল। নায়ক-নায়িকা যখন আবেগে জড়িয়ে ধরে উম্মাদনায় একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে শুরু করল, তখন আমার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি দেহে আনন্দের এক উষ্ণতা অনুভব করতে লাগলাম। এরপর এক আজব ধরণের নেশা আমাকে পেয়ে বসল। সেই নেশায় পড়ে আমি বন্ধুর হাত ধরে ফেললাম এবং আমাদের একের আঙুলগুলো অপরের আঙুলসমূহের মধ্যে জিঞ্জিরের মত গেঁথে গেল। সে আমার দিকে চেহারা ফেরাল; আমিও তার দিকে চেহারা ফেরালাম। সেও কিছু বলল না; আমিও কিছু বললাম না। আমি মুখ সরিয়ে আনলাম। এর মধ্যে আমাদের একে অপরের ঠোঁট স্পর্শ করল। কানে কানে সে বলল, 'সুইট'। এখন আমি মুখ আরও একটু এগিয়ে দিলাম। তখন আমাদের ঠোঁট দুটি একে অপরের সাথে মিলে গেল। এর সাথে সাথে রঙিন সিনেমার রঙিন কথামালা এবং যৌবনে অগ্নিসংযোগকারী সিনারি আমার হৃদয়ে অবরতণ করতে লাগল। ওই সিনেমায় রোমান্টিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি শরম, হেজাব ও শারাফতের সীমা লম্ফ দিয়ে পার হয়ে গেলাম এবং সিনেমা হলের অন্ধকারের মধ্যে

জোয়ান হয়ে গেলাম। সিনেমা শেষ হওয়া নাগাদ আমার আঙুলগুলো বন্ধুর আঙুলের মধ্যে চিমটে থাকল। এরপর যখন হলের বাতিগুলো জ্বলল, তখন আমার খুব দুঃখ হল। কেমন যেন খুব চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখছিলাম, এর মধ্যে কেউ জাগিয়ে দিল। আমি এতটাই আবেগাচ্ছন্ন ছিলাম যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে গেল। যদি আমার বন্ধু আগে আগে রওয়ানা না দিত এবং লোকজন না থাকত, তা হলে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম এবং তার ঠোঁট আর গাল আমার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেলতাম।

হাঁ, আমি বেহায়া। আপনি তো এটাই মনে করছেন তাই না? আপনি এও চিন্তা করে থাকবেন যে, এমন নগ্ন কথাবার্তা একজন পতিতাই বলতে পারে। কিন্তু জনাব! আমি আপনাকে একীন দিচ্ছি যে, যখন আপনার যুবতী মেয়ে অথবা ছেলে এ ধরণের পিকচার দেখে, যার মধ্যে শুধু রোমান্টিকতা নয়; জৈবিক উত্তেজনা থাকে, তখন তাদের আবেগেও এই ধরণের কম্পন সৃষ্টি হয়, যেমনটা আমি বর্ণনা করলাম। এটা ভিন্ন কথা যে, আপনি নিজের মেয়ের ব্যাপারে হয়তো সুধারণায় লিপ্ত থাকতে পারেন যে, সে এমন বেহায়া হতে পারে না। বিশ্বাস করুন, তারও মানসিক অবস্থা সেই মাদী জানোয়ারের মত হয়ে যায়, যে নর পশুর সন্ধানে পাগলের মত ঘুরতে থাকে। আমার মত সে যদি কোন বন্ধু না পায়, তা হলে কল্পনার জগতে বন্ধু তালাশ করতে থাকে এবং জৈবিক চাহিদা ঠান্ডাকরণে সচেষ্ট হয়। আপনার যুবক ছেলে নির্জনে একাএকা জৈবিক লজ্জত হাসিল করে। পাকিস্তানে এই ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ফিল্ম প্রেরণকারীদের উদ্দেশ্যও এটাই যে, মুসলমান প্রজন্মের আখলাকী মান খতম করে দিতে হবে। ইস, আমি আপনাকে যে ওয়াজ শোনাচ্ছি, তা যদি আমি চৌদ্দ বছর বয়সে বুঝতে পারতাম। যদি আপনি জোয়ান ছেলেমেয়ের পিতামাতা হয়ে থাকেন, তা হলে খোদার নামে, পাকিস্তানের নামে, নিজের ইজ্জতসম্মানের নামে আমার কথাবার্তাগুলোকে একজন পতিতার বকওয়াস মনে করে এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিবেন না।

এই পিকচারের পর ওই ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব এত পাকা হয়ে গেল, যেন সে আমার দেহের অংশ। আমার অন্তরে তখন একটি

খায়েশই যন্ত্রণা দিচ্ছিল যে, আমি তার সাথে নির্জনে বসব এবং আমার মুখ তার মুখের সাথে লাগাব; কিন্তু নির্জনে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল শুধু সিনেমা হলের অন্ধকার কক্ষে। আর সিনেমা হলের কক্ষ ছিল লোকজনে ভরা। আমি আরেক বার এই ছেলের সঙ্গে আরেকটি ইংরেজী সিনেমা দেখতে গিয়ে গ্যালারিতে বসে ছিলাম। তখন দর্শকদের দিকে দেখছিলাম। দেখলাম, আমার মত আরও চারজন যুবতী মেয়েকে। ফ্যাশন দেখে ইউরোপিয়ান মনে হচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করে যুবক ছিল। আমি মেয়েগুলোর নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। দেখলাম, তারা খুব উদ্ধত। তাদের বিপরীতে আমি নিজেকে দেখলাম। আমার দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ল। আমার অপরিপক্ক মস্তিষ্ক ফ্যাশন, সিনেমা দেখা এবং ইংরেজদের মত কথাবার্তা ও চালচলনকে মানবতার মেরাজ মনে করত। বাপ-ভাইয়ের ঘুসের উপার্জন, মিশনারী স্কুল আর পরিবারের বড়লোক হওয়ার নেশা আমার প্রতিপালন এমন রূপরেখায়ই করেছিল। আমি ওই মেয়েদেরকে দেখে তাদেরকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এই পিকচারের প্রতিক্রিয়ায় আমার কাজ তা-ই ছিল, যা প্রথম পিকচার দেখার সময় ছিল।

এরপর ইংরেজী পিকচার আমার উপর ম্যাজিকের মত প্রভাব বিস্তার করল এবং আমার কর্মতৎপরতা ওইসব পিকচারের রঙিন ছাঁচে গড়ে উঠতে লাগল। আমরা দু'জন দশম-দ্বাদশ দিনে পিকচার দেখতে যেতাম।

সিনেমার লোকজন যখন দেখল যে, এই ধরণের রোমান্টিক ও নগ্ন ফিল্ম ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি দেখে, তখন তারা চিন্তা করল, সন্ধ্যার সময় কিছু ছেলেমেয়ে ঘর থেকে অনুমতি না পাওয়ার কারণে আসতে পারে না। সুতরাং তারা আমাদের মত ছেলেমেয়ের সুবিধার জন্য বেলা এগারোটার সময় একটি শো দেখানো আরম্ভ করল। স্কুল-কলেজ থেকে পালানো খুব মুশকিল ব্যাপার ছিল না। বেশিরভাগ আওয়ারা ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে অনুপস্থিত থাকতে আরম্ভ করল। আর যারা আওয়ারা ছিল না, তারাও দেখাদেখি আওয়ারা হতে শুরু করল। বন্ধুর সাথে আমি কয়েক বার বেলা এগারোটার শো দেখতে গিয়েছি।

গাড়ি আমার সতীত্ব পিষ্ট করে দিল

আমার বন্ধু গাড়ি চালাতে জানত; কিন্তু তার বাবা চালাতে দিতেন না। একদিন স্কুলে গিয়ে সে আমাকে বলল যে, তার বাবা কিছু দিনের জন্য বাইরে গিয়েছেন। সে প্রোগ্রাম বানিয়েছিল যে, সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে আসবে এবং বাইরে কোথাও যাবে। এখন আমাকে যারা ঘরে আটকে রাখবে, তারাই আযাদ হয়ে গিয়েছিল। ঘুসের পয়সা ঘরের সবাইকে মডার্ন বানিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় বান্ধবীর সাথে দেখা করার বাহানা দিয়ে বের হলাম। পৌঁছে গেলাম বন্ধুর বাতলানো স্থানে। সে কার নিয়ে এসেছে। প্রথমে সে ওই হোটেলেই নিয়ে গেল, যার কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। সেখান থেকে যখন বের হলাম, তখন রাত বেশ গভীর হয়ে গেছে। হয়তো রাত তখন নয়টা। সে বলল, ঘুরবার জন্য দূরে কোথাও যাবে?

‘যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাও।’ আমি উত্তর দিলাম।

তখন সে আমাকে এমন স্থানে নিয়ে গেল, যেখান থেকে আমি এখনও বের হতে পারিনি। পনেরো যোলো বছর অতিবাহিত হয়েছে, আমি তার সঙ্গো গিয়েছিলাম। আমি তার গাড়িতে বসে ছিলাম। গাড়ি শহর থেকে বের হয়ে গেল। এরপর একটি বিরান জায়গায় গিয়ে গাড়ি থামিয়ে সে বাতি নিভিয়ে দিল। তাকে তেমন কথাবার্তা বলতে হল না। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেললাম। সে শুধু বলল, পেছনের সিটে চলো।

আমার অন্তরে একপ্রকার অজানা ভীতি সঞ্চারিত হল। সেই ভয়ের মধ্যে আনন্দও ছিল। আমি কিছুই বললাম না। দরজা খুলে পেছনের সিটে গিয়ে বসলাম। সেও পেছনের সিটে এল। তার ও আমার মাঝে

কোন পর্দা ছিল না। আমার তো হেজাবের পরোয়াই ছিল না। সে যেমন বলল, আমি তেমনই করলাম। কোন সংকোচ, কোন লজ্জা তো ছিলই না; বরং আমার ভাব এমন ছিল, যেন সে নয়; বরং আমিই তাকে এই উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর গাড়ি উড়তে লাগল। খোলা প্রান্তরে। সাদা সাদা বড় বড় মেঘের খণ্ডের মধ্যে, নক্ষত্রের ছায়াপথে। গাড়ি আমাকে সেই জগতে নিয়ে গেল, যেখানে আনন্দ ছিল। ভাব ছিল। মাস্তি ছিল। আমি তারকাদের দেশ অতিক্রম করে গেলাম। বন্ধুকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মানুষ বলে মনে হল। এরপর গাড়ি আস্তে আস্তে বড় আনন্দের সাথে ছায়াপথ থেকে সেই বিরান ভূমিতে অবরতরণ করল, যেখানে সবকিছুই ছিল অন্ধকার। আমি পুরো নারী হয়ে গিয়েছিলাম। এই একটি সীমানাই অবশিষ্ট ছিল, যা খুব সাহসের সাথে লম্ফ দিয়ে আমি অতিক্রম করলাম। আমার উপর এমন নেশা চেপে বসল যে, আমি নিজের প্রকৃতি ভুলে গেলাম। আজ আমি চিন্তা করি, সেইসব লোক ভাগ্যবান, যারা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। কিন্তু আমি এমনভাবে গাড়ির নীচে এলাম যে, আমি জীবিতও নই; মৃতও নই।

আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল না যে, আমি এত দেরি করে কেন ফিরলাম। আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও লক্ষ করল না কেউ। বাবাকে দেখেও আমার একটু আফসোস হল না যে, এই ব্যক্তির ইজ্জত শহর থেকে দূরে একটি বিরানভূমিতে নিক্ষেপ করে এলাম। আসলে আমাদের ঘরে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার মধ্যে আমার পরিবর্তন কে অনুভব করবে। আমার দুই ভাই খুশি ছিলেন আমি সোশ্যাল আর এ্যাডভান্স হয়েছি বলে। এর আগে যখন আমাদের ঘরে এতটুকু আমদানী ছিল, যার মাধ্যমে ইজ্জতের সাথে ডালরুটি জুটত, তখন ঘরের ইজ্জত ও শারাফতও কায়েম ছিল। যখন অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে ঘরে এমনসব জিনিস আসতে লাগল, যেগুলো আমীর পরিবারে জরুরী মনে করা হয়, তখন আমার বুড়ো মা-ও এ্যাডভান্স হয়ে গেলেন। তিনি মহল্লার নারীসমাজে নিজের আমীরীর ঢোল পিটতে

শুরু করলেন। এর মধ্যে কখনও কখনও অহঙ্কারের ঝলক ফুটে উঠত। তখন আমার মায়ের ঢোল পেটানোর কাজটি আমার কাছে খুব ভালো লাগত। মহল্লার পর্দানশীন মেয়েগুলো আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হত। কিন্তু আজ যখন আমি সোসাইটির নিকৃষ্ট নারী হয়েছি, তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, মায়ের ওই কথাগুলো ছিল তামাশা এবং অন্যের উপর হারাম পয়সার প্রভাব বিস্তারের অভ্যাস অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু। আমার এখনও মনে আছে, আমার আনপড় মা একদিন মহল্লার অন্য মহিলাদের বলছিলেন, আমার মেয়েকে পুলিশের ডিপটির ছেলে ঘরে নামিয়ে দিয়ে যায়।

মা আমারে কখনও এ প্রশ্ন করেননি যে, খুকুমণি! গাড়িতে সওয়ার হওয়ার দাম তুমি কী দিয়ে পরিশোধ কর?

ঘরে কোন বাধা-বিপত্তি ছিল না। কোন বিধি-নিষেধ ছিল না স্কুলেও। পয়সারও কোন অভাব ছিল না। আমার বন্ধুর ঘরেও ঘুসের পয়সা আসত; আমার ঘরেও ঘুসের পয়সা আসত। তারপর কাজ কী? ইসলাম কী? ইউরোপিয়ান স্টাইলের চালচলন, খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা, এরপর নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করা নিজের সাথে অনেক বড় মজাকের শামিল। সেই রাতের পর থেকে আমি আর আমার বন্ধু নির্জনের নায়ক-নায়িকা বনে গেলাম। বান্ধবীদের কাছে নিজের কাহিনী শোনানোর উপযুক্ত হয়ে গেলাম আমি। নিজের কাহিনী শোনানোও ছিল একটি ফ্যাশন। এই ফ্যাশন এখনও আছে; এখন বরং বেড়েছে। এই অভ্যাস মেয়েদের মধ্যেও আছে; ছেলেদের মধ্যেও আছে। আমি খুব ফখরের সাথে বান্ধবীদেরকে শোনালাম, আমার বয়ফ্রেন্ড ডিএসপি'র ছেলে। সোজা কথায় এর অর্থ ছিল, আমি ডিএসপি'র ছেলের রক্ষিতা। আমি রক্ষিতাই ছিলাম। একটু পার্থক্য ছিল এই যে, সে আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারত না। গাড়ি হাতে পেলে সেই বিরান জায়গায় নিয়ে যেত, যেখানে প্রথম বার আমরা গিয়েছিলাম। গাড়ি না পেলে আমরা রাতের আঁধারে কোন বাগানের কোণায় চলে যেতাম।

একরাতে কর্তব্যরত এক টহলকন্সটেবল আমাদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাঁচ টাকা দেওয়ার পর তিনি আমাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়াই শুধু ক্যান্সেল করলেন না; বরং একটি নিরাপদ জায়গা দেখিয়ে দিলেন। এমন হয়েছিল দুই বার। আমাকে আমার মত এক বান্ধবী বলেছে, বাগানের চৌকিদার এই কাজেরও চৌকাদারী করে থাকে। মাত্র পাঁচ টাকা নেয়। টহল পুলিশ এসে পড়লে সতর্ক করে। অথবা দূরে থাকতেই পুলিশ কন্সটেবলকে গপশপে লাগিয়ে রাখে। এভাবেই এক নতুন দুনিয়া আমার কাছে আবরণমুক্ত হয়ে যায়।

শুধু একটি তেলেসমাতি অবমুক্ত হওয়া বাকি ছিল। তাও এক ক্লাসফিলো আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিল। সে আমাকে এক আশ্চর্য ফটো দেখাল। তাতে একজন পুরুষ ও একজন নারী সম্পূর্ণ নগ্ন এবং অত্যন্ত লজ্জাস্কর অবস্থায় বিরাজ করছিল। নারী-পুরুষের এমন অবস্থা সম্পর্কে আমি অনবগত ছিলাম না। আমার বন্ধুর সাথে অনেক বার এমন করেছিলাম। তারপরও এই ফটো আমার ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। উক্ত ক্লাসফিলোই আমাকে একদিন একটি উর্দু নভেল দিয়ে বলল, এটি লুকিয়ে রেখো এবং রাতের নির্জনে পোড়ো। আমি সেটা অন্যান্য বইপুস্তকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। রাতের বেলায় নিজের কামরায় পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার শ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। গাল জ্বলতে লাগল। আমার মধ্যে এক প্রকার নেশা সৃষ্টি হতে লাগল এবং এক রকম তৃষ্ণা অনুভব করতে লাগলাম। সেই নভেলে একটি মেয়েকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সে বিভিন্ন পুরুষের সাথে না-জায়েয সম্পর্ক কায়েম করত এবং নিজের ভাষায় অভিজ্ঞতা এমন নগ্ন শব্দমালায় ব্যক্ত করত, যেগুলো আওয়ারা মেয়েরা অলিগলিতে বকতে থাকে। কোন কথায় রাখঢাক ছিল না। এই বুঝে নিন যে, নারী-পুরুষের জৈবিক কর্মকাণ্ডকে সবিস্তারে উক্ত নভেলে বয়ান করা হয়েছিল।

আমি রাতারাতি নভেলটি পড়ে ফেললাম। আমার জ্ঞানবুদ্ধি উড়ে গেল এবং বন্ধুর কাছে পৌঁছার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। অবশিষ্ট রাত অতিবাহিত করা কঠিন হয়ে পড়ল। মনে হল, গোসলখানায় গিয়ে

শরীরে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিই। কিন্তু পরিবারের ভয়ে তা করতে পারলাম না। শেষ রাতের দিকে চোখ লাগল। সকালে স্কুলে গিয়ে ক্লাসফিলোকে নভেল ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এমন আর কোন নভেল মিলতে পারে? সে বলল, কোন্ দুনিয়ায় বাস কর? তুমি এও জান না যে, এই নভেল আর ফটো কোথায় পাওয়া যায়। চল তো দেখি খুব এ্যাডভান্স ভাব নিয়ে।

ওইদিনই সে একটি বুকস্টল ও ছোট দোকান দেখিয়ে দিল, যেটাকে লাইব্রেরি বলা হত। আপনি এসব লাইব্রেরি দেখে থাকবেন। প্রত্যেক মহল্লায়ই দুইএকটি আছে। এগুলোতে শিশু ও বড়দের নভেল রাখা হয় এবং ভাড়া নিয়ে পড়তে দেওয়া হয়। এগুলো অপরাধ, খুন, ত্রাস ও জৈবিক তৃপ্তিবিষয়ক নভেল হয়ে থাকে। এই লাইব্রেরিগুলোতেই এসব নগ্ন নভেল এবং জৈবিক কর্মকাণ্ডের উলঙ্গা ফটো পাওয়া যায়। দোকানী এগুলো লুকিয়ে রাখে। এগুলোর ভাড়া বেশি। লাইব্রেরির মালিকরা এসব নভেল ও ফটোর ঝলক ছেলেমেয়েদেরকে দেখায় এবং খুব পয়সা উপার্জন করে। এখন এজাতীয় লাইব্রেরির সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে গেছে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, শতকরা নব্বই জন কিশোর ও জোয়ান এসব লাইব্রেরির অন্তরালের খরিদ্দার।

এসব নভেল আর ফটো কিশোর ও জোয়ানদের যে সর্বনাশ করে, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তো আগেই আওয়ারা হয়ে গিয়েছিলাম। আমি এমন মেয়েদেরকে এসব নভেল পড়ে বদকার হতে দেখেছি, যারা খুব ভালো ও শরীফ খান্দানের মেয়ে। এই নভেলগুলো কলেজে হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। বোরকা পরিহিতা শরীফযাদীরাও এগুলো পড়ে। তারপর শরীফ থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা কোন জোয়ানের সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেয়। আর যারা হেজাবে বন্দী থাকে, তারা কল্পনায় জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করে। কিছু এমনও আছে, যারা অন্য মেয়েদের কাছ থেকে শিখে নিজ হাতে এই আগুন নির্বাপিত করে।

আমার পরিণতি দেখুন। আমি এমন একটি আয়না, যার মধ্যে আপনি পুরো সমাজের লুক্কায়িত চেহারা দেখতে পারেন। একটি মেয়েকে পতিতা বানানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি উপকরণ কাজ করে। আমি এসব উপকরণই আপনাকে দেখাচ্ছি এবং প্রমাণ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করছি। আমি একার উপর অভিসম্পাত করে, অথবা সারা দেশের চাকলা বন্ধ করে আপনি দেশকে ব্যভিচার থেকে পবিত্র করতে পারবেন না। ব্যভিচার শুধু পতিতালয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে হয় না। নতুন সংস্কৃতির আড়ালে বাড়িতে বাড়িতেও হয়ে থাকে। কলেজ ও ক্যাম্পাসে হয়। হোটেল ও উদ্যানে হয়। গাড়ির মধ্যে হয়। আপনার পাশের কুঠিতেও হয় এবং এও সম্ভব যে, আপনার নিজের কুঠিতেও হচ্ছে। আপনি যদি জাতির ইজ্জত দেখতে চান, তা হলে যে দিকগুলো আমি দেখালাম, সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিন।

এসব দিক বাদে আমি আপনাকে এমন কিছু চেহারা দেখাতে চাই, যারা জাতির তৎপরতার জন্য কান্নাকাটি করে। যুবসমাজের বিপথগামিতার উপরও অশ্রুপাত করে; কিন্তু আমি জানি যে, এ হচ্ছে মেকি অশ্রুপাত। তারা আসলে সতীত্বের রক্ষক নয়; খরিদ্দার। আমি অনেক চেহারার পর্দা তুলে দিব। আমার কাহিনী মন ও মস্তিষ্ক পরিচ্ছন্ন করে শুনুন। আমি আপনাকে বলছিলাম যে, ডিএসপি'র ছেলের আমি বান্ধবী নয়; রক্ষিতা ছিলাম এবং তাতেই আমি গর্ববোধ করতাম। যেই পরিবেশে আমি শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলাম, সেখানে লৌকিকতাকে ফ্যাশন করা হত। আমি নিজের রোমান্টিকতার কাহিনী বান্ধবীদেরকে শুনিয়েছি এবং আমার বন্ধু শুনিয়েছে তার বন্ধুদেরকে। সে কেন শোনাত? আমার মত রূপসী গার্লফ্রেন্ডের প্রচার সে করবে না কেন?

সে যখন আমার প্রচার দিয়ে দিল, তখন এই ঘোষণা হয়ে গেল যে, আমি বের হয়ে পড়েছি। ফল হল এই যে, ছুটির সময় একদু'জন শাহযাদা স্কুটার বা কার নিয়ে আমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেত এবং লিফ্‌ট পেশ করত। আমি তো সেই নারী ছিলাম না, যার ব্যাপারে কবিগণ বলেছেন, নারী কিন্তু মন একবারই প্রদান করে। সেখানে তো

মনের কোন বিষয়ই ছিল না। আমি তাদের লিফ্‌ট প্রত্যাখ্যান করতাম। এই কারণে নয় যে, আমি একটি ছেলেকে মন দিয়ে বসেছিলাম; বরং লিফ্‌ট প্রত্যাখ্যান করে আমি তৃপ্তি পেতাম। আমি তাদেরকে বোঝাতে চাইতাম যে, আমি এমন সস্তা মেয়ে নই, যে শুধু লিফ্‌টের লোভে তোমাদের সঙ্গে চলতে শুরু করবে। আমি প্রকৃতপক্ষে নিজের মূল্য নির্ধারণ করছিলাম।

নতুন বন্ধুর সাথে হোটেলের অন্তরীণ কামরায়

একদিন একটি মেয়ে আমার সাথে বিবাদ লাগিয়ে দিল। বাহ্যত ব্যাপার কিছুই ছিল না। এরপর ছোটখাট বিষয় নিয়ে সে আমার সাথে লড়তে আরম্ভ করল। সে ছিল আমার ক্লাসফিলো। পরে স্পষ্ট হল যে, আমার আগে সে আমার বন্ধুর বন্ধু ছিল এবং সে যখন আমাকে রক্ষিতা বানিয়েছে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আরও কয়েক দিন পরেই ধরা পড়ে গেল যে, আমার বন্ধুটি আরও কয়েকটি মেয়ের বন্ধু। আমি তার কাছে অভিযোগ করলাম না। পরের দিনই আমি তার মত এক গাড়িওয়ালা বন্ধুর লিফ্‌ট কবুল করলাম। এরপর তার সাথে সেই ধারাই চলতে লাগল, যা আগের বন্ধুর সাথে চলছিল। এই ছেলেটি আমাকে এতটুকু অনুগ্রহ করল যে, সে আমাকে মেট্রিক পাশ করিয়ে দিল এবং আমি এমন একটি কলেজে ভর্তি হলাম, যেখানে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ত। সেখানে ভর্তির সুযোগ শুধু ভাগ্যবানরাই পেয়ে থাকে। কিন্তু বাবা আর ভাই ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার দ্বিতীয় ভাই কলেজের শেষ বর্ষে পড়ছিল। ঘুসের জোরে এখন আমরা আমীর ও মডার্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হচ্ছিলাম। শাহযাদা বনে গিয়েছিল আমার ভাই। তার মধ্যে যেসব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল, সেগুলো আমি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করছিলাম। সে জানত না যে, যেই রাস্তায় সে নেমে পড়েছে, ওই রাস্তায় তার ছোট বোন কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করেছে। এখন আর আমার ঘর থেকে পয়সা চুরি করার প্রয়োজন হত না। বড় ভাই না চাইতেই দিয়ে

দিতেন। তিনি না দিলেও সমস্যা হত না। কলেজে আমার পথে পয়সা আর উপহার বিছিয়ে দেওয়ার লোক অনেক ছিল। সেই কলেজে ঘুসখোর অফিসার, সারগোধা ও লাইলপুরের জমীদার, সীমান্তের খান এবং মন্ত্রী ও বড় বড় মিলফ্যাক্টরির মালিকের পুত্রদের অভাব ছিল না। মিশনারী স্কুল আমাকে বড় কাজের মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। ছেলেরা আমার প্রত্যেক জরুরত পুরো করে দিত। পরিবারের লোকজন আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করেননি যে, আমার কাছে এত পয়সা কোত্থেকে আসে এবং সাজগোছের জিনিস কোত্থেকে কিনে আনি।

আমি এখন এত অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এসব উপহার, হোটেল ও সিনেমা দেখার প্রলোভনের বিনিময়ে নিজের দেহ পেশ করতাম না। বেশির চেয়ে বেশি প্রত্যেককে 'আমি শুধু তোমারই' এই তোকমা দিয়ে রাখতাম এবং প্রমাণ হিসেবে ঠোঁটের সাথে একটু ঠোঁট ঘষে দিতাম, অথবা কিছুক্ষণের জন্য গলা জড়িয়ে ধরতাম। এভাবে আমার প্রার্থীরা উপহারের প্রক্রিয়ায় বাড়িয়ে চড়িয়ে মূল্য পেশ করত। শুধু আমি নই, অনেক মেয়েই ওই শাহযাদাদের উপহার ও প্রেমখেলার লক্ষবস্তু হয়েছিল এবং তারা অল্পস্বল্প রোমান্টিক ফূর্তি প্রদান করে তাদের কাছ থেকে খুব আদায় করত। যদি কেউ বলে যে, আজকের যুগে যেসব ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে, তারা প্রেমবাজি করে না, তা হলে আমি তাকে অন্ধ এবং সুধারণার শিকার সাব্যস্ত করব।

বর্তমান সময়ে পাকিস্তান উন্নতির সেই পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে বড় শহরগুলোতে ইউরোপয়িান স্টাইলে এমনসব হোটেল খোলা হয়েছে, যেগুলো আমাদের দেশের আইনকানুনের ঊর্ধ্বে; অন্যথায় ইসলামী দেশে এসব কখনও খোলা যেত না। এই হোটেলগুলোতে পশ্চিমা নিয়মে ড্যান্স শুরু হয়েছে। এগুলোর দেখাদেখি দেশী স্টাইলের শরীফ হোটেলও নিজের নিয়ম পরিত্যাগ করে ইউরোপিয়ান হোটেলের চরিত্র অবলম্বন করেছে। এসব বিলেতি ও দেশী হোটেলের মধ্যে ভূগর্ভস্থ কুঠি বানানো আছে, যেখানে পাকিস্তানী ছেলেমেয়েদেরকে বিলেতি ড্যান্স শিখানো হয়। একথা তো সবাই জানে যে, এই ড্যান্সে নারী আর পুরুষ বাহুর সাথে বাহু এবং

বুকের সাথে বুক মিলিয়ে নাচতে থাকে। এই ড্যান্সে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, আপনি আপনার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই নাচবেন। যেকোন পুরুষ যেকোন নারীকে নিজের বাহুতে ধারণ করে নাচতে পারে। এতে অস্বীকৃতি জানানোকে অপসংস্কৃতি মনে করা হয়। আপনি এসব হোটেলে গেলে পাকিস্তানী মুসলমানদেরকে দেখবেন স্ত্রী স্বামীর সামনে অন্য পুরুষকে জড়িয়ে ধরে নাচছেন এবং স্বামীও অন্যকোন স্ত্রীলোককে বুকে লাগিয়ে রেখেছেন।

আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম। এক আমীরযাদা বন্ধু আমাকে প্রথম বারের মত ইউরোপিয়ান হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে আমার পরিচিত অনেক মেয়েকে দেখেছিলাম, যারা পাগলের মত পুরুষদের সাথে নাচছিল। সিগারেট পান করছিল এবং খিলখিল করে হাসছিল আর চেঁচাচ্ছিল। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি প্রথম দিন চারটি মেয়েকে দেখলাম, চুমোচুমি আর নাচফূর্তির পর যখন তারা ফিরে যাচ্ছিল, তখন বোরকা পরে যাচ্ছিল। এরা ছিল শরীফ পরিবারের মেয়ে, যারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ওখানে গিয়ে থাকবে। পরে জানতে পেরেছিলাম, এসব মেয়ের মধ্যে হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বেশি। আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন কয়েক জন জোয়ান আমার দিকে এগিয়ে এল। সেখানে বিশের কাছাকাছি আমীরযাদা ছিল। কামরা দুর্গন্ধে ভরা ছিল। মেয়েও ছিল সমান সংখ্যক। প্রথম দিন আট জন যুবক একের পর এক আমাকে বাহু'র মধ্যে ধারণ করে ড্যান্সের প্রথম ধাপ শেখাল। আমাকে যে বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল, সে আরেক জন মেয়ের সাথে হাসিতামাশায় লিপ্ত ছিল।

বন্ধু কাছে এসে আমাকে একটি সিগারেট জ্বালিয়ে দিল। আমি কখনও সিগারেট পান করিনি। দু'তিন জন মেয়ে এসে আমার আশপাশে দাঁড়াল। বন্ধু আমাকে কানে কানে বলল, সিগারেটে আপত্তি কোরো না। আর কথাবার্তা ইংরেজীতে বলো।

আমি সিগারেটে টান দিলাম। মাথা চক্কর দিল। কাশিও এল। অন্যদিকে কে যেন আমার হাতে কোকাকোলার একটি বোতল দিল। মেয়েদের উৎসাহ পেয়ে আমি সিগারেটে আরেক টান দিলাম। ধোঁয়া

এত দুর্গন্ধময় ছিল যে, আমার বমি আসার উপক্রম হল। তারপর সবার অনুরোধে কয়েক ঢোক কোকাকোলার সাথে সিগারেটে আরও কয়েক টান দিলাম। একটু পর আমার কাছে মনে হল সারা দুনিয়ার সুখ যেন আমার বুকের মধ্যে এসে জড়ো হয়ে হয়েছে এবং আমি উড়ছি। দুর্গন্ধ নেই; বমির ভাব নেই। মনে একটি কথা বার বার দোল খেতে লাগল, আমি নাচব এবং নাচতেই থাকব। অন্য ছেলেমেয়েরাও সিগারেট টানতে লাগল। আমি দেখলাম, তারা ধোঁয়া ভিতরে নিচ্ছে এবং কিছুক্ষণ পর নাকমুখ দিয়ে ছাড়ছে।

সিগারেট পানের পর মাহফিলে নতুন জোশ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হল। পশ্চিমা গানের রেকর্ড বাজছিল এবং আমরা নাচছিলাম। ইতোমধ্যে একটি মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, 'সিগারেট মুড ঠিক করে দিয়েছে, না?'

আমার একটু সন্দেহ ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিগারেটের মধ্যে কী ছিল?'

সে বলল, 'সিগারেটের মধ্যে চর্স [গাঁজা] ছিল।'

চর্সের সাথে আমার সখ্য সৃষ্টি হল। এই বস্তুটি আমাকে এমন তেলেসমাতি দুনিয়া দেখিয়ে দিয়েছিল, যা আমি স্বপ্নেও দেখতে পারতাম না। আমি মনে মনে বাবাকে ধন্যবাদ দিলাম। কেননা, তিনি আমাকে সেই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। এরপর বড় ভাইয়ের শোকর আদায় করলাম। কেননা, তিনি মা-বাবাকে বলেছিলেন, আমরা এ্যাডভান্স পরিবার, সুতরাং মেয়েকে পর্দায় আটকে রেখো না। সেই মেয়েটিরও শোকর আদায় করলাম, যে আমাকে নভেল দিয়েছিল এবং নারী-পুরুষের কামুক অবস্থার নগ্ন ফটো দেখিয়েছিল। সেই বন্ধুর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম, যে আমাকে গাড়িতে করে শহরের বাইরে বিরান জায়গায় নিয়ে আমার সম্মুখ থেকে শরম আর সংকোচ নামক দেয়াল সরিয়ে দিয়েছিল।

দেড়-দুই ঘন্টার উথাল-পাথালের পর আমার বন্ধু আমাকে সিগারেটে আরও দুইতিন টান দিতে বাধ্য করল। সে নিজেও সিগারেট

পান করছিল। নেশা বেড়ে গেল। সে আমার বাজু নিজের বাজুর মধ্যে ধারণ করল। এরপর পাঁজা করে ধরে অন্য কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে নরম গদির পালঙ্ক বিছানো ছিল। ভিতর থেকে কামরার দরজা বন্ধ করে দিল সে। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিলাম। আমার এ তো কোন নতুন বিষয় ছিল না। আমি তো এটাই চাইতাম। আমার কাছে খুব ভালো লাগল। কেননা, এই হোটেলে সব ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

এরপর আমার বিভিন্ন সন্ধ্যা এই হোটেলের অন্তরীণ কক্ষে অতিবাহিত হতে লাগল। পরে আমি সেখানে কোন বন্ধু ছাড়াই চলে যেতাম এবং যাওয়ার পর বন্ধু মিলে যেত।

এই হোটেলটি এমন, যেখানে শুধু পয়সাওয়ালাই চায়ের পেয়ালা ধরতে পারে। আমি আশ্চর্য হতাম, পাকিস্তানে এত ধনদৌলত কোত্থেকে এসেছে। একদিকে ঝুপড়ির পর ঝুপড়ির বিস্তার লাভ করছে; অন্যদিকে একরকে একর জায়গা জুড়ে প্রাসাদসম কুঠি নির্মিত হচ্ছে। দুই লোকমা রুটির জন্য মানুষকে পায়ে হেঁটে দৌড়াতে দেখা যায় এবং পরিশ্রমে কাতর আর অর্ধ ক্ষুধার্তদের ভিড় ঠেলে বড়লোকের গাড়ি শাঁ শাঁ করে অতিবাহিত হয়। সমাজ আমীর ও গরীব দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এমন গরীব ও মজদুর দেশে এই ধরণের ইউরোপিয়ান হোটেল, যেখানে ধনদৌলত পানির মত বাহিয়ে দেওয়া হয়, জনগণের মুখে কালিমা লেপন করে। কিন্তু একথা আমি আজ বলছি। সে সময়, যখন আমি এসব হোটেলে পুরুষদের বাহুর সাথে লেপটে নাচতাম এবং নেশাকর সিগারেট পান করতাম, তখন আমি নিজেকে পাকিস্তানী বলতে লজ্জাবোধ করতাম। এসব হোটেলে তখন ইউরোপ ও আমেরিকার আমীরযাদারাও আসতে শুরু করেছিল।

একদিন এক আমেরিকান আমাকে তার সাথে ড্যান্স করাল। আমি ইংরেজী খুব ভালো বলতাম। সে আমার চেহারা-সুরত, ফিগার ও ভাষা দেখে খুব প্রভাবিত হয়েছিল। আমি শুধু এজন্য প্রভাবিত হয়েছিলাম যে, সে ছিল একজন আমেরিকান। আমার পা যেন জমীনেই পড়ছিল না। সে আমাকে খুব উন্নত মানের মদ পান করাল। এরপর নিজের

কামরায় নিয়ে গেল। আমার দেহের প্রতিটা অঙ্গোর প্রশংসা করল সে। একথাও বলল, যদি আমি তাকে বিয়ে করি, তা হলে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে। আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। সে আমাকে জানিয়ে ছিল, সে বিবাহিত; কিন্তু তার স্ত্রী একজন মুখরা অসভ্য মহিলা। এভাবে সে আমাকে আসমানে তুলে সেই গর্তের ভিতর নিয়ে গেল, যেখানে আজও পড়ে আছি। নরম গদির পালঙ্কে কিছুক্ষণ তার সাথে অবস্থান করে আমি গর্ব অনুভব করেছিলাম। আপনাকে সত্য কথা বলছি, পাকিস্তানী যুবতী ও নারীরা ইউরোপ আমেরিকার পুরুষদেরকে খুব পছন্দ করে।

আমি কুমারী মা হচ্ছিলাম

আমার বন্ধু এই কিসিমের দেশী হোটেলেও আমাকে নিয়ে যেতে লাগল। পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম তখন দলে দলে এসব হোটেলে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছিল। তাদের মধ্যে ইউরোপের আওয়ারা যুবকরাও থাকত, যাদেরকে আপনারা হ্যাপি বলে থাকেন। তাদের মধ্যে দুএকজন ভদ্র ও সুশীল বিদেশীও থাকতেন, যারা আমাদের সাথে গাঁজা পান করতেন, নাচতেন এবং সব ধরণের অপকর্মে আমাদের সাথে অংশ নিতেন। আমরা নিজেদেরকে এই বলে ধোঁকা দিতাম যে, যে কাজ আমেরিকার সুশীল লোকজন করে, তা খারাপ হতে পারে না। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্ককে ইংরেজী ভাষাভাষী জাতির গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। আমরা নিজেদেরকে সেইসব পাকিস্তানী থেকে উত্তম মনে করতাম, যারা আমাদের মত মডার্ন ও এ্যাড্‌ভান্স ছিল না। কিন্তু ঠোকর খেয়ে বুঝতে পেরেছি, আমরা হীনতার নিম্নস্তরে অবস্থান করছিলাম। আমি এখন অনুভব করি যে, এই যেসব হ্যাপি আর বাহ্যত সুশীল আমেরিকানরা আমাদের সাথে নাচানাচি কুদাকুদি করত, এদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে পাঠানো হত, যাতে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মকে মানসিক, চারিত্রিক ও জাতীয় বিচারে ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এদের মধ্যে এমনভাবে ব্যভিচারের জীবানু ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, যুবকরা নিজেদেরকে মুসলমান ও পাকিস্তানী মনে না করে।

আমি পত্রপত্রিকায় পড়তাম যে, আমাদের নতুন প্রজন্ম পশ্চিমা রঙে রঙিন হচ্ছে এবং বেহায়াপনা মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। মসজিদগুলোর লাউড স্পিকারের চিৎকার ও আওয়াজ বাড়ছিল; কিন্তু

একই গতিতে নতুন প্রজন্মের নির্লজ্জতা আর বেলেল্লাপনাও বাড়ছিল। আমরা আমীরযাদাদের গাড়িতে চড়ে খিলখিলিয়ে হাসতাম, চেঁচামেচি করতাম এবং কওমের সামনে দিয়ে শাঁ শাঁ করে অতিবাহিত হতাম। কিন্তু কেউ আমাদেরকে কখনও থামায়নি। কেউ আমাদেরকে কখনও সতর্ক করেনি। এখন গিয়ে হোটেলগুলোর খবর নিন। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় নতুন প্রজন্ম গাঁজা, মদ, হ্যাপিজম, নাচ ও ব্যভিচারে ধ্বংস হচ্ছে। যদি ওখানকার পাকিস্তানী যুবক-যুবতীকে দেখেন, তা হলে বলবেন যে, এরা পাকিস্তানী নয়। এরা মূলত সমুদ্রের ওপারের কোন জংলী প্রজন্ম, যারা এত মূল্যবান কাপড় পরিধান করে আমাদের দেশে আখলাকী ধ্বংসযজ্ঞ বিস্তারের জন্য এসেছে। এ হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যারা পাকিস্তানেই আমেরিকান বনে গেছে।

আমি আপনাকে সেই মেয়েদের ঠায়ঠিকানা বলতে পারব না, যারা আমেরিকান হয়ে পাকিস্তানের রোডেঘাটে এবং না জানি কোথায় কোথায় অপমান-অপদস্থ হয়ে ফিরছে। আমি আমার কাহিনী বলতে পারি। আমি এখানে কোনকিছু গোপন করব না। আমি থার্ড ইয়ারে দুইবার ফেল করেছি। সে জন্য আমার কোন দুঃখ হয়নি। আমি তখনও কলেজেই থাকতে চাচ্ছিলাম। এর মধ্যে আমার রেশতার প্রস্তাব আসতে লাগল। তাদের মধ্যে কাউকেই আমার পছন্দ ছিল না। কেননা, আমি স্বাধীন থাকতে চাচ্ছিলাম। একটি পরিবার বাবার পছন্দ হয়ে গেল এবং তিনি কথা পাকা করে ফেললেন। আমি মাকে পরিষ্কার বলে দিলাম, এই ঘরে আমি যাব না। তারা এই শর্তও আরোপ করেছিল যে, মেয়েকে পর্দায় বসতে হবে। প্রস্তাবকারীর ব্যাপারে আমার জানা ছিল যে, তিনি শরীফ মানুষ। আমার আর তার কোন তুলনা ছিল না। তবে তার পরিবারে টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না। একদিন আমি এই ইচ্ছাও করেছিলাম যে, প্রস্তাবকারীকে রাস্তায় কোথাও থামাব এবং বলে দিব, জনাব! নিজের মত কোন রেশতা খুঁজে নিন এবং আমাকে মাফ করে দিন। কিন্তু আমার সব ইচ্ছা মাটির সাথে মিলে গেল।

আমি নিজেকে সমস্ত বন্ধন থেকে আযাদ মনে করতাম। একথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, মানুষ প্রকৃতির নিয়মনীতির কাছে বন্দী। এখানে

ভুল হলে সাজা পেতে হয়। এই সাজার অনুভূতি আমার সেই দিন হয়, যে দিন খুব জোরে বমি আসছিল। হ্যাঁ, এতটাই বমির ভাব হচ্ছিল যে, সামলাতে পারছিলাম না। আমি আমার মত এক সখীর সাথে কথা বললাম। সে বলল, আমি তো তোমাকে কয়েক বার বলেছিলাম, যা করার সাবধানে কোরো। আমার ধারণা ছিল, তুমি শিশু নও। কিছুটা সতর্ক তো অবশ্যই থাকবে।

সে ঠিক বলেছিল। হোটেলে যাতায়াতকারী তিন-চার জন অভিজ্ঞ যুবতী আমাকে সতর্ক করে বলেছিল, নেশা করতে গিয়ে আবার অন্ধ হয়ে যেয়ো না। তারা বড়ির কথা বলে দিয়েছিল। আরও দুই পদ্ধতির কথাও বলেছিল। আমি সে অনুযায়ী কাজ করছিলাম। কিন্তু আমার এক বন্ধু খুব গোঁয়ার ও হিংস্র ছিল। সে কোন সতর্কতার পরোয়া করত না।

এখানে আমি আপনাকে সমাজের আরও এক অপকর্মের কথা বলে দিচ্ছি। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার উন্মুক্ত প্রচারণা ব্যভিচারের সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। অবিবাহিত মেয়ের মা হওয়ার ভয় ব্যভিচার থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনার যেসব কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যেকোন মেয়ে নিজেকে বিবাহিত পরিচয় দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ ও পরামর্শ নিতে পারে। সরকারী ইশতেহার ও লিটারেচারে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা থাকে। তা ছাড়া ওষুধের দোকানগুলোতে জরুরী ওষুধ ও উপকরণের এমন খোলাখুলি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে যে, এখন যুবতী মেয়েরাও এসব জিনিস কিনতে গিয়ে কোন সংকোচ অনুভব করে না। পরিবার পরিকল্পনা অফিসগুলোতে কর্মরত মহিলারা আমার মত মেয়েদেরকে এসব জিনিস চুরি করে লুকিয়ে সরবরাহ করে এবং পয়সা উপার্জন করে।

আমরা যেসব যুবতী হোটেলে বা রাতে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গাড়িতে চড়ে শহর থেকে দূরে চলে যেতাম, তারা এমন ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে রাখতাম। কিন্তু দু'চার বার নেশার ঘোরে এবং বন্ধুর ধৈর্য না থাকার কারণে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়নি, যার পরিণতি আমার সামনে এসে পড়ল। আমার বান্ধবী আমাকে কয়েকটি বড়ি দিল। বন্ধুকে

বললাম, সে আমাকে ওষুধ ইনজেকশন করাল। এসব ওষুধের ফল শুধু এটুকু হল যে, দিল ডুবতে লাগল এবং মাথা ঘুরতে লাগল। আমার ভিতরের অবস্থা পরিবর্তন হল না। সময় ছিল প্রতিকূল। ওষুধের ব্যবহার নিঃফল হয়ে গেল। আমার বন্ধু একজন লেডি ডাক্তারের ঠিকানা বলে দিল। সে আমার সঙ্গো যেতে রাজি ছিল না। সে বলল যে, অপারেশন করতে যত খরচ লাগবে, সে দিবে। পয়সার অভাব তো আমারও ছিল না। আমি লেডি ডাক্তারের কাছে চলে গেলাম। তার অবস্থা ও আচরণ বলছিল, সে কোনভাবেই লেডি ডাক্তার নয়। আমি কেন তার ক্লিনিকে দাখিল হয়েছি, সে হয়তো বিষয়টি আমার চেহারা দেখেই অনুমান করেছিল। আমার মত আরও অনেকেই হয়তো তার হাত হয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে হাসল, যেন সে আমাকে আগে থেকেই চেনে।

আমি সংকোচের সাথে কিছুটা থতমত করে কথা বলছিলাম। তখন সে প্রফুল্ল ভঙ্গিাতে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি অবিবাহিত অবস্থায় মা হতে যাচ্ছ। এখনও বিয়ে করনি তো?'

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে এবং থতমত করে বললাম, 'না।' এরপর সে অন্য কামরায় চলে গেল। দুইতিন মিনিট পরে বাইরে এসে বলল, 'ডাক্তার সাহেব এ ধরণের কাজ করেন না। আমি তাকে রাজি করিয়েছি। তিনি যেভাবে বলবেন, সেভাবে কাজ করবে। যদি তিনি বিগড়ে যান, তা হলে অস্বীকার করে বসবেন। তুমি তো বুঝতেই পারছ যে, তার ফল কী হবে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, সামান্য একটু কষ্ট হবে।'

আমি ডাক্তারের কামরায় দাখিল হলাম। লোকটি ছিল মধ্য বয়সের। সে আমাকে পাশের স্টুলে বসিয়ে আমার পেটে চাপ দিয়ে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন অতিবাহিত হয়েছে?' আমি বললাম, 'দেড় মাস হয়েছে।' আমার ভয় ছিল যে, তিনি হয়তো আমাকে ধমকাবেন এবং ওয়াজ শুরু করবেন। কিন্তু তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিাতে বললেন, 'তোমার সৌন্দর্য আর যৌবনের উপর দুঃখ হয়। অন্যথায়

এমন কাজ আমি কখনও করিনি। যদি কেউ জানতে পারে, তা হলে গ্রেফতার হয়ে আমাকে জেলে যেতে হবে।'

'এতে কি প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা আছে?' আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'মোটেই না।' সে বলল। 'মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে। একটু কষ্ট হবে। তারপর তোমার কাছে মনে হবে যে, কিছুই হয়নি। আমি ভয় করছি, কেননা, কাজটি আইনপরিপন্থী।'

আমি মাথা নুইয়ে তার পা ধরে ফেললাম। চোখ থেকে পানি গড়াতে লাগল। সে চিন্তায় পড়ে গেল। আমি কাকুতি-মিনতি করতে থাকলাম। সে উঠে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল এবং আমাকে একটি পর্দার আড়ালে নিয়ে খাটের উপর শুইয়ে দিল। বলল, 'আমি একটু পরীক্ষা করছি। এরপর কিছু বাতলে দিব।' এরপর সে নিজ হাতে আমার সেলোয়ার খুলে নীচে ফেলে দিল। আমি পরীক্ষাই মনে করছিলাম। সে বলল, 'পাঁচশত টাকা দিতে পারবে? এখনই দিতে হবে?'

'এখন তো দিতে পারব না।' আমি বললাম এবং একটু আমতা আমতা করে এও বললাম যে, 'পাঁচশত টাকা তো বেশ বড় অংক।'

'দিতে পারবে না?'

'দুইতিন কিস্তিতে আরামে দিতে পারব।'

আমি চিকিৎসাও দুইতিন কিস্তিতে করব। লোকটি মিটমিটিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি নিজেই পাঁচ হাজার টাকার ফিস। আমি তো ফিস বলেছি মাত্র। চাইনি তো। পেরেশান হয়ো না। এত সুন্দর একটি মেয়েকে ধ্বংস হতে দিব না।'

এরপর সে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল যে, আমার সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। সে আমার সাহস বাড়িয়ে দিল। হেসে বলল, 'ফিসের প্রথম কিস্তি আমি এখনই তুলে নিচ্ছি।' আমি তখনও শুয়েই ছিলাম এবং সেলোয়ারও বাঁধিনি। এর মধ্যে সে খাটে উঠল এবং সেই ফিস

আদায় করে নিল, যা আমার কাছে কোন নতুন বিষয় ছিল না। আমি তাকে বাধা দিলাম না। আমি ছিলাম বিপদগ্রস্ত। আমি খারাপও মনে করলাম না। সে আমাকে একটি খাওয়ার বড়ি দিল। এক রাতে খাওয়ার জন্য। তারপর বলল, কাল ঠিক এই সময়ে আসবে।

পরের দিন গেলাম। একই খাটে শোয়ায়ে পরীক্ষা করার বাহানায় সে আমার সেলোয়ার খুলে ফেলল এবং নিকৃষ্টতর পরীক্ষা করল। এরপর আমাকে সাহস দিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতে করতে দরবেশ থেকে শয়তান বনে গেল এবং আমার দেহ থেকে ফিসের আরেক কিস্তি তুলে নিল। সে আমাকে ইনজেকশন দিল এবং পরের দিন আবার আসতে বলল। এভাবে একাধারে সে ছয় দিন আমার সাথে ব্যভিচার করল। বলল, 'একটি ইনজেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। কাল কোন না কোন জায়গা থেকে খুঁজে বের করব।' আমি কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করলাম, কোন চিকিৎসা করুন। কেননা, সন্দেহ হচ্ছিল যে, সে আমার সাথে খেলা ছাড়া কিছুই করবে না। আমি সন্ধ্যার সময় বন্ধুর সাথে কথা বললাম। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, 'এটা তো তোমারই অপকর্ম এবং তোমারই দায়িত্ব। এখন পালিয়ো না।'

'এ শুধু আমার অপকর্ম নয়।' বিগড়ানো ভঙ্গিতে সে বলল। আরও যার যার সাথে গাড়িতে চড়েছ, তাদের কাছেও জিজ্ঞেস করো যে, তোমার পেটে কার অপকর্ম রং ধারণ করেছে।' একথা বলে সে চলে গেল।

আমার মা অনুমান করেছিলেন এবং তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে, তার মেয়ে গাড়ির ভাড়া কীসের মাধ্যমে আদায় করছে। হয়তো তিনি মনে মনে স্বীকার করেছিলেন যে, আমার এতদূর পর্যন্ত এগোনোর ক্ষেত্রে তাঁরও হাত রয়েছে। তিনি আমাকে দুএকটি কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি তার উত্তর দিয়ে দিলাম। সাথে বলে দিলাম, 'যেখান থেকে রেশতা এসেছে, সেখানে দিন ধার্য করে ফেলো। চেষ্টা করো যেন তিনচার দিনের মধ্যে শাদী হয়ে যায়।'

পনেরো দিনের সোহাগিনী

এই প্রস্তাবকারীকে আমার মোটেও পছন্দ ছিল না। আমার পাপ আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল। আমি স্থির করলাম যে, এই ব্যক্তির সমস্ত শর্ত আমি কবুল করব। বোরকা পরিধান করব। পর্দায় বসে যাব। রান্নাঘরের কয়েদী হয়ে যাব এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধোঁকা ও সৌন্দর্যকে অভিসম্পাত করব। আমার বন্ধু আর সেই ডাক্তার আমাকে এই মিথ্যার মরিচিকার প্রতি ঘৃণা করতে শিখিয়ে দিয়েছিল। আমার গুনাহ আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। মা আমার সিদ্ধান্ত শুনে অনেক খুশি হলেন। তিনি বাবাকে আসল কথা বললেন না। শুধু এই সুসংবাদ শোনালেন যে, আমি শাদী করতে রাজি হয়ে গেছি।

বাবা সঙ্গো সঙ্গো গিয়ে দিন ধার্য করে এলেন। আমি চাচ্ছিলাম ওই দিনই যেন বরাত আসে; কিন্তু এল দশম দিনে। এমন কিছু বড়ি পেয়েছিলাম, যার কারণে বমিভাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই দশ দিন আমি ঘর থেকে বের হলাম না। আমি গাঁজা, হেরোইন ও মদে আসক্ত হয়েছিলাম। বিলাসিতা আর অশ্লীলতাও নেশায় পরিণত হয়েছিল। বলা হয় যে, এসব নেশা ছাড়া যায় না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আমি পারিবারিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বাইরে পরিত্যাগ করলাম। সাদা সিগারেট পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। আমার কোন কষ্ট হল না। তবিয়তের মধ্যে কোন তিক্ততা অনুভব করলাম না। শুধু ইচ্ছা আর নিয়তের দৃঢ়তা ছিল। আমি যে ঠোকর খেয়েছিলাম, তা আমাকে রাস্তায় নিয়ে এল; কিন্তু শুধু এই ডাক্তার সোজা রাস্তার দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। সে যদি আমার কেস গ্রহণ না করত, তা হলে আমার দুঃখ হত না। সে আমাকে ধোঁকা দিল এবং অপারগতার সুযোগে নাজায়েয স্বার্থ উদ্ধার করল। বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন

জ্বলে উঠছিল, সেটা আমাকে জ্বালিয়ে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমি একবার এমন চিন্তাও করেছিলাম যে, ডাক্তারের ঠিকানা উদ্ধার করে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলব, তোমার স্বামী ডাক্তার নয়, ডাকাত। সতীত্ব লুটকারী। কিন্তু আমার পাপ আমাকে লজ্জিত করে গোস্বা ঠান্ডা করে দিচ্ছিল। আমি অনেক সময় ভাবতাম, আমার মত কত গুনাহগার মেয়ে যে সাধুতার জালে ফেঁসে গিয়ে থাকবে, কে জানে?

এই দশ দিন যে প্রশ্নটি আমাকে পেরেশান করছিল, তা ছিল এই যে, আমি কি স্বামীকে নিজের সম্পর্কে সবকিছু বলে দিব? কুরআন হাতে নিয়ে কি তাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করব যে, আমি শরীফ ও অনুগত স্ত্রী হয়ে প্রমাণ করে দেখাব? আমি মনে মনে কসম করেছিলাম, শরীফ, পর্দানশীন ও অনুগত স্ত্রী হয়ে যাব; কিন্তু গুনাহ স্বীকার করার সাহস আমার ছিল না এবং এমন সাহসের পরিণতি নিয়ে আমার ভয় ছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল এই যে, আমার গুনাহ, যে আমার পেটে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তা কি গোপন থাকতে পারবে? আমার ইচ্ছা আর কসম এই কাঁচা সুতায় ঝুলছিল। আমার কোন ভেদজান্তা ছিল না। আমার মা অবস্থা বুঝে ফেলেছিলেন; কিন্তু আমিও তার কাছে কোন পরামর্শ চাইনি; তিনিও এ ব্যাপারে কোনকিছু জিজ্ঞেস করেননি।

এরপর সেই রাত এল, যেই রাতে বিয়ের পিড়িতে বসে দুলার অপেক্ষায় থরথর করে কাঁপছিলাম। আমার অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। এরপর যখন দুলা ঘরে এলেন, তখন পাপ স্বীকারের যে সামান্য হিম্মত করেছিলাম, তাও খতম হয়ে গেল। একেকটি মুহূর্ত ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। আমার দুঃখ হচ্ছিল এই যে, এই ভদ্রলোক আমাকে দাগমুক্ত কুমারী দুলহান মনে করছিলেন। আমি তার জন্য কত ধোঁকা বনে ছিলাম। কিন্তু আমি এমন সুশ্রী ও মনোলোভা ছিলাম যে, তিনি কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। এক্ষেত্রে আমার একটিঙের কারিশমাও ছিল। তাঁর সামান্য সন্দেহ হল না যে, আমি এমন অনেক বিয়ে বিভিন্ন গাড়িতে, বিভিন্ন হোটেলের শীতল কামরায় এবং বিভিন্ন উদ্যানের অন্ধকার কোণে সম্পন্ন করেছি। আমার বৈবাহিক জীবনের

প্রথম প্রভাত উদিত হলে দুলা এমন সরল সোজা কথাবার্তা বললেন, যা থেকে আমি বুঝে ফেললাম, বেচারা সাদাসিধা মানুষ এবং আমার ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর বয়স ছিল সাতাইশ বছরের কাছাকাছি এবং আমি ছিলাম তাঁর জীবনে প্রথম নারী। আমার বয়স ছিল বাইশ বছর এবং তিনি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ ছিলেন না। আমি যাকিছু জানতাম, তার এক আনাও তাঁর জানা ছিল না। তাঁর সরলতার উপর আমার দুঃখ হল এবং আমার কাছে মনে হল, এই লোকটি হয়তো এতটাই সরল যে, নারীজগৎ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই; অথবা তিনি আমাকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছেন যে, তাঁর চোখমুখ বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক না কেন, এই লোকটি আমার কাছে এত ভালো লাগল যে, আমি সারা জীবন তাঁর গোলামীতে, তাঁর হুকুম ও খায়েশমত অতিবাহিত করার পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি তাঁর মধ্যে যে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা দেখলাম, আমি তার তৃপ্তি থেকে অনবগত ছিলাম। খোদার কসম! পাশ্চাত্যের বেহায়া সংস্কৃতিতে এক মুহূর্তের জন্যও এমন রূহানী মজা পাওয়া যেত না। সেখানে যাকিছু ছিল এবং যাকিছু আছে, তা দেহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমি প্রথম বারের মত অনুভব করলাম যে, বোরকার মধ্যে জড়ানো সেই সাদাসিধা মেয়েগুলো, যারা এক স্বামীর হয়ে জীবনযাপন করে, তারা কতই না ভাগ্যবতী। আমি তাদেরকে তুচ্ছ মনে করতাম; কিন্তু তারা মহান।

দুলা আমার মহব্বত আর সৌন্দর্যে এমন অন্ধ হয়ে গেলেন যে, আমার ভিতরের অবস্থা তার কাছে কিছুই অনুভূত হল না। তার সন্দেহই হল না যে, আমি যে বাচ্চা প্রথমে জন্ম দিতে যাচ্ছি, তিনি তার পিতা নন। সত্য কথা হচ্ছে আমার জানা ছিল না যে, এই সন্তানের বাবা কে? কখনও কখনও আমার ভীষণ কান্না পেত। কেননা, আমি কি সারা জীবন এমন প্রিয় স্বামীকে ধোঁকায় ফেলে রাখব এবং এই ধোঁকা আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধতে থাকবে? কিন্তু খোদা খুব তাড়াতাড়ি আমার স্বামীকে এই ধোঁকা থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। শাদীর তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন আমার শাশুড়ী এবং আমার স্বামীর এক খালা

উপলব্ধি করলেন যে, কিছু একটা এলোমেলো আছে। আমার অবস্থা ছাড়াও তাদের কাছে দলিল ছিল। কেননা, আমার বাবা আচানক চটজলদি বিয়ের দিন ধার্য করেছিলেন। এর আগে আমার শ্বশুরালয়ের লোকজন দুইবার দিন ধার্য করার জন্য আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন; কিন্তু বাবামা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, আমি রাজি ছিলাম না। এখন আমার অবস্থা দেখে তাদের সন্দেহ হল। তারা বুঝলেন, এত তাড়াতাড়ি দিন ধার্য করা হয়েছিল, কারণ, আমি বাইরে কোথাও উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলাম।

আমার শাশুড়ী একজন বুড়ো ও অভিজ্ঞ ধাত্রী ডেকে আনলেন। তিনি আমাকে খুব ভালো করে পরখ করলেন। তিনি যদি একা হতেন, তা হলে তাকে দাবি অনুযায়ী ঘুস দিয়ে নিজের পক্ষে কথা বলিয়ে দিতাম এবং সন্তান জন্মের পর ধাত্রীকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বলিয়ে নিতাম যে, বাচ্চা সাত মাসে জন্মেছে। কিন্তু শাশুড়ী আমার কামরায় মাথার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ধাত্রী আমাকে দেখে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে দেখলেন। এরপর দু'জন বের হয়ে গেলেন। শাশুড়ী আমাকে কিছুই বললেন না। রাতে স্বামী আর আমার কক্ষে এলেন না। পরের দিন আমি ডাকা সত্ত্বেও আমার সাথে কথা বললেন না। দুই দিন পর আমার শাশুড়ী আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পর আমার শাশুড়ী এবং স্বামীর খালা আমাদের বাড়িতে এলেন। মাকে নিয়ে গেলেন একটি কামরার ভিতরে। জানি না, তারা কী কথাবার্তা বলছিলেন। অনেক ক্ষণ পর তারা কামরা থেকে বের হলেন এবং চলে গেলেন। আমি সেই কামরায় গিয়ে দেখলাম, মা কাঁদছেন। আমি ঘটনা বুঝে ফেললাম। তিনি বিষয়টি বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ভালোমন্দ বললেন। সন্ধ্যায় বাবা এলেন ঘরে। মা তাঁকে বিবরণ জানিয়ে দিলেন। তিনি কামরা থেকে বের হয়ে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে দেখলেন এবং কয়েকটি উলঙ্গা গালি দিলেন। তাঁর মুখ থেকে এমন উলঙ্গা গালি আর কখনও শুনিনি।

সেই দিনটি ছিল আমার বিয়ের পঞ্চদশ দিন, যেদিন আমি তালাক পেলাম। মা রাগ করে বললেন, দেনমহর ও খোরপোশ দাবি করব।

আমি বলে দিলাম, না; তালাকের দায় আমার উপর বর্তায়। আমি দেনমহর ও খোরপোশ নিব না। তারা এতটুকু ভদ্রতা দেখালেন যে, মাবাবার দেওয়া সব অলঙ্কার, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। চার দেয়ালের দুনিয়ায় এগুলো একেবারে সামান্য ছিল না। আমরা অর্থাৎ পুরো খান্দান, যারা নিজেদেরকে আমীর, এ্যাডভান্স এবং মহল্লা ও সমাজে উৎকৃষ্ট মনে করতাম, জমীনে নেমে এলাম। আমি, যে পাকিস্তানেই আমেরিকান বনে গিয়েছিল, এমন ঘৃণার যোগ্য পাকিস্তানী মেয়ে হয়ে গেলাম, যাকে তার স্বামী বিয়ের পঞ্চদশ দিনে ব্যভিচারের অভিযোগে তালাক দিয়েছে। মহল্লার মহিলারা আমাদের শুভাকাক্সক্ষী হয়ে আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। আমাকে তারা ঘুরে ঘুরে উপর থেকে নীচে দেখতে লাগল। শ্বশুরালয়কে ভালোমন্দ বলে বাইরে গিয়ে আমাকে আর আমার খান্দানকে খুব অপদস্থ করতে লাগল। আমি সবার জন্য তামাশার জিনিস বনে গেলাম।

বাবা আমার সঙ্গো কথা বন্ধ করে দিলেন। হারাম সাব্যস্ত করে দিলেন আমার হাতের পানি। কখনও কখনও আমাকে দেখেই বিষাক্ত দৃষ্টিতে দেখতেন। যে ভাইয়েরা বোরকা নিয়ে মজাক করেছিলেন, আমার পর্দায় বসার বিরোধিতা করেছিলেন এবং আযাদ ও মডার্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন, তারা দুশমন হয়ে গেল। ছোট ভাই একদিন আমাকে পেটালও। বড় ভাই কথায় কথায় আমাকে ধমকাতে লাগল। মহল্লার মায়েরা মেয়েদেরকে আমার কাছে আসতে বারণ করে দিলেন। আমি একদম একা হয়ে গেলাম। সঠিক পথে আসার কসম চুরমার হয়ে গেল। হাওয়ায় মিলে গেল সারা জীবন স্বামীর গোলাম হয়ে থাকার স্বপ্ন। যদি সেই বদকার ডাক্তার আমাকে সাহায্য করত, তা হলে আজ পাকিস্তানে একজন পতিতা কম থাকত। আমি একটি কামরায় বন্দী হয়ে গেলাম। কখনও মনে হত যে, ঘরের দেয়াল আর দরজাও আমার উপর অভিসম্পাত করছে। আমি একা বসে বসে কাঁদতাম। অন্যদের সামনে কী যাব, আমি তো নিজের সামনে উপস্থিত হতেই ঘাবড়ে যেতাম।

আমি সবার গুনাহ নিজের অন্তরে চাপিয়ে নিলাম।

আশ্রয় খুঁজতে লাগলাম

কয়েক দিন পরে পরিবেশের অভিশাপ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আমার কাছে স্পষ্ট করে দিল যে, এই ঘর আর এই মহল্লায় আমার জন্য কোন আশ্রয় নেই। আগত দিন আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে লাগল। আমার অবস্থা ছিল ফাঁসির সেই কয়েদীর মত, যাকে ফাঁসির মঞ্চের সামনে কালো কুঠুরিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি একদিন ইচ্ছা করলাম যে, মরে যাচ্ছি না কেন? মুক্তির এটাই ছিল একমাত্র পথ। চিন্তাভাবনা করে আমার কাছে এটাই ভালো মনে হল এবং আমি এক সন্ধ্যায় পরিবারের সবার সামনে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। ভয় ছিল যে, হয়তো পরিবারের লোকজন আমাকে বাধা দিবে; বাইরে যেতে দিবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কেউ আমাকে বাধা দিল না। এতেও আমার রাগ হল। দুঃখ হল। কেননা, পরিবারের লোকজনের দৃষ্টিতে আমার এতটুকু গুরুত্বও ছিল না যে, কেউ জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যাচ্ছ। আমার অবস্থা ছিল সেই মুসাফিরের মত, যে এই মেহমানখানায় এসেছিল এবং চলে গেল। কেউ লক্ষই করল না। এও মনে হল যে, হয়তো আমার মা-বাবা আর ভাইয়েরা কোনভাবে জানতে পেরেছেন যে, আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। এজন্য তারা বাধা দেননি। হয়তো তারা খুশি হয়ে থাকবেন যে, নাও! এই নাপাক থেকে ঘর পাক হল।

আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম। রেল গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ার ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। ভাবছিলাম যে, পরিবারের লোকজন আমাকে বাইরে আসার সময় বাধা দিল না কেন। আমার মস্তিষ্ক ছিল শোকার্ত। কাজকর্মে পরিপক্কতার নামও ছিল না, যা আমাকে জ্ঞান ঠিক

রেখে একাগ্রতার সাথে ভাবতে দিবে। চিন্তায় যা এল, উল্টো এল এবং চিন্তাভাবনার ঘূর্ণিবায়ুতে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে লাগলাম। আচানক আমার মস্তিস্কে একটি ধামাকা সৃষ্টি হল এবং মস্তিস্ক খালি হয়ে গেল। আমি বলতেই পারব না যে, মানসিক অবস্থা কেমন ছিল। আমি রেলওয়ের লাইনের দিকে যেতে যেতে সেখানে পৌঁছে গেলাম, যেখানে আমার এই সর্বনাশ সূচিত হয়েছিল। আমাকে সেই বন্ধুরাই আশ্রয় দিতে পারত, যারা ছিল আমার তালাকের যিম্মাদার। আমার আগত সন্তানের বাবা তাদেরই একজন। তারা ছিল আমার সৌন্দর্যের খদ্দের, আমার দেহের পূজারী এবং আমার পশ্চিমা আচরণের প্রজাপতি।

আমি হোটেলের হলরুমে গেলাম। সেখানে তারা উপস্থিত ছিল। এখান থেকে আমি মাত্র একমাস অনুপস্থিত ছিলাম। এই কয় দিনে সেখানে আরও কয়েক জন যুবক-যুবতী যোগ হয়েছিল। রওনক আগের চেয়ে ছিল বেশি। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে হল, এখনও তোমাদের চেহারায় নিষ্কলুষতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। এখনও তোমরা কূলে আছ। আমার পরিণতি দেখো এবং আমার হাশর দেখো। সম্পদ, ফ্যাশন আর পাশ্চাত্যের মনোলোভা চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়ার আগে তোমরা এখান থেকে পালাও। সেই সময়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল, যখন আমি প্রথম বার এখানে এসেছিলাম, তখন কয়েকটি পুরুষ বুক আমাকে চেপে ধরে নাচিয়েছিল। আজ সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সাড়ে চার বছরের সন্ধ্যা এখানে অতিবাহিত করেছি। মনে হচ্ছিল একদিন আগে ঘটে গেছে সব, যেগুলো আমার পুরো জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দিয়েছে।

এই সময়ে পত্রপত্রিকায় লেখা হচ্ছিল, মসজিদসমূহে মাতম চলছিল যে, পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম পাশ্চাত্যের অনুকরণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ধ্বংসের সয়লাব থামানোর চেষ্টা কেউ করেনি। আমি আজও আপনাকে সেই এডিটর, সেই কলামিস্ট আর রাইটারকে দেখিয়ে দিতে পারব, যারা কওমের ধ্বংসের বিষয়ে কাগজে-কলমে কান্নাকাটি করতেন এবং সন্ধ্যায় এসব হোটেলে এসে শরাব পান

করতেন; আর হ্যাপি মেয়েদের সাথে মেতে উঠতেন। আমি আপনাকে সেইসব রাজনৈতিক নেতা দেখিয়ে দিতে পারব, যাদের কেউ পাকিস্তানকে ইসলামী, কেউ গণতান্ত্রিক, এবং কেউ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে চাইতেন; কিন্তু তারা আমার মত মেয়েদের হাতে শরাব পান করতেন এবং তাদের সাথে রাতযাপন করতেন। জনসাধারণের চিন্তায় বিমূঢ় এসব লোককে আমি এজাতীয় ইউরোপিয়ান হোটেলে এমন আয়েশ করতে দেখেছি, যা মোগল খান্দানের রাজাবাদশাদের ভাগ্যেও হয়তো জোটেনি।

আমি দেখছিলাম, এসব এডিটর, রাইটার, লিডার ও ভদ্রলোকদের শুভাগমনে নৃত্যশালার রওনক বেড়ে গেছে। সাড়ে চার বছরে পাকিস্তান এই ময়দানে দুর্বার গতিতে উন্নতি করেছে। গাঁজার পরিবর্তে আমেরিকা থেকে এলএসডি, হেরোইন ও মারিজুয়ানা এসেছে। পাকিস্তানী ছেলেমেয়ে আমেরিকান ভাবভঙ্গিতে ইংরেজী বলতে শুরু করেছে। গান বদলে গেছে; ড্যান্স বদলে গেছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রথম দিকে যে ভয়ের সংকোচ ছিল, গ্রেফতার হওয়ার যে আশঙ্কা ছিল, সব খতম হয়ে গেছে।

আমি সেখানে তামাশা হিসেবে যাইনি; গিয়েছিলাম আশ্রয়ের আশায়। আমার সেই বন্ধু ওখানেই ছিল, যে আমাকে লেডি ডাক্তারের ঠিকানা দিয়েছিল। সে আমাকে দেখে কাতরাতে লাগল। আরও কয়েকটি ছেলেও ছিল। তাদের মধ্যে দু'জন এমনও ছিল, যাদের সঙ্গে আমি গাড়িতে চড়ে শহরের বাইরে বিরান জায়গায় গিয়েছিলাম। একজন সেও ছিল, যার সাথে আমি উদ্যানে চার-পাঁচ সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছিলাম। তাদের কাছে হয়তো খবর গিয়েছিল যে, আমি এখন আর মেয়ে নই; মা হয়ে গেছি। তারা সবাই আমার থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। কিন্তু কয়েক জন নতুন জোয়ানও ছিল, যারা আমাকে চিনত না। আমি তাদের জন্য খুবসুরত মেয়ে আর নতুন চেহারা ছিলাম। আমার শরীরে তখনও আকর্ষণ অবশিষ্ট ছিল। তিনচার জন যুবক একই সময় আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি তাদের মুখে

থুক মারতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তাদের মুখে থুক দিয়ে যেতাম কোথায়? আমি তো সেখানে গিয়েছিলাম আশ্রয়ের সন্ধানে।

নাচঘর (যাকে আপনি চোরা কামরা বললে যথার্থ হবে), যেখানে গিয়ে নিজের বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতার দুঃখ পেলাম, সেখানে একটি ফায়দাও হল। আমার মস্তিষ্ক চিন্তা করার উপযুক্ত হয়ে গেল। ঘরের বিষাক্ত আবদ্ধতা আর পরিবারের লোকদের ঘৃণাভরা আচরণে আমার মস্তিষ্ক বেকার হয়ে গিয়েছিল। হোটেলের অন্তঃপুর, যেখানে পশ্চিমা গানের শোরগোল, নাচের হাঙ্গামা এবং রকমারী মাদকদ্রব্যের গন্ধ ভুরভুর করছিল, সেখানে এসে আমার মস্তিষ্ক কার্যক্ষমতা ফিরে পেল। এক যুবক এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী পান করবেন?'

আমি আবেগপ্রবণ হয়ে জওয়াব দিলাম, 'খু-উ-ব স্ট্রং কিছু।'

কথা বলছিলাম ইংরেজীতে, আমেরিকান স্টাইলে। সে বুঝে ফেলল এবং বিশেষ সিগারেট নিয়ে এল। আমি তিনচার টান দিলাম। সাথে সাথে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল মস্তিষ্ক। মুক্তির পথ আমি ভেবে নিলাম। আত্মহত্যাকে এক কদাকার মজাক ভেবে মাথা থেকে বের করে দিলাম। শ্বশুরালয় আমাকে গ্রহণ করেনি; বাপের ভিটে আমাকে কবুল করেনি। আমি নিজেকে কবুল করে নিলাম এবং কী করতে হবে, সেটা ভেবে ফেললাম।

আমি এসব জোয়ানকে পর্যবেক্ষণ করলাম, যারা আমার দিকে ভিড়ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার পছন্দের। সে আমার কারণে খুব বেশি উত্তেজিত ছিল। নেশায় টান দিয়ে আমার মধ্যে নৈপুন্য আর পশ্চিমা আচরণ ফিরে এসেছিল। এর কারণে ফিরে এসেছিল সৌন্দর্যের আকর্ষণও। এই যুবক আসলে যৌবনের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চালাক ও সচেতন মনে হচ্ছিল না। জানতে পারলাম, সে একজন জায়গীরদারের ছেলে। এখানে কলেজে পড়ে। আসলে গ্রাম্য; কিন্তু সম্পদের জোরে আমেরিকান সেজেছে। আমি এমনই কোন জোয়ানকে ফাঁসাতে চাচ্ছিলাম। তার ব্যাপারে এও জানলাম যে, সে একটি কুঠিতে থাকে। সঙ্গো রেখেছিল আরও তিন যুবক। রান্নাবান্নার জন্য খানসামাও ছিল তার।

আমি জওয়াবে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং তাকে বাইরে নিয়ে গেলাম। একটি বাগানে গিয়ে বসলাম আমরা। আমি ভালোবাসা প্রকাশ করলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। ফিল্মের হিরো বনে গেল। এই প্রথম সাক্ষাতে আমরা শাদীর সিদ্ধান্তও করে ফেললাম এবং বলে দিলাম যে, আগামী কাল তার কুঠিতে দেখা হবে। আমি তাকে সময় আর স্থান বলে দিলাম। এরপর আমি ঘরে ফিরে গেলাম। ঘরে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল না যে, আমি কোথায় গিয়েছিলাম। কিছু খেয়েছি টেয়েছি কি না? আমার কামরা আলাদা ছিল। আমি সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং অনেক সময় পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করলাম। বলতে পারব না, কখন চোখ বন্ধ হয়েছিল।

পরের দিন আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, যেখানে তাকে সাক্ষাতের কথা বলেছিলাম। সময়ের অনেক আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল সে। আমাকে তার কুঠিতে নিয়ে গেল। আমি তার কুঠিতে গিয়ে তিনবার সাক্ষাৎ করলাম। এর মধ্যে তার ব্যাপারে সবকিছু জেনে ফেললাম। তার বাবা ছিলেন অনেক বড় জায়গীরদার এবং সে ছিল জিদ্দি ও আদরের পুত্র। আমি চতুর্থ সাক্ষাতে তাকে বললাম, 'তুমি আমাকে শাদী করার জন্য অস্থির; কিন্তু আমি তোমাকে ধোঁকার মধ্যে রাখতে চাই না। আমার পেটে গুনাহের ফল পেকে যাচ্ছে। দুই মাস পুরো হতে চলেছে। এই সূত্র ধরেই বিয়ের মাত্র পনেরো দিনের মাথায় তালাক ভাগ্যে জুটেছে। তুমি কি আমাকে এই অবস্থায় কবুল করে নিবে?'

আমার কথা শুনে সে চিন্তায় পড়ে গেল। আমি বিছানায় বসে তার পা জড়িয়ে ধরলাম। কেঁদে কেঁদে বললাম, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ অবস্থায়ই কবুল করো। আমাকে সেই বন্ধুরা প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা আমাকে এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। ঘরের লোকজন আমাকে অস্পৃশ্য সাব্যস্ত করেছে।' কেঁদে কেঁদে ডাক্তারের অপকর্ম সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে এবং সবার সম্পর্কে বলে দিলাম। একথাও বলে দিলাম যে, সেও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে আমি আত্মহত্যা করব। আমি তাকে বললাম, 'আমি মনে করে নিব যে, তোমার

ভালোবাসা ছিল ধোঁকা এবং তুমি দৈহিক ফূর্তি করার জন্য আমাকে সঙ্গো নিয়ে ঘুরছিলে?'

'আমি মাবোনের গালি বরদাশত করব।' সে বলল। 'বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ বরদাশত করব না। আমরা এই অপবাদের উপর মাথা এগিয়ে দিই। ফাঁসিতে ঝুলি।' সে আসলে গ্রাম্য লোক ছিল। নাগরিক সংস্কৃতির মুখোশ লাগিয়ে ছিল। গ্রামীণ কালচারের মেজাযে সে বলল, 'যেমনইভাবে তুমি আমাকে ধোঁকায় রাখতে চাও না; তেমনইভাবে আমিও তোমাকে ধোঁকায় রাখব না। আমি তোমাকে বিয়ে করব না। কেননা, এই অবস্থায় আমি তোমাকে সমাজে নিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু আমি তোমাকে কুঠিতে রাখব এবং শেষ দম পর্যন্ত তোমাকে হেফাযত করব। তুমি কি ঘর থেকে পালায়ন করতে চাও? যদি তা চাও, তা হলে আমার কাছে এসে পড়ো।'

অবশ্যই আমার দুঃখ হল। কেননা, আমি তাকে যেভাবে ফাঁসাতে চেয়েছিলাম, সেভাবে কামিয়াব হতে পারলাম না। কিন্তু আমি আশ্বস্ত হয়ে গেলাম যে, সে আমাকে ধোঁকা দিবে না। সে বলল না যে, ঘর থেকে পালিয়ে আসো, আমি তোমাকে বিয়ে করব। সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরি হল না। আমি তো এখন যেকোন ঝুঁকি খরিদ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কালই এসে পড়ব।

খ্রিস্টানদের জালে

আমার জীবনের সেই দিন উদিত হল, যেদিন আমি ঘর থেকে বের হলাম এবং আজ পর্যন্ত ফিরে যাইনি। মেয়েরা ঘর থেকে ডুলিতে করে বের হয়; আমি চোরের মত বের হলাম। ঘর থেকে কিছু পয়সা চুরি করে এবং নিজের অলঙ্কারগুলো পার্সের মধ্যে ভরে ফেলেছিলাম। এই পার্স ও পরিধানের কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। আমি ঘর থেকে অনেক দূরে গিয়েও পিছন ফিরে দেখলাম না। এই ঘর ঘুসের জোরে আমীর আর মডার্ন হয়েছিল। ঘুস আমাকে দংশন করেছিল এবং আমি, যার উচিত ছিল একটি ঘর আবাদ করা এবং পাকিস্তানের ওয়ারিসদেরকে জন্ম দেওয়া, সেই মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা হলাম, যেখানে আমার মত হাজার হাজার বেশ্যা ঘর উজাড় করছে এবং পাকিস্তানের উত্তরসুরীদেরকে পাকিস্তানের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে।

আমি তার কুঠিতে চলে গেলাম। সে কলেজে গিয়েছিল। খানসামা আমার অনেক খাতিরতোয়াজ করল। দুই ঘণ্টা পরে সে এল। তার সাথে ছিল তিনজন যুবক । সে ছিল সন্ত্রাসী ও শাসক কিসিমের মানুষ। আমি তাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে পার্সের সমস্ত অর্থ আর অলঙ্কার তার সামনে রাখলাম। বললাম, 'এগুলো রাখো।' সে খুব শান্তভাবে টাকা আর অলঙ্কারগুলো পার্সের মধ্যে রাখল এবং পার্স আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে ছোটলোক মনে কোরো না।'

আমার থাকার জন্য সে একটি কামরা দেখিয়ে দিল এবং বলল, 'তোমার প্রয়োজনাদি বলে দাও।'

আমি যদি বিস্তারিত বলি যে, এই চারজন যুবক এই আটনয় মাস আমাকে কীভাবে রেখেছিল, তা হলে আমি বিশ্বাস করবেন না। কেননা, আপনিও তো সেই এডিটরদেরই একজন, যারা লিখে থাকেন যে, আমাদের যুবসমাজ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলছি যে, আপনারা নিজেরাই যুবসমাজকে পথভ্রষ্ট করেছেন। যদি আপনি আমার বক্তব্য বিশ্বাস করতেন, তা হলে এই চার যুবকের ব্যাপারে যা বলতাম, শুধু তার উপরই আপনি একটি বই লিখতে পারতেন। কিন্তু আমি কথা সংক্ষেপ করছি। ব্যাপার হল, সে আওয়ারা আমীরযাদা ছিল; কিন্তু আমার সামনে সে এই মানসিকতার দিকে কখনও ইশারাও করেনি।

শুধু একটি ঘটনা বলছি। ওই কুঠিতে তখন আমার দ্বিতীয় রাত। আমার বন্ধুর কামরা ছিল আলাদা; আমার কামরাও ছিল আলাদা। বাকি তিনজন একই কামরায় থাকত। মধ্যরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সাথে সাথে ওই শাহযাদার কথা মনে পড়ে গেল, যে আমাকে এমন সাহস করে আশ্রয় দিয়েছিল। তার আচরণ থেকে আমি আশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, সে আমাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবে। কিন্তু সে আচার-ব্যবহারের ধরণ বদলে ফেলেছিল। আগে সে আমাকে পাগলের মত কামনা করত; বরং সে আমাকে চাটত; কিন্তু এখন তার কোন লক্ষণই ছিল না। সীমা ছিল না তার অনুগ্রহের। আমার অলঙ্কার আর টাকাপয়সা কাছে নিতে সে অস্বীকার করেছিল। আমি বিনিময় হিসেবে কিছু না কিছু দিতে চাচ্ছিলাম। আমার কাছে নিজের খুবসুরত দেহ ছাড়া আর ছিলই বা কী? এটা ছিল এমনই সম্পদ, যা আমি আগেই লুটিয়ে দিয়েছিলাম। হেজাব আর শরমের তো অস্তিত্বই আমার মধ্যে ছিল না। আমি সেই কুঠিতে নিজের কোন একটি অবস্থান সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলাম, আর তা ছিল একজন রক্ষিতার অবস্থান।

আমি নিজের কামরা থেকে বের হলাম এবং তার কামরায় চলে গেলাম। গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল সে। আমি আস্তে করে তার চাদর সরালাম এবং তার পাশে শুয়ে পড়লাম। আমার চেহারায় হাত ফেরাল সে এবং চমকে উঠে বসল। সে বলল, 'এখনই নিজের কামরায় চলে যাও।'

আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'এমন অমনোযোগ কেন?'

'তুমি জান যে, আমি শরীফ লোক নই।' সে বলল। 'কিন্তু তোমার দেহ আমার জন্য হারাম। আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি। নিজের আয়েশের জন্য তোমাকে কাছে রাখিনি। তুমি আমাকে অভিযোগ দিয়ে বলেছিলে, তোমরা দৈহিক ফূর্তির জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে। আমি প্রমাণ করব যে, আমি কপট লোক নই। তুমি তো জান যে, এমন কোন্ নেশা আছে, যা আমরা এই চারজন করি না এবং এমন কোন্ অপকর্ম আছে, যা আমরা করি না। কিন্তু আমরা চারজনের জন্য তুমি নারী নও। তুমি এখনই আমার কামরা থেকে বের হয়ে যাও।'

আমি অনেক চেষ্টা করলাম, যাতে সে আমাকে তার বিছানা থেকে উঠিয়ে না দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে হল এবং আমি তার কামরা থেকে বের হয়ে এলাম। এরপর আমি তাদের চারজনের একটু আধটু খেদমত করার পন্থা বের করলাম। একদিন তাদের বিছানাপত্র ভাঁজ করতে লাগলাম; কিন্তু তারা নিষেধ করে দিল। তাদের কামরা ঝাড়ামোছা করতে লাগলাম; কিন্তু তাও বাধা এল। আমি জিদ করলাম যে, আমি অবশ্যই এই কাজ করব। তখন জায়গীরদারের পুত্র আমাকে তিরস্কার করল। আপনি শুনে তাজ্জব হবেন যে, সে আসলেই শরীফ মানুষ ছিল না। মা-বাবার অঢেল সম্পদ হোটেলে হোটেলে আমার মত মডার্ন মেয়েদেরকে খাওয়াত এবং শরাবের মধ্যে ঢালত। কলেজ ছিল ফূর্তির একটি বাহানা। কিন্তু আমার জন্য সে ভদ্র ও ভালো মানুষ ছিল। আমি তার খেদমত করতে চাইতাম; কিন্তু সে আমার দেখাশোনা করত এবং আমার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখত। সে আমার সাথে নিঃসংকোচে গপশপ করত। আমি তার সঙ্গে তাসও খেলতাম; কিন্তু সে সামান্য দুর্ব্যবহারও করেনি। কখনও অনর্থক মজাক করেনি।

এরাই তো সেই যুবসমাজ, যাদের ব্যাপারে আপনারা বলে থাকেন যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরা চারজন পথভ্রষ্টই ছিল; নিশ্চয়ই গুমরাহ ছিল; কিন্তু তারা আমার কাছে এলে ভালো হয়ে যেত। এর মানে তাদের মধ্যে বিবেক জীবিত ছিল। আপনাদের এবং সমাজের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হচ্ছে যুবসমাজের বিবেক হেফাযত করা।

তাদেরকে কোন লক্ষবস্তু দিন; তাদেরকে কোন মঞ্জিল দেখিয়ে দিন। যদি আপনি দর্শন আর মনোবিজ্ঞান পড়ে থাকেন, তা হলে নিজেই বিচার করতে পারবেন যে, এই চারজন যুবকের কর্মকাণ্ড দুইটি বিপরীত মেরুর কেন ছিল। আপনাকে আমি কাহিনী শোনাচ্ছি, অথবা ধরুন যে, আমি আপনাকে আয়না দেখাচ্ছি। এর মধ্যে নিজের সমাজের চেহারা দেখে নিন।

আমি এই যুবকদের কাছে এলে, তারা আমাকে এই মসিবত থেকে উদ্ধার করতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল যে, এই উদ্দেশ্যে তারা আমাকে কোন ডাক্তারের কাছে পাঠাবে না। কেননা, এটা জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। আমি নিজেও কোন ডাক্তারের কাছে যেতে চাচ্ছিলাম না। আমার ভয় ছিল যে, প্রথম ডাক্তারের মত পরবর্তী ডাক্তারও আমার বিপদ থেকে নাজায়েয স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে। আমি পুতপবিত্র নারী ছিলাম না বটে; কিন্তু আমার মস্তিষ্কে ডাক্তার সম্পর্কে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং সম্মানের ধারণা ছিল। সেই ধারণা চূর্ণ হয়েছিল। ডাক্তারের উপর আমার ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল। জায়গীরদারের ছেলে ছিল ঘষামাঁজা লোক। আমার মত যেসব মেয়ে নিজের সংস্কৃতি থেকে পালিয়ে পাশ্চাত্যের নগ্ন কালচারের মধ্য হারিয়ে যায়, তাদের বেশিরভাগ আমার মত মসিবতে আক্রান্ত হয় এবং তারা চুরি করে এবোর্শন করে ফেলে, অথবা খ্রিস্টানদের হাসপাতালে বাচ্চা জন্ম দিয়ে তাদের হাওয়ালা করে আসে। আমার প্রতি অনুগ্রহকারী এই বন্ধু এমন এক হাসপাতালের সন্ধান দিল এবং আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্য বোরকা সেলাই করে দিল।

আমি সেই হাসপাতালে গেলাম। একজন খ্রিস্টান লেডি ডাক্তারের সাথে দেখা হল। আমি তাকে বললাম, আমি অবিবাহিত এবং মা হতে চলেছি। খুশিতে তার চেহারা খেলে উঠল এবং সে এত সুন্দর কথাবার্তা বলল, যার কারণে আমার অন্তর থেকে পাপের বোঝা নেমে গেল। আমি পাপের বোঝা পেটে নিয়ে ফিরছিলাম। সেই কষ্ট অনেক কমে গেল। এমন আন্তরিকতা আর এমন দরদ তো আমার গর্ভধারিণী মায়ের অন্তরেও ছিল না। সে বলল, 'বোকামীর কারণে তোমার দ্বারা

একটি পাপ সংঘটিত হয়েছে। ভিতরে ভিতরে ভস্ম হয়ো না। আমরা এখানে তোমাকে এই পাপ থেকে পরিচ্ছন্নতার সাথে বাঁচাব।'

'বাচ্চা কোথায় নিয়ে যাব?'

'কোথায় নিয়ে যাবে?' লেডি ডাক্তার হেসে বলল। 'সে এখানেই থাকবে, আর তুমি এখান থেকে এমন আনন্দের সাথে সুস্থ হয়ে বের হবে যে, তুমি কুমারীদের চেয়েও অধিক সুস্থ দেখাবে।'

তার এত সুন্দর আচরণ আমাকে আসক্ত করে ফেলল। আমার রুদ্ধ অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তার সান্ত্বনা আমার সব দুঃখ উগলে দিল। যখন সে জানতে পারল যে, আমি বাড়ি থেকে পালায়ন করেছি এবং অস্থায়ীভাবে অবিবাহিত ছেলেদের সাথে অবস্থান করছি, তখন সে বলল, 'বাচ্চার জন্মের পর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হবে, তুমি কোথায় থাকবে এবং জীবিত থাকার জন্য কী করবে?'

এসব প্রশ্ন আমার গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। আমি ভবিষ্যতের কিছুই ভেবে রাখিনি। আমাকে নীরব দেখে সে বলল, 'ভয় কোরো না। আমাদের কাছে এর চিকিৎসা আছে। আমরা তোমাকে ইজ্জতের সাথে নিজেদের কাছে রাখব। সম্মানজনক জীবনোপকরণ দিব এবং যোগ্য কোন ব্যক্তির সাথে তোমার শাদী করিয়ে দিব।'

আমি নীরবই ছিলাম। সে আমার চেহারা নিরীক্ষণ করে বলল, 'তোমার মধ্যে শুধু একটু পরিবর্তন আনতে হবে; খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে।'

আমি এমনভাবে চমকে গেলাম, যেন কেউ আমাকে অজ্ঞাতসারে আমার গায়ে সুই ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমার তো কোন ধর্ম ছিল না। আমি নিজের ধর্ম আর সংস্কৃতি থেকে পালিয়ে ছিলাম। আমি ছিলাম নামমাত্র মুসলমান। কিন্তু এই বেদীন লেডি ডাক্তার যখন আমাকে ধর্ম পরিবর্তনের পরামর্শ দিল, তখন আমার এরকম দুঃখ হল যেমন, সতীত্বের পর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল ধর্ম। এই একটি সম্পদই আমার কাছে ছিল। এও কি আমি লুটিয়ে দিব? 'না;' আমার অন্তর থেকে আওয়াজ এল, 'আমি ধর্ম ত্যাগ করব না।' কিন্তু আমার

অপারগতা দেখুন, আমি অস্বীকার করতে পারছিলাম না। কেননা, আমার মুক্তি সেই ছাদের নীচেই ছিল, যেখানে আমি বসে ছিলাম। তবে আমার জন্য মিথ্যা বলা কোন মুশকিল কাজ ছিল না। আমি তাকে বললাম, শিশুর জন্মের পর খ্রিস্টান হয়ে যাব।

সে আমাকে নিরীক্ষণ করল এবং প্রত্যেক পনেরোতম দিনে আসতে বলে দিল। আমি সেখান থেকে আশ্বস্ত হয়ে বের হলাম। বোঝা হালকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রশ্নটি, অর্থাৎ পরে কোথায় যাব, আমার উপর আবার বোঝা চাপিয়ে দিল। ছিল এই চারজন যুবক, যাদের একজনের যদি সাথে শাদী করতে পারতাম; কিন্তু সম্ভব মনে হচ্ছিল না। একথা ভাবতে ভাবতে যুবকদের কুঠিতে এসে পড়লাম। লেডি ডাক্তার কী বলেছে এবং আমি কী চিন্তা করেছি, সে কথা যুবকদের বলে দিলাম। তারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যখন সময় হবে, তখন দেখা যাবে।'

সময় গড়িয়ে যেতে থাকল। কষ্টের মুহূর্তগুলো খুব দীর্ঘ ছিল। আমি পনেরো দিন পর পর লেডি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম। প্রত্যেক বার সে আমাকে এমন আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানাত, যেমন শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা মেয়েকে মা স্বাগত জানায়। এই চার যুবক আমাকে মূল্যবান রত্নের মত লুকিয়ে রাখল। আমি কালো বোরকার মধ্যে একটি রহস্য হয়ে থাকলাম। এরপর এল সেই দিন, যেটা কিয়ামতের চেয়ে কম ছিল না। লেডি ডাক্তার আমাকে দুইদিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিয়েছিল এবং আমাকে বিশেষ কামরায় রেখেছিল। রাতে একটি বাচ্চা জন্ম দিলাম। সোহাগিনীদের যখন বাচ্চা হয়, তখন আনন্দোৎসব করা হয়। দাওয়াত চলতে থাকে। মিষ্টান্ন বণ্টন করা হয়। কিন্তু আমার পেট থেকে বাচ্চা হওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তার চেহারাও দেখলাম না। এই নাপাক পিণ্ড ছিল পাপের ফসল। ফুলের মত সামান্য একটি বাচ্চা আমার অন্তরে কয়েক মণ ওজনের পাথর হয়ে পড়ে ছিল। আমি নিজের পাপকে চুমু দিতে, দেখতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি অনেক কাঁদলাম। নার্সকে বললাম, বাচ্চা নিয়ে যাও। আমি একে দেখব না।

মুসলমান বাপ আর মুসলমান মায়ের সন্তানকে ক্রুসেডাররা তুলে নিল। এই শিশু ধর্মপ্রচারক হবে। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করবে এবং এই গুনাহও আমার ঘাড়ে পড়বে। আমাকে এই গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল একটি মিশনারী স্কুলের স্বাধীন পরিবেশ। আবার একটি মিশনারী হাসপাতালের বন্ধ কামরায়ই আমার গুনাহের ফসল আমার কাছ থেকে উসুল করে নেওয়া হল। যখন আমার বাচ্চাটিকে একজন নার্স তুলে নিয়ে কামরা থেকে বের হচ্ছিল, তখন বাচ্চাটি কাঁদছিল। আমি আসমান ও জমীনের সমস্ত গান এই নবজাতক শিশুর কান্নার উপর কুরবানী করে দিব। মন চাইছিল যে উঠি এবং নার্সের কাছ থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে লাগিয়ে চুমতে থাকি। ও ছিল আমার কলজের টুকরা, যা কেড়ে নেওয়া হল। আমি সেই মাকে খুব নির্দয়ভাবে গলা টিপে মেরে ফেললাম, যে আমার সত্তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

আমি নিজের অন্তরকে এই বলে সান্তনা দিলাম যে, এই সন্তান আমার নয়। এটা আমার স্বামীর সন্তান নয়। এ ছিল আমার গুনাহ, যা আমার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হাঁ, এটা আমারই গুনাহ ছিল। আমি সবার গুনাহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি এবং নিজের হিসাবে লিখে নিয়েছি। সেই মাবাবার গুনাহও নিজের অন্তরে সঞ্চিত রেখেছি, যারা আমাকে কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। আমি কওমের গুনাহও নিজের সীনার মধ্যে রেখেছি, যারা নিজেদের নোংরা স্কুলসমূহকে এতটুকু উপযুক্ত বানায়নি, যাতে লোকজন বেদীনদের স্কুলে সন্তানাদিকে ভর্তি না করায় এবং তাদের কচি আর কোমল মস্তিষ্ক পাশ্চাত্যের নগ্ন সংস্কৃতি থেকে হেফাজতে। সে সময় আমার বুদ্ধিও কাঁচা ছিল। আমার কাছে যা ভালো লেগেছে, তা-ই বুকে ধারণ করেছি। মাবাবা আর ভাইয়েরা সেই বস্তুর প্রশংসা করেছেন। আমাদের ঘরে তারা ধর্ম ও শারাফতের নাম-নিশানাও থাকতে দেননি। ঘুসের জোরে তারা আমীর আর মডার্ন বনেছিলেন। কামচাহিদায় পূর্ণ ফিল্ম অনুমোদনকারীদের পাপ আমি মাথায় নিয়েছি। যৌনতায় ঠাঁসা নগ্ন ছবি মুদ্রণকারী, অশ্লীল পত্রপত্রিকা প্রকাশকারী এনং নগ্ন নভেল রচয়িতা ও বিক্রেতা- সবার পাপ আমি নিজের খাতায় লিখে নিয়েছি। এদের সবার

পাপ যখন আমার পেটে এল, তখন সবাই আমার নামের উপর থুথু নিক্ষেপ করে আমাকে দেশান্তর করে দিল।

উলামায়ে কেরামের ফতোয়া অনুসারে শাস্তি আমারই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড আমারই হওয়ার কথা। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, আমি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছি। ইংরেজী স্কুলে এবতেদায়ী তালীম পেয়েছি। আমি কুঠিতে অবস্থানকারিণী পতিতা নই। বিদেশী ও পাকিস্তানী বিজ্ঞ লোকদের সাথে, রাজনীতিবিদ ও আলেমদের সাথে ওঠাবসা করেছি। তাদের সাথে রাতযাপন করেছি। আমি অনেক কিছু বুঝি। অনেক কিছু জানি। যারা আমার কাছে আসে, তাদের সবার নগ্ন দেহ, নগ্ন অন্তর দেখেছি। আপনি আমার মুখ খুলিয়েছেন। সুতরাং এখন কথাবার্তা একটু খোলাসা করেই বলতে দিন।

হাসপাতালের কথা বলছিলাম। আমি নিজের সন্তানের চেহারা দেখলাম না। আমাকে খ্রিস্টান বানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে এক যাজক মোমবাতি নিয়ে আসতেন এবং জ্বলন্ত মোমবাতি আমার দেহের উপর ফিরিয়ে চলে যেতেন। প্রতিদিন ওই যাজকের গুনগুন শব্দ শুনে আমার চোখ খুলত। দুনিয়ার এটাই প্রথম আওয়াজ আমার কানে পড়ত। সাধারণত সপ্তম বা অষ্টম দিনে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হত। সপ্তাহ গেলে আমিও ছুটির উপযুক্ত হয়ে গেলাম; কিন্তু আমাকে ছুটি দেওয়া হচ্ছিল না। লেডি ডাক্তার আসত, একজন সন্ন্যাসিনী আসত, নার্সরা আসত এবং আমার ব্রেন ওয়াশিং করে চলে যেত। এ ছিল প্রতিদিনের কর্মসূচি। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, এই কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত প্রেমময়। তাদের কথাবার্তায় সমবেদনা ও ভালোবাসা ছিল। তারা আমার সমস্ত পেরেশানী দূর করে দিয়েছিল। সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। আমার বিয়েরও বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। আমিও এই আকর্ষণীয় জালে পুরোপুরি ফেঁসে গিয়েছিলাম।

হাসপাতালে সম্ভবত সেদিন ছিল বিশতম রাত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে জ্বলন্ত বাড়ি দেখতে পেলাম। এ ছিল আমাদের গ্রাম, যা আগুনে

পুড়ছিল। আমি সেই ছোট্ট স্কুলও আগুনে জ্বলতে দেখলাম, যেখানে আমি কুরআনের প্রথম পারা পড়েছিলাম। আমি একা অন্ধকারে পালাচ্ছিলাম। আমি ছিলাম ছয়-সাত বছরের মেয়ে। দু'জন শিখ আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছিল। আমি তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। আর তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল। এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে, দিলের কম্পন নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে গেল। ভয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল। আমি কালিমা পড়তে লাগলাম এবং হাত লম্বা করে বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। তখন বিশ্বাস হল যে, আমি হিন্দুস্তানের কোন ক্ষেতের মধ্যে নয়; হাসপাতালের কামরায় পড়ে আছি।

আমি কালিমা পড়ছিলাম। সেই ভয়ভীতির মধ্যেই আমার মনে পড়ে গেল যে, দুইতিন দিন পর এরা আমাকে খ্রিস্টান বানাবে এবং আমি এদের কয়েদী হয়ে যাব। কামরার মধ্যে আমার বোরকা ঝুলছিল। সিথানে পড়ে ছিল আমার পার্স। আমি পার্স হাতে নিলাম, বোরকা পড়লাম এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেলাম। হাসপাতাল তখন ছিল নীরব। আমি বলতে পারব না, তখন ঘড়িতে কত বাজছিল। দ্রুত পা ফেলে আমি বড় গেট পার হয়ে গেলাম। চৌকিদার আমাকে দেখছিল। সড়ক ছিল বিরান। কিছু দূর গিয়ে একটি টাঙ্গা পেলাম। সে যত পয়সা চাইল, তাতেই আমি হাঁ বলে টাঙ্গায় চড়ে বসলাম। আমি সেই চার উপকারকারী বন্ধুর কাছে পৌঁছলাম। তারা তখনমাত্র বাইরে থেকে এসেছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, রাত একটা বেজে গেছে। তারা আশ্চর্য হল যে, এই মধ্যরাতে কেন এলাম। আমি তাদের কাছে সব বিবরণ পেশ করলাম। তারা আমার মত নামের মুসলমান ছিল; কিন্তু আমার এই কৃতিত্বের বিবরণ শুনে তারা আমাকে বাহবা দিল।

আমার সৌন্দর্য তাকে নগ্ন করল

এখন প্রশ্ন ছিল, আমি কী করব এবং কোথায় থাকব। এখন ওই জোয়ানদের কাছে বেশি সময় থাকা যাচ্ছিল না। থাকতে চাচ্ছিলামও না। তারা কেউ আমাকে শাদী করতে প্রস্তুত ছিল না। আমি কারও উপযুক্ত ছিলাম না। তাদের এই অনুগ্রহই কম ছিল কি যে, তারা এতদিন আশ্রয় দিয়েছে; বরং লুকিয়েও রেখেছে। তাদেরকে আর পরীক্ষায় ফেলতে চাচ্ছিলাম না। কখনও কখনও ঘাবড়ে যেতাম এবং মনে মনে ইচ্ছা করতাম যে, নিজের বাড়িতে চলে যাব; কিন্তু কিছু শঙ্কা আর আশঙ্কা ছিল, যা আমাকে বাড়ি যেতে দিচ্ছিল না। জায়গীরদারের ছেলেকে বললাম, যদি কোথাও ভালো চাকুরি পাওয়া যায়, তা হলে থাকার জায়গা করে নিব। সে ওয়াদা করল যে, চাকুরি খুঁজে দেখবে। তবে থাকার বিষয়টি একটু জটিল ছিল।

আমার বিশ্বাস ছিল যে, যেখানেই যাই না কেন, চাকুরি পাওয়া যাবে। আমার শিক্ষা ভালো ছিল। ইংরেজী স্কুলে পড়ার কারণে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ইংরেজী বলতে পারতাম। কিন্তু আমার আসল বৈশিষ্ট্য ছিল আমার চেহারা-সুরত, স্বাস্থ্য ও যৌবন। কোন পাষণ্ড ব্যক্তিই কেবল আমাকে নিরাশ করতে পারত। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকার বিষয়টি আমাকে পেরেশান করে দিল। আমাদের দেশে নারী চতুষ্পদ জন্তুর মত কাজ করতে পারে; কিন্তু একা বসবাস করতে পারে না। কোন একজন পুরুষের ছত্রছায়া তার দরকার হয়। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, শরীফ জীবনযাপন করব এবং কোন শরীফ ব্যক্তিকে বিয়ে করার জন্য সত্বর চেষ্টা করব।

চারপাঁচ দিন পর আমার বন্ধু একটি প্রাইভেট ফার্মের সংবাদ দিল এবং বলল যে, সেখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রয়োজন। সে এও জানিয়ে দিল যে, লোকটি ভদ্র। আমি পরের দিন তার দপ্তরে গেলাম। চেহারা-সুরতেই তাকে শরীফ মনে হচ্ছিল। বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। আমি তার কামরায় প্রবেশ করলে প্রথমে তিনি চমকে গেলেন। তারপর বিস্ফোরিত নেত্রে দেখতে লাগলেন। আমি পরিচয় দিলে তিনি স্বাভাবিক হলেন। আমাকে বসতে বলে তোৎলিয়ে তোৎলিয়ে বললেন, 'হাঁ; আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার। কিন্তু... কিন্তু... মুশকিল হচ্ছে...।'

'আমাকে নিয়ে আপনার মুশকিল কিছু হবে না।' আমি তার মুশকিল না বুঝেই বলে ফেললাম। 'আমি বিএ করতে পারিনি। তবে শিক্ষা বিএ'র চেয়েও ভালো হবে। আমার কাজ পরীক্ষা করুন। আপনার অসুবিধা কী?'

'আপনি খারাপ মনে করবেন না তো?' তিনি এমন ভঙ্গিতে বললেন, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি চালাক নন এবং নারীদের ব্যাপারে একদম আনাড়ী।

'আপনার মনে যা আছে, বলে ফেলুন। আমি খারাপ মনে করব না। আমি একজন মজবুর মেয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি।'

তিনি বললেন, 'আমার মনে এদিক সেদিকের কোন কথা নেই। আমার আসলে এমন খুবসুরত ও এমন জোয়ান মেয়ের প্রয়োজন ছিল না।' কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললেন, 'যা হোক, আমি আপনাকে রাখছি। ... বোরকা খুলে ফেলুন। যদি আপনি কবুল করেন, তা হলে আপনাকে মাসে তিনশত টাকা বেতন দিব।'

আমি এই বেতন কবুল করলাম। তিনি আমার এ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে সেই কুঠির নাম্বার দিয়ে দিলাম, যেখানে এই চার যুবক আমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। এরপর তিনি আমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তার নিষ্ঠা আমাকে খুব প্রভাবিত করল। আমার মজবুরী না শুনেই তিনি আফসোস করলেন যে, এমন

মেয়েও চাকুরি করতে মজবুর হয়ে গেছে। তার কথার মধ্যে আমার কাছে স্নেহবান পিতার পরিষ্কার ঝলক পরিলক্ষিত হল। আমি মনে মনে তাকে পিতার মর্যাদা দিলাম এবং চিন্তা করলাম, কিছু দিন পর তাকে বলব, আমার থাকারও কোন ব্যবস্থা করে দিন। যদি তার বাচ্চারা পড়াশোনা করে, তা হলে আমি তাদেরকে পড়াব। তিনি আমার সাথে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগলেন।

আমার অবস্থার উপর একটু চিন্তা করুন। আমি ঘর থেকে পালিয়ে ছিলাম। কোন আশ্রয় বা কোন ঠিকানা ছিল না। এই শহরে থাকতে আমার ভয় ছিল যে, বাবা অথবা ভাইদের নজরে পড়ে যাব, কিংবা কোন পরিচিত ব্যক্তি দেখে ফেলবেন। এজন্য আমি নিজেকে বোরকা দিয়ে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। আমি শরীফ জীবনযাপনের কসম করে বসেছিলাম, আমার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এটাই। এই কসমের বিচারে আমার মাবাবা'র ঘরও শরীফ লোকজনের ঘর ছিল না। অন্যথায় আমার জন্য সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল কোন বিলাসী ধনকুবেরের রক্ষিতা হয়ে যাওয়া। আমাদের এখানে এমন লোকের তো অভাব নেই; কিন্তু আমি নিজেকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলাম। তখন আমার ভিতরের হালত এমন ছিল, যেন ভিতরে বড় একটি যখম হয়েছে, অথবা ভিতরে কোন বিষফোড়া হয়েছে, যেটা পাকছেও না; ফাটছেও না। এই পরিস্থিতিতে সান্ত¡নামূলক যেকোন শব্দ আমার অন্তরের ক্ষতের জন্য ছিল বিরাট উপশম। এই বয়স্ক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথাবার্তা আর আচরণে এমনই আসর ছিল, যাতে আমার অন্তর বিমুগ্ধ হচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম, 'আমার কাজ বুঝিয়ে দিন।'

'সারা জীবন তো কাজই করতে হবে, তাই না? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে ভয়ভীতি আর হীনমন্যতা কাজ করছে। যতক্ষণ তুমি আমার এখানে থাকবে, আমি চাই তুমি প্রফুল্ল থাকো।'

এমন আরও অসংখ্য কথা, যেগুলো তিনি এমন আন্তরিকতার ভঙ্গিতে বলছিলেন যে, আমার চোখে পানি এসে পড়ছিল। আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলে ফেললাম, 'আমি ঠিকানাহীন বিতাড়িত

এক নারী। আমার নিজের মাথার উপর আপনার মত কোন বুযুর্গের স্নেহময় হাত এবং একটি ছাদের প্রয়োজন, যা আমার পাপিস্ট অস্তিত্বকে দুনিয়ার নজর থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। জনাব, আমি কদর্যতার বড় একটি রহস্য। আপনি তাকে নিজের বুকে এবং নিজের ছাদের নীচে হেফাজত করতে সহ্য করবেন না।'

এ ছিল আমার একটি দুঃখক্লিষ্ট শিরা, যা আমি তার হাতে দিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, 'তুমি কয়েক দিন পরে বুঝতে পারবে, আমি কী? আমি তোমাকে তোমার গোপন ভেদসহ নিজের বুকে লুকিয়ে ফেলব। যা বলার একটু খুলেই বলো। আমার স্নেহের হাত তোমার মাথার উপর রয়েছে মনে করো।'

তার সাধুতা আমার রগরেশা আচ্ছন্ন করেছিল। আমি যে একটি বাচ্চা জন্ম দিয়ে খ্রিস্টানদের হাতে সোপর্দ করে এসেছি, সে কথা তাকে বললাম না। বাকি সবই তাকে জানিয়ে দিলাম। নতুন সংস্কৃতি আমাকে কীভাবে দংশন করেছিল, সে বিষয় তাকে বিস্তারিত বলে দিলাম। পরিষ্কার ভাষায় তাকে বললাম, 'আমি আপনাকে সঠিকভাবে বলতেও পারব না যে, আমি নিজের দেহ কতবার কতজনকে দান করেছি।' আমি তার দিকে লক্ষ করলাম। তার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না।

'আমি তোমাকে পবিত্র মনে করি। তোমার বদকিসমত, তুমি অনেক সুন্দর। আমি জগদ্রোষ্টা মানুষ। ভালোমন্দ সবই দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, সৌন্দর্য কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। তোমার সৌন্দর্যে এবং তোমার দেহে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কোন ব্যক্তি তোমাকে দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে এবং তোমাকে পাওয়ার জন্য জান-মাল লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি এখন এই জাতের উপর বিরক্ত হয়ে গেছি।' আমি বললাম। 'আমি হয়তো কখনও গোস্বায় নিজের চেহারা নিজের নখ

দিয়ে খুচিয়ে এমন ভয়ানক বানিয়ে ফেলব, যে পুরুষ আমাকে দেখে অস্থির হয়ে পড়ত, সে আমাকে দেখে ঘৃণা করবে।'

আমার মাথায় একটি কৌশল হাযির হল। আমি তাকে বললাম, 'আমার মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তা হচ্ছে বদকার পরিবেশের ফল। আমি চেহারায় পবিত্রতার আসর সৃষ্টি করতে চাই। আপনি আমাকে এমন একটি যিকির বা ওজিফা বাতলে দিন, যা আমি পড়তে থাকব। যেমন, কুরআনের কোন আয়াত হতে পারে। আমি গুনাহের মধ্যে ডুবে ছিলাম; কিন্তু এই মহাসত্য অস্বীকার করি না যে, মুক্তি নামায, রোযা ও কুরআনের মধ্যে। আমাকে কিছু বাতলে দিন, যা আমি পড়তে থাকব এবং যার ফলে আমার অন্তর পাক হয়ে যাবে। চেহারার জৈবিক আকর্ষণ পবিত্রতায় বদলে যাবে।'

এ জাতীয় কথা বলতে বলতে আমাদের মধ্যবর্তী হেজাব উঠে গেল। তবে আমি তাকে বাপই মনে করতে থাকলাম। আমার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ছিল অনেক উর্ধ্বের আর সম্মানের। তিনি আমাকে নামায পড়ার উপদেশ দিলেন এবং বললেন যে, তিনি আমাকে কোন ওজিফা বাতলে দিবেন। খানার সময় ঘনিয়ে আসছিল। একটি বড় হোটেল থেকে খুব কৃত্রিম খাবার আনালেন। আমাকে সাথে বসালেন। তার দপ্তর ছিল অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত। একদিকে সোফাসেট ছিল এবং একটি খাটও রাখা ছিল। আমি বোরকা খুলে ফেলেছিলাম। তার সাথে খাবার খেলাম। এর মধ্যে তার স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন যে, আমার বয়সের তার দুটি ছেলে আছে এবং তাদের ছোট তিনটি মেয়ে। তার স্ত্রী জীবিত আছেন। স্ত্রীর নাম তিনি এমন বিরক্তকর ভঙ্গিতে নিলেন, যেমন ভঙ্গি কোন তিক্ত ও অম্লস্বাদের বস্তুর বেলায় করা হয়ে থাকে। আসল কথা, তিনি স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

'আমি জাগ্রত দিলের অধিকারী মানুষ।' তিনি বললেন। 'কিন্তু স্ত্রী আমাকে জোয়ান কালে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' একথা বলে তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের খাতা খুলে দিলেন। তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, লোকটি নির্যাতিত এবং তিনি খুব রুক্ষ ও বিস্বাদ জীবন অতিবাহিত

করছেন। তিনি জানালেন যে, তিনি দিনরাত মেহনত করেন এবং এই কোম্পানী ও কারখানা তার দিনরাতের নিরলস মেহনতের ফল; কিন্তু তিনি সেই অন্তরঙ্গ আর নির্মল স্বস্তি সারা জীবনে পাননি, যা পুরুষরা নারীর কাছে পেয়ে থাকে। এভাবে তিনি সবিস্তারে জানালেন যে, এক প্রকার তৃষ্ণা তাকে পেরেশান করে রাখে। তার জন্য আমার অন্তরের সমবেদনা সৃষ্টি হল। তিনি যে আমার বিপদকে নিজের বিপদ বুঝে নিয়েছিলেন, এতে তিনি আমার মন শিকার করেছিলেন এবং আমার দৃষ্টিতে তাকে মহাপুরুষ মনে হয়েছিল।

ব্যক্তিগত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সেদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। পরের দিন গেলে তিনি আমাকে বন্ধুদের মত স্বাগত জানালেন। আমি তাকে বললাম, 'অফিসে আমাকে বসার জায়গা বলে দিন।' তিনি জওয়াব দিলেন, 'আমার সামনে বসা কি তোমার পছন্দ নয়? এটাই তোমার জায়গা।' তিনি আমাকে আমার ডিউটি সম্পর্কে কিছু কথা বুঝিয়ে দিলেন। তার কারবারের তথ্য দিলেন। টেলিফোন শোনা এবং জওয়াব দেওয়া শেখালেন। তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ফাইল দেখালেন। সবচেয়ে জরুরী যে কথাটি তিনি আমাকে জানালেন, তা ছিল এই যে, তার তৈরীকৃত মালের বেশিরভাগ ক্রেতা হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর। সেই অধিদপ্তরগুলোর ব্যাপারে জানালেন যে, সেখানকার কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় টেলিফোন করেন। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা খুব জরুরী। কেননা, মালের অর্ডার তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। দিনের অর্ধেক কারবারি কথাবার্তার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হল। হোটেল থেকে খাবার এল, যা আমরা দু'জন খেলাম এবং তারপর ব্যক্তিগত কথাবার্তা শুরু হল।

তিনি বললেন, 'আমার একটি কথায় ভুল বুঝবে না। তুমি তোমার মনের কথাবার্তা আমার সামনে পেশ করেছ এবং আমিও মনের ভিতর যাকিছু ছিল, সেগুলো তোমার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছি। আমার ব্যক্তিগত কথাবার্তা এবং এ জাতীয় কথাবার্তা আগে কারও কাছে বলিনি। কিন্তু তোমার আচরণ, কথাবার্তার সত্যতা ও পেরেশানী দেখে অনুভব করলাম যে, তুমি আমার ভেদজান্তা হওয়ার যোগ্য। আমি

বলতে চাই যে, তোমাকে দেখেই আমার সেই তৃষ্ণা খতম হয়ে যায়, যা আমাকে সবসময় অস্থির করে রাখে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি ভুল বুঝে নিবে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলতে অভ্যস্থ। আমার দুঃখের চিকিৎসা রয়েছে তোমার কাছে। আমি তোমাকে দৈহিক স্ফূর্তির উপকরণ বানাব না। তোমার ইজ্জতের হেফাজত পুরোপুরিই করব। তোমার কাজ শুধু এতটুকু যে, আমাকে ভুল বুঝবে না এবং আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে না।'

তার ভাব এমন ছিল যে, তার একেকটি কথা আমার হৃদয়ের গভীরে গিয়ে জমছিল। সর্বশেষ সে তো আমার বাপ। আমি তাকে ছেড়ে পালাব কেন। আমি তো এমন অকৃতজ্ঞ ছিলাম না। আমি তখনও তাকে বলিনি যে, আমার থাকার বিষয়টি সমাধান করে দিন।

এই দিনটিও অতিবাহিত হয়ে গেল। এভাবে চলে গেল চার দিন। পঞ্চম দিন তখন বিকাল চারটা। অফিসের সবার ছুটি হয়ে গেছে। শুধু তার চাপরাসীকে আটকে রেখেছেন। আমি সেদিন লক্ষ করছিলাম যে, তিনি একটু উদ্ধত ও ক্লান্ত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'শরীর নিয়ে তো ভাবি না। মনে হচ্ছে হৃদয়টা ক্লান্ত হয়ে গেছে। এর চিকিৎসা হওয়া দরকার ছিল আমার ঘরে; কিন্তু আমি ঘরে যেতে ভয় পাই। স্ত্রী এমন ব্যবহার করবেন, যেটুকু স্বস্তি আছে, সেটুকুও খতম হয়ে যাবে।' খুব ব্যথাতুর দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'লোকজন বলে থাকে যে, শরাব ক্লান্ত শিরাউপশিরা চাঙ্গা করে; কিন্তু গুনাহ করতে তবিয়ত সন্ত্রস্ত হয়।'

তিনি উঠলেন এবং সোফায় গিয়ে বসলেন। তিনি আমার অনুগ্রহকারী। তার এই অবস্থা আমার সহ্য হল না। তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং আমার মাথায় হাত রেখে আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে বিরবির করতে থাকল। ভদ্রতাবিবর্জিত কোন কথা তিনি বললেন না; বরং বললেন, 'মনে হচ্ছে আমি তোমার চেয়ে দুঃখী; কিন্তু তুমি ছোট। তোমার দুঃখ কীভাবে নিজের বুকে ধারণ করা যায়, শুধু সেকথাই ভাবছি।'

এরপর তিনি আমাকে টেনে এতটাই কাছে নিলেন যে, আমার মাথা তার বুকের সাথে লেগে গেল। তিনি চুলের মধ্যে মুখ দিয়ে বললেন, 'আমি ভাবতেও পারি না যে, কোন নারীর চুল এত আকর্ষণীয় হতে পারে। আমি পেরেশান। কেননা, তোমার মত ফুল বুকে লাগিয়ে অন্তরে পাশবিক চিন্তা কীভাবে আসতে পারে। তুমি তো একটি ফুল, যার খোশবু হৃদয়ে নেশা সৃষ্টি করে দেয়।'

আসলেই তার মধ্যে নেশা সৃষ্টি হচ্ছিল; কিন্তু তার কোন কাজ আমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছিল না। কারণ, পশুসুলভ কোন আচরণ তিনি করছিলেন না। তার নিয়ত খারাপ, এমন সন্দেহও তার প্রতি হয়নি। তিনি যখন আমার চেহারা উপরে তুলে আমার দুটি চোখে পর্যায়ক্রমে চুমু দিতে দিতে বললেন, 'সৃষ্টির সৌন্দর্যের শোকর আমি কীভাবে আদায় করব।' তখনও আমি খারাপ মনে করিনি; আমি বরং সেই খুকি মেয়ের মত প্রশান্তি অনুভব করছিলাম, যাকে তার বাবা বুকে নিয়ে আদর করে। এরপর তিনি আমার গালের সাথে তার একটি গাল লাগালেন এবং আরও একটু পরে তার ঠোঁট ছিল আমার ঠোঁটের উপর। আমি তারপরও বাধা দিচ্ছিলাম না। আমার ঠোঁটের সাথে পুরুষের ঠোঁট মিলবার এ তো প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে পার্থক্য ছিল। অনেক পার্থক্য ছিল। সেই ঠোঁটগুলোর মধ্যে পাশবিকতা ছিল; আর এ ছিল পিতার ঠোঁট। আমার এই অনুভূতিও ছিল যে, তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। তার বিনিময়ে তাকে একটি স্বস্তি দিচ্ছি। তার অনুগ্রহ শুধু এটুকু ছিল না যে, তিনি আমাকে তিনশত টাকার চাকুরি দিয়েছিলেন; বরং তার আসল অনুগ্রহ ছিল এই যে, তিনি আমার দুঃখবেদনাকে নিজের দুঃখবেদনা মনে করেছিলেন এবং আমাকে নিরাপরাধ ও পবিত্র বলে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

আমি যখন সেখান থেকে বের হলাম, তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। তার আত্মা শান্ত হয়েছিল কি না, আমি জানি না। তবে আমার মন হালকা হয়ে গিয়েছিল। এর রহস্য ছিল পিতার আদর।

আমাকে ঘুসহিসেবে চেয়েছিল এক অফিসার

এই সন্ধ্যার পর প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি মানসিক ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। সোফার উপর আড়ষ্ঠ হয়ে বসে পড়তেন। আমাকে বসাতেন পাশে। এরপর আমার চুল, আমার চোখ, আমার গাল ও ঠোঁটে চুম্বন করতে করতে দেওয়ানা হয়ে যেতেন। সম্ভবত সপ্তম বা অষ্টম দিনে তিনি সোফার উপর শুয়ে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ো। একটু বিশ্রাম নাও।' তিনি এত ক্লান্ত ছিলেন যে, ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আমারও চোখ বন্ধ হয়ে গেল। আবার একটু পরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, তিনি খাটে আমার পাশে শুয়ে আছেন। তার একটি হাত আমার গর্দানের নীচে ছিল। আমার মুখ লেগেছিল তার মুখের সাথে এবং আমার একটি পা ছিল তার পায়ের উপর। আমি চমকে গেলাম; তবে সামলে ফেললাম।

প্রতিদিনের অকৃত্রিমতার জের ধরে আমি হেসে ফেললাম। তিনি অপর হাতখানা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিজের উপর টেনে তুললেন। তখন আমি খেয়াল করলাম, তার শ্বাস-প্রশ্বাস উদ্ধত। তার চোখ অসাধারণ লাল এবং তিনি সেই ব্যক্তি নন, যাকে আমি বাপ মনে করেছিলাম। আমি পুরুষদেরকে এমন অবস্থায় অনেক দেখেছিলাম। তারপরও আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম যে, না; এই বুযুর্গ সেই আওয়ারা যুবকদের মত নয় এবং তিনি ওই ডাক্তার থেকে অনেক উর্ধ্বের। কিন্তু তিনি আমাকে অতিসত্বর আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের করে

দিলেন। তার একটি হাত আমার পায়জামার রশি খুঁজছিল। আমি এক ঝাকি দিয়ে তার নাগাল থেকে বের হয়ে বসে পড়লাম। অন্তরের ভিতর এমন ব্যথা অনুভূত হল যেন বুযুর্গ আমার কলজের মধ্যে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। বন্ধ হয়ে গেল যবান। আর কী কী হল বলতে পারি না।

তিনি খাটে পড়ে ছিলেন। যেন তিনিও ব্যথিত হয়ে ছিলেন। অনুরোধের ভঙ্গিতে তার দুই ঠোঁট থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এল, 'না।'

আমি গোস্বায় ফেটে পড়লাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না। আমি নিজের বাপকে নাপাক করব না। আমি নিজের পাপিষ্ট দেহের অপবিত্রতার ছিঁটা আপনার বুযুর্গীর উপর পড়তে দিব না।'

আমার আওয়াজের মধ্যে হয়তো ঘৃণার ভঙ্গি ছিল। তিনি উঠলেন এবং গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমাকে মাফ করে দাও। তুমি হচ্ছ সেই শরাব, যা দেখে দরবেশেরও কসম ভেঙে গিয়েছিল। আমি অপরাধী।'

মনে নেই, তিনি আরও কী কী বলেছিলেন। আমি সেই শিশুর মত, যার খেলনা ভেঙে গেছে, তার বুকের ভিতর মুখ ডলে ডলে এত কাঁদলাম যে, আমার হেচকি বন্ধ হয়ে গেল। তিনি মাফ চেয়ে চেয়ে এবং অনুরোধ করে করে আমাকে আমাকে সান্ত¡না দিলেন। যখন আমার তবিয়ত শান্ত হল, তখন আমি তাকে বললাম, 'আমার গুনাহখাতার ব্যাপারে অবগত হয়েছেন বলেই আপনি নিজের উপর এই ভূত সোয়ার করিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে এমন কোন ওজিফা বাতলে দিন, যা পড়ব এবং নিজের অন্তরকে গুনাহখাতার অপবিত্রতা থেকে ধুয়ে ফেলব। আমি তো আপনাকে নিজের পীর, উস্তাদ ও বাপ মনে করেছিলাম।'

তিনি আমাকে আর বলতে দিলেন না। তিনি বললেন, 'এখনও তুমি আমাকে তা-ই মনে করো, যা আমাকে আগে মনে করেছিলে। দেখো, আমি তো মানুষ এবং তৃষ্ণার্ত। ফেরেশতা নই। নেকী ও বদীর

মাঝে একটি রেখার পার্থক্য। তোমাকে শুয়ে থাকতে দেখে এমন ধাক্কা অনুভব করছিলাম যে, আমি রেখার অপর প্রান্তে গিয়ে পড়লাম। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দাও।'

আমি তাকে মাফ করে দিলাম। কিন্তু অন্তরে একটি দাগ বসে গেল। সেটা মুছল না। আমি চিন্তা করলাম, পুরুষ মানুষ কত দুর্বল। আমি তো এত কমজোর ছিলাম না। কত প্রকারের নেশা ছিল, যেগুলোয় আমি অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বলা হয় যে, মানুষ কোন নেশা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু আমি একবার ইচ্ছা করার পরই সিগারেটের ধোঁয়া থেকে বমির ভাব অনুভব করতাম। আমি সিগারেটের মধ্যে গাঁজা ভরে পান করতাম। সেই রাতে স্বস্তিতে ঘুমাতেও পারলাম না। একটি তিক্ত ধারণা বার বার জাগিয়ে দিচ্ছিল যে, নারী হওয়া, জোয়ান হওয়া এবং খুবসুরত হওয়া কত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। জোয়ান মেয়ে সেই ব্যক্তির উপরও ভরসা করতে পারে না, যাকে সে বাপ মনে করে। এই সোসাইটিতে নারীর ব্যবহার এ-ই যে, ঘরে স্বামীর বাসনা পূরণ করে। সন্তান জন্ম দিতে থাকে এবং অকালেই বুড়ো হয়ে যায়। আর যদি অপারগ হয়ে নিজের উপর ভর করে বাঁচতে চায়, তা হলে প্রত্যেক ওই পুরুষের বিবাহবহির্ভূত স্ত্রী হয়ে যেতে হয়, যার সাথে তাকে কখনও মুখোমুখি হতে হয়।

আমি মজবুর ছিলাম। সকাল বেলা অফিসে যেতে ইচ্ছা করছিল না। অপারগতা ছিল। এজন্য চলে গেলাম। খোদার শোকর, তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং নিজেও সামলে গিয়েছিলেন। আখের তিনি পোড়খাওয়া মানুষ এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি আমাকে কথাবার্তার মারপ্যাঁচে ফেলে দিলেন। সেই দিনেরই কথা, তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কোন এক অধিদপ্তরের এক অফিসার এলেন। মধ্যম বয়সের লোক। ডিরেক্টর তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অফিসার যেই দৃষ্টিতে আমাকে প্রত্যক্ষ করছিলেন, সেই দৃশ্য আমার এখনও মনে আছে। তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ডিইরেক্টর আমাকে জানালেন যে, এই অফিসারের মাধ্যমে তিনি সরকারী অনেক কাজ পেয়ে থাকেন। এখন

প্রায় পৌনে দুই লাখ টাকার একটি অর্ডার আছে; কিন্তু আরেকটি কোম্পানী অনেক ভারী সুপারিশ ও ঘুসের মাধ্যমে এই অর্ডার হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এই অফিসার ডিইরেক্টরকে একথাই বলতে এসেছিলেন। অর্ডার মূলত ছিল এই অফিসারের হাতেই; কিন্তু তিনি ঘুসের অধিক মাত্রা জানবার জন্য এসেছিলেন।

পরের দিন ডিরেক্টর অফিসারের সাথে দেখা করতে চলে গেলেন। দপ্তরে আমি ছিলাম একা। কোন কাজ ছিল না। ডিরেক্টরের টেবিলের বিভিন্ন ড্রয়ারের চাবি টেবিলের উপর পড়ে ছিল। আমি সময় পার করার জন্য ড্রয়ারগুলো খুলতে শুরু করলাম। আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয় ড্রয়ারে কিছু কাগজ ছিল। সেগুলোর মধ্যে বড় একটি খাম দেখতে পেলাম। খুললে বিভিন্ন উলঙ্গ ছবি বেরিয়ে এল। ওই ছবিগুলোই, যেগুলো আমি কয়েক বার দেখেছি। এগুলো আমার জন্য কোন নতুন জিনিস ছিল না। আমার ধ্বংসের ক্ষেত্রে এসব ছবিরও বিরাট ভূমিকা ছিল। আমি ছিলাম এই প্রজন্মের একটি নির্বাচিতা মেয়ে, যে ছিল এসব ছবির প্রেমিক বরং এসব ছবির উৎপাদন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপারই ছিল। কেননা, এগুলো একজন বুযুর্গের ড্রয়ারে ছিল এবং এগুলো তিনিই রেখেছিলেন। অন্যকেউ তো আর রেখে যায়নি। এগুলো দেখে তার সমস্ত কারবার আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

ছবিগুলো দেখে আমি দেরাজ বন্ধ করে দিলাম। এই বুযুর্গ কত বড় ফেরেব, আমি সেই ভাবনায় ডুবে গেলাম। তিনি প্রথমে আমার দুঃখবেদনা নিয়ে কথা বলেছিলেন। তারপর নিজের নিপীড়িত হওয়া আর তৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলেন। আমার শিরা-উপশিরায় স্নেহের রং জমিয়ে আমাকে তার বুযুর্গীর জালে আটক করেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই স্থানে, যেখানে তার আশা ছিল যে, আমি কোন প্রকার আপত্তি না করে নিজেকে তার কাছে ন্যস্ত করব। আমার যে দুঃখ হল, তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। আমি এখন কোথায় যাব, সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলাম। ব্যাপার শুধু এটুকু ছিল যে, আমি শরাফতের জীবন যাপন করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এই ইচ্ছা আর কসম ভেঙে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি এমনই চিন্তায় বিভোর ছিলাম, ইতোমধ্যে তিনি এসে পড়লেন। আচানক আমার মাথায় খেলে গেল যে, এই চাকুরিটি আমি ছাড়ব না। এরপর আবার যদি তিনি বদনিয়ত প্রকাশ করেন, তা হলে ছেড়ে দিব। কিন্তু সেদিনই আমার চাকুরির শেষ দিন প্রমাণিত হল। তিনি অনেক মূল্যবান খাবার আনালেন। কথাবার্তায় তিনি অসাধারণ সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তাতে আমি বুঝে ফেললাম, আজ তিনি আমাকে কোন জালে আটকে ফেলতে চাইছেন। আমার আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হল না। প্রথমে ভূমিকা পেশ করে তিনি সেই অফিসারের কথা তুললেন, যিনি গতকাল দেখা করতে এসেছিলেন। আমার কাছে নিজের শারাফতের ঢাক পেটালেন। এরপর আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমার বেতন তিনশত নয়, চারশত হয়ে যাবে। এবং শেষে বললেন, যায়দী সাহেব গতগাল তোমার কথায় অনেক মুগ্ধ হয়েছেন। আজ রাতে তিনি তোমাকে অমুক হোটেলে দাওয়াত করেছেন। তিনি বলছিলেন, 'তোমার সাথে একটু গপশপ করবেন।'

'আপনি তাকে বলেননি যে, আমি কারও সাথে দেখা করি না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বলেছিলাম।' তিনি জওয়াব দিলেন। 'কিন্তু তিনি আমাকে মজবুর করেছেন, যেন তোমাকে আমি তার কাছে পাঠিয়ে দিই। তুমি তার কাছে যাও। আমি তাকে নারাজ করতে চাই না। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তার হাতে রয়েছে পৌনে দুই লাখ টাকার অর্ডার। তিনি আমাকে এই ওয়াদাও করেছেন যে, যদি তুমি আজ তার কাছে চলে যাও, তা হলে এই অর্ডার বাদে পঞ্চাশ হাজার টাকার আরও একটি অর্ডার দিবেন।'

'তা হলে তিনি আমাকে আপনার কাছে ঘুস হিসেবে চেয়েছেন?' আমি বললাম।

'মনো করো তা-ই।' তিনি বললেন। 'আমি তোমাকে জবরদস্তি করে পাঠাতে পারব না। তুমি যেহেতু বিষয়টি বুঝে ফেলেছ, সেহেতু আমাকে খুলে কথা বলতে দাও। এটা তোমার জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। আমার খাতিরে চলে যাও। সামান্য কুরবানী করো। যদি অর্ডার দুটি

পেয়ে যাই, তা হলে কোম্পানী এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা মুনাফা করতে পারবে।'

আমি অস্বীকার করে দিলাম।

'আমি তোমাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিব।' তিনি বললেন। 'তিনি তোমাকে পুরো রাত রাখবেন না; শুধু দুইতিন ঘন্টা। আমি তাকে বলেছিলাম যে, তুমি এমন মেয়ে নও।'

দুই হাজার টাকা আমার জন্য ছিল বিরাট অংক। কিন্তু ঘুস হিসেবে ওই অফিসারের কাছে যেতে মন একেবারেই সায় দিল না। আমি ভাবতে লাগলাম, পাকিস্তানের সরকারী মেশিনারিজ এমনই নাপাক পন্থায় চলছে? এরাই সেইসব লোক, যারা আমার মত মেয়েদেরকে আওয়ারা ও বদকার বলে থাকে। এই হচ্ছে সেই হুকুমত, যা পতিতাবৃত্তির বাজার বন্ধ করে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে সেই হুকুমত, যার আমলাতন্ত্রের নেযাম চলে পতিতাবৃত্তির উপর।

'বেশি ভেবো না।' তিনি বললেন। 'চলে যাও। যদি আমার উপর বিশ্বাস না থাকে, তা হলে দুই হাজার টাকা এখনই নিয়ে নাও।'

'আমি ভেবেছি, আমি যাব না।' আমি বললাম। 'আমি এখন ভাবছি, এই দেশে মেয়েদেরকেও ঘুসহিসেবে দেওয়া নেওয়া করা হয়।'

'এতে তাজ্জব হওয়ার কী আছে।' তিনি বললেন। 'এ হচ্ছে এখানকার সংবিধান। যদি তুমি আমার সাথে থাক, তা হলে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার অর্ডার আনতে পারব। তোমার চাওয়ামত কমিশন দিব।'

আমি বিস্মিত ছিলাম। কেননা, এই বুযুর্গ, যার কথাবার্তায় নিষ্ঠা দেখে তাকে বাপ মনে করেছিলাম, কিন্তু তিনি নিম্ন শ্রেণির লোকজনের ভাষায় কথা বলছিলেন। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

তিনি বললেন, 'যদি তোমার অতীত পাকসাফ হত, তা হলে তোমাকে এমন কথা বলতাম না। তুমি আমার উপর প্রভাব সৃষ্টির জন্য শরীফ হওয়ার ভান করছ।'

'সংকোচ তো টুটেই গিয়েছিল।' আমি বললাম, 'আপনি এক কাজ করুন, আমাকে রক্ষিতা বানিয়ে রাখুন। আমার থাকার ব্যবস্থা করুন। মাসে আমি পাঁচ হাজার টাকা নিব এবং যখন আপনি আমাকে কোন অফিসারের কাছে ঘুস হিসেবে পেশ করবেন, তখন একরাতে দুই হাজার টাকা নিব। বলুন, মঞ্জুর?'

'আফসোস! তুমি আমার আন্তরিকতা বুঝতে পারলে না।' তিনি বললেন।

আমি বোরকা তুলে নিলাম এবং যত দিন তার দপ্তরে যাওয়া-আসা করেছিলাম, তারও বেতন না নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তার আন্তরিকতা এর অধিক বুঝবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বন্ধুদের কুঠিতে গেলাম না। চলতে থাকলাম এবং বাগানে গিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলাম। এক কোণায় বেঞ্চ পড়ে ছিল। নেকাব নামানো ছিল। আমি বসে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম, নারী কী করতে পারে? কার কী বিগড়ে দিতে পারে? নারী একটি খেলনা। পয়সাওয়ালা তাকে খরিদ করে। তার সাথে খেলা করে। তার কাছ থেকে তৃপ্তি গ্রহণ করে। আমিও খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অভিযোগ করার অধিকার আমার ছিল না। কেননা, এই গুনাহ আমারই ছিল, যার সাজা আমিই পাচ্ছিলাম। আমি আরও চিন্তা করলাম যে, এই দেশে আমার মত হাজারও মেয়ে আছে, যারা আমার মত বিভিন্ন খাদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে এবং হাজারও এমন রয়ে থাকবে, যারা আত্মসমর্পণ করে কোন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে এক খাটে ঘুমিয়ে থাকবে। স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অফিসারদের কাছে ঘুস হিসেবে উপস্থিত হয়ে থাকবে। হোটেলের বিভিন্ন কামরায় পতিতাবৃত্তির আড্ডায় নীলাম হয়ে থাকবে। তারাও আমার মত গুনাহখাতা থেকে তওবা করে তওবার ভাঙা নাও সাগরে নামিয়ে থাকবে, যেখানে কামনা, উত্তেজনা এবং বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নেই। মজবুর নারীদের কসম ভঙ্গা হয় না; ভেঙে দেওয়া হয়।

আমার মাথায় খেয়াল এল যে, আমি তো পাগল। আমি ডিরেক্টরের কথা মানলাম না, তাতে কী হল? তিনি দুই হাজারের লোভ দেখিয়ে অন্যকোন মেয়েকে পাকিস্তানের সেই অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিবেন, যার হাতে একটি অর্ডার আছে পৌনে দুই লাখ এবং অপরটি আছে পঞ্চাশ হাজারের। পাকিস্তানের সরকারী মেশিনারী চালানোর জন্য দেশে আমার মত মেয়ের তো অভাব নেই। এই খেয়াল আমার আগুন ভরকে দিল। আমি গোস্বায় উঠে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে হল যে, ফিরে গিয়ে তাকে বলি, লও দুই হাজার টাকা। আমি আজ রাতে তার কাছে চলে যাব। বলতে পারব না, কোন্ এক আবেগ আমাকে ফিরে রাখল এবং আমি সেই চার জোয়ানের কাছে চলে গেলাম, যারা আওয়ারা ছিল। তারা অসভ্য ছিল; কিন্তু আমাকে হেফাজত করেছিল। তারাই ছিল আমার আশ্রয়, যারা রাতে ইউরোপিয়ান হোটেলের ভিতরে নিত্য নতুন মেয়েদের সাথে নাচত এবং চোরা কামরায় গিয়ে তাদের সাথে ফূর্তি করত; তবে তারা আমার আব্রুর মোহাফেজ ছিল।

খদ্দের হয়ে এল আপন ভাই

তারা আমাকে পরামর্শ দিল যেন কোন স্কুলে চাকুরি নেওয়ার চেষ্টা করি। হতে পারে, সেখানে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জায়গীরদারের পুত্র আমাকে অনেক পয়সা দিয়ে দিল এবং আমি শহরের মাটি পরখ করতে শুরু করলাম। কোন সরকারী স্কুলে আমার চাকুরি হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, আমার কাছে কোন ডিগ্রী নেই। প্রাইভেট স্কুলের কোন ঠায়ঠিকানা ছিল না। এগুলো বেশিরভাগ ছিল মহল্লায়। আমি শহরের একদিক থেকে স্কুল অনুসন্ধান শুরু করলাম। ভয় ছিল, এই অনুসন্ধান হয়তো আমাকে হতাশ করে দিবে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট স্কুল দেখতে লাগলাম। প্রাইমারী, মডেল ও হাই- কোনটার অভাব নেই। কেউ কেউ তো বাড়িতেই স্কুল খুলে বসেছিলেন। স্বামী ছিলেন স্কুলের ম্যানেজার বা ক্লার্ক, আর স্ত্রী হেড মিস্ট্রেজ। একটি স্কুল সেটাও ছিল, যেখানে আমি পড়েছিলাম। বাদশা, উজির ও আমীর শ্রেণির বাচ্চাদের স্কুল। আর একটি স্কুল ছিল এমন, যার একেকটি কামরায় শতশত শিশু ফরাশে বসে ছিল। কামরাগুলো ছিল সংকীর্ণ, অন্ধকার ও নোংরা। ধারণক্ষমতার চেয়ে শিশুর সংখ্যা ছিল বেশি। গরীব মাবাবা বাচ্চাদেরকে এসব স্কুলে ভর্তি করতে মজবুর ছিল। এখানে তারা ভর্তির সুযোগ পেয়ে যেত। এসব স্কুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

আমি যেই মহল্লায় গিয়েছি, সেখানেই একটি করে স্কুল দেখতে পেয়েছি। আমি প্রত্যেক স্কুলে গিয়ে হেড মিস্ট্রেজের কাছে চাকুরি প্রার্থনা করলাম এবং বললাম, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছি; কিন্তু চারটি স্কুল থেকে আমাকে পরিস্কার জওয়াব দেওয়া হল। আমি পুরো শহর

তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। স্কুলের অভাব ছিল না; অভাব ছিল চাকুরির। এক স্কুল শুধু ষাট টাকা মাসিক বেতনের প্রস্তাব পেশ করল; আরেকটি একশত টাকা। এই বেতন ছিল খুবই কম। আমি যদি অন্যকোন প্রাইভেট কোম্পানীতে যেতাম, তা হলে তিন গুণ বেতন নিতে পারতাম; কিন্তু আমি পুরুষসমাজের কামনা থেকে দূরে থাকতে চাইছিলাম। আমার এই অনুভূতি হয়ে গিয়েছিল যে, আমি জোয়ান ও খুবসুরত এবং আমার সবচেয়ে বড় কমজুরি হচ্ছে আমি আশ্রয়হীন, পালাতক ও মজবুর। আমি মানতেই পারছিলাম না, এই সমাজে কোন পুরুষ এমন পাওয়া যেতে পারে, যে আমাকে নিজের মেয়ে অথবা বোন মনে করবে। এই আশঙ্কা থেকেই কোন স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল আলাদা বাসা নিয়ে শরীফ জীবন যাপন করব। কোন শরীফ মানুষ পাওয়া গেলে তার সাথে শাদী করব। মহল্লার দুচারটি ছেলেমেয়েকে পড়াব। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য নিজেকে ওয়াক্ফ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; কিন্তু ইজ্জতের সাথে আলাদা বাসা নিয়ে থাকার জন্য ভালো বেতনের প্রয়োজন ছিল।

চার যুবক এখনও আমাকে সামলে যাচ্ছিল। আমি লক্ষ করছিলাম, আশপাশের কুঠিওয়ালারা যাওয়া-আসার সময় আমাকে সন্দেহের নজরে দেখত। নেকাব নামানো থাকত। বাইরের কোন ইনসান আমার চেহারা কখনও দেখেনি। কেউ আপত্তি করতে পারত না যে, একজন নারী চার যুবকের কাছে থাকে। কেননা, আমরা কুঠির মধ্যে কখনও কোন অপকর্ম করিনি; শোরগোল করিনি। একদিন আমি খানসামাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আশপাশের লোকজন আমি কে, সে কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করে থাকবে। সে জানিয়েছিল, একবার নয়; কয়েক ব্যক্তি বহুবার জিজ্ঞেস করেছে। খানসামা ছিল ঝানু লোক। সবাইকে সে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জায়গীরদার-পুত্রের বোন। কলেজে পড়ে। এই সতর্কতা সত্ত্বেও আমি সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি বের হতে চাইছিলাম। ওই শহর থেকেই বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। শহর অনেক বড়। কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। তারপরও ভয় ছিল, হয়তো আমার বাবা, ভাই অথবা মহল্লার অন্যকোন ব্যক্তি আমাকে চিনে

ফেলবে। কিন্তু যাব কোথায়, সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন। একদিন তো আশঙ্কা বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছিল। সে দিন আমি চারটি স্কুলে গিয়েছিলাম। গলি গলি, আর বস্তি বস্তিতে ঘুরে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রিকশা বা স্কুটারের অপেক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। খুব কাছে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল লোকজন। একটি স্কুটার আমার কাছে এসে মন্থর হয়ে গেল। তাতে দুই যুবক সোয়ার ছিল। একজন আমার ভাই, আরেক জন তার বন্ধু। দু'জনই আমাকে দেখে আগে চলে গেল। আমার নেকাব নামানো ছিল। স্কুটার সামান্য একটু সামনে গিয়ে থেমে গেল। পেছনে বসা ছেলেটি নেমে গেল। আমার ভাই স্কুটার পিছিয়ে আনল। আমার ভয় হল, সে হয়তো আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি সেখান থেকে চলে যেতে লাগলাম। স্কুটার আমার কাছে এসে পড়ল। ভাই আস্তে করে বলল, 'এসো'। আমি বুঝে ফেললাম, সে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি কিছু বললাম না, যাতে সে বুঝে নেয় যে, আমি শরীফ নারী। কিন্তু সে আমার পেছনে আসতে থাকল।

মনে হল, গালাগালি করে ওকে ধমকিয়ে দিই। কিন্তু আমার পজিশন ছিল দুর্বল। আমি থামলাম, ক্ষীণ আওয়াজে বললাম, 'তুমি তো এখনও শিশু। এখনই কোন্ চক্করে পড়েছ।' সে সময় তার বয়স ২২, ২৩ বছর হয়ে গেছে। তখন এক বছর আগে ওদেরকে ছেড়ে এসেছিলাম।

'আমি শিশু?' সে বলল। 'আমি পুরো জোয়ান হয়ে গেছি। তুমি চেহারা না দেখালেও আমি জানি, তুমি আমার বয়সের মেয়েই হয়ে থাকবে। তোমার হাত খুব সুন্দর। চলো, খুব ভালো হোটেলে যাব। কামরা পাওয়া যাবে।'

আমার কান্না পেল। কিন্তু ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। এ ছিল আমার ভাই। বড় আদরের। ওর গলা জড়িয়ে ধরার জন্য অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। এক সেকেন্ডে আমার মনে পড়ে গেল ১৯৪৭'এর কথা, যখন আমরা হিন্দুস্তান থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিলাম। আমার এই ভাইয়ের বয়স ছিল তখন বারো বছর। ওই বয়সেই সে জোয়ান হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুৎপিপাসা আর ক্লান্তি সে নিজের ক্ষুদে শরীরে শুষে

নিয়েছিল। সে কাঁদেনি; বরং আমি কেঁদেছিলাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আমাকে সে বলছিল, পাকিস্তান অনেক সুন্দর। সেখানে আমরা সুন্দর ঘর পাব। সে আমাকে এমন উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলে বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু এত সুন্দর পাকিস্তানে এসে আমরা ভাইবোন এত নোংরা হয়ে গিয়েছিলাম। বোনও আওয়ারা, ভাইও আওয়ারা। ভাই নিজের বোনকে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছিল। ওর তো পাকিস্তানের মোহাফেজ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু কী হয়ে গিয়েছিল।

অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল আমার। ও বলল, 'কী ভাবছ। এসো, চলো। আমরা দু'জন। খানা খাওয়াব; হুইস্কি পান করাব। যত পয়সা চাইবে, দিয়ে দিব।'

আমার আত্মা হয়তো কণ্ঠে এসে পড়েছিল। কিছুই বলতে পারলাম না। নীরবে হাঁটতে শুরু করলাম। সুবিধা হল। কেননা, ইশারা দেওয়ার সাথে সাথে একটি রিকশা এসে থামল এবং আমি দৌড়ে গিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। ওই রাতে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত আমি কেঁদেছিলাম। চোখের সম্মুখ থেকে ভাইয়ের চেহারা সরছিল না। বাড়ির সবার কথা মনে পড়ছিল। কয়েক বার মনে হয়েছিল, বাড়ি চলে যাব এবং বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে বলব, আমাকে মাফ করে দিন এবং বুকে জড়িয়ে ধরুন। সেভাবেই কাঁধে তুলে নিন, যেভাবে হিন্দুস্তান থেকে তুলে এনেছিলেন। কিন্তু আমি এই ইচ্ছা পদদলিত করে দিলাম। বাবার সেই নগ্ন গালির কথা মনে পড়ে গেল, তালাকের সময় যা তিনি বকেছিলেন। আমার চোখে তার সেই চেহারাও প্রকাশ হতে লাগল, যার মধ্যে ছিল ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য। তা ছাড়া এক বছরের অনুপস্থিতির পর তিনি হয়তো আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতেও পারতেন না।

আমার মানসিক অবস্থা এমন বিগড়ে গেল যে, আমি বুলন্দ আওয়াজে বললাম, 'আমি কারও মেয়ে নই; আমি কারও মেয়ে নই।' এবং কামরার মধ্যে একা একা অনেক ক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলাম।

স্কুল ছিল, না কি অন্যকিছু?

পরের দিন শহরের আরেক অংশে অন্যকোন স্কুলের সন্ধানে বের হলাম। সেখানে দুটি স্কুল ছিল। একটিতে সোজা জওয়াব পেয়ে গেলাম। অপরটিতে গেলাম তো সেখানকার মধ্য বয়স্কা হেড মিস্ট্রেজ আমাকে বসালেন। পরিশীলিত মহিলা মনে হচ্ছিল তাকে। এই স্কুলটি ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং শুধু মেয়েদের জন্য। একটি পুরনো দ্বিতল বাড়ি। নীচে স্কুল। হেড মিস্ট্রেজ উপর তলায় থাকতেন। তিনি ছিলেন বিধবা। এই স্কুলের মালিক, ব্যবস্থাপক ও সবকিছু ছিলেন এই মহিলার সমবয়স্ক এক লোক। তার ব্যাপারে জানা গেল, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তখন ছিল আইয়ুবের আমল, যখন ডিবি মেম্বার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইন নিজের হাতে নিয়ে যা ইচ্ছা করতেন। কোন নাগরিক তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে ইশারাও করতে পারত না।

হাবেলীর পুরনো ও দুর্গন্ধময় কামরায় শিশুরা চাটাইয়ের উপর একজন আরেক জনের সাথে এমনভাবে এঁটে বসেছিল, যেমন কোন বক্সের মধ্যে জিনিসপত্র ঠেঁসে রাখা হয়েছে। শোরগোল ছিল বরদাশতের বাইরে। এ ছিল সেইসব স্কুলের একটি, যেগুলোর প্রতি আমার ঘৃণা হত। আপনারও সেগুলোর প্রতি নিঃসন্দেহে ঘৃণা হবে। এসব স্কুলের সৌন্দর্য একটিই, আপনি এখানে খুব সহজে শিশুকে ভর্তি করাতে পারবেন। মধ্য বয়সী হেড মিস্ট্রেজ আমাকে বসালেন। আমাকে ব্যক্তিগত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি সেগুলোর মিথ্যা জওয়াব দিলাম। তার আচরণ আর কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আমাকে চাকুরির জন্য নির্বাচন নয়; বরং পছন্দ

করেছেন। এমন কি আমি কে, কোথায় থাকি এবং আমি কেমন, তার কোন তোয়াক্কা নেই। তিনি বললেন, চৌধুরী সাহেব এখনই এসে পড়ছেন। বেতন-ভাতা তিনিই নির্ধারণ করবেন।

এরপর তিনি চৌধুরী সাহেবের এমন লাগামহীন প্রশংসা করলেন যে, আমি তাকে ফেরেশতা মনে করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর চৌধুরী সাহেব এলেন। হেড মিস্ট্রেজ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার আবেদন বয়ান করলেন। চৌধুরী সাহেব মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাকে দেখলেন। এরপর শাসকের ভঙ্গিতে বললেন, আমি শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে খুব শক্ত। অভিভাবকরা শিশুদেরকে এখানে পাঠান, যাতে আমরা তাদের আলোকিত ভবিষ্যতের বুনিয়াদ গড়ে দিই এবং তাদের কর্মজীবনের কাঠামো স্বচ্ছ ও মজবুত করে দিই। এই যিম্মাদারী পুরো সাধুতার সাথে তোমাকে সামলাতে হবে। আমি তোমাকে দুইশত টাকা বেতন দিব। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজী ও গণিত তুমি নিবে। আমি তিন মাস পর্যন্ত তোমার কাজ দেখব। যদি হেড মিস্ট্রেজকে তুমি আশ্বস্ত করতে পার, তা হলে আমি তোমাকে স্থায়ী করে দিব। হতে পারে কিছু উন্নতিও দিয়ে দিব।

তার কথা আমার কাছে খুব ভালো লাগল। আমিও শিশুদের কর্মজীবনের কাঠামো স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় করতে চাইতাম। আমি ভাবলাম, এটাই আমার মঞ্জিল। দুইশত টাকার বেতন আমি কবুল করলাম। আমার ক্লাস দেখিয়ে দেওয়া হল। জানতে পারলাম, এক শিক্ষিকা চাকুরি ছেড়ে চলে গেছেন। আমি সেদিনই হেড মিস্ট্রেজের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশনা নিলাম। দেখে নিলাম পঞ্চম শ্রেণির ইংরেজী ও গণিতের বইপুস্তক। কিছুক্ষণের জন্য ক্লাসে গেলাম এবং ছুটি হয়ে গেল। সমস্ত শিক্ষিকার সাথে দেখা হল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ করলাম, সব শিক্ষিকা জোয়ান ও খুবসুরত। অন্য স্কুলগুলোতে এই দৃশ্য নজরে পড়েনি। কোন কোন শিক্ষিকাকে চাপরাসীদের স্ত্রী মনে হচ্ছিল। এই স্কুলের শিক্ষিকাদের মধ্যে একটি সৌন্দর্য লক্ষ করছিলাম যে, তারা অশ্লীল পর্যায়ের অকৃত্রিম ছিলেন। তারা প্রথম সাক্ষাতেই

হাসিমজাক শুরু করে দিলেন। একজন বললেন, 'চৌধুরী সাহেব বড় ভালো মানুষ। তোমার বেতন অতিসত্বর বাড়িয়ে দিবেন।'

তাদের মধ্যে একজন খুব রসিক ও মুখরা ছিল। সে বলল, 'তোমার চুল যে সুন্দর, আর পাগলকরা চোখ, চৌধুরী সাহেব বেতন কেন বাড়াবেন না।'

সবাই খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলেন। আমি হাসলাম। অনেক দিন পর আমি হাসলাম। এতে আমার সংকুচিত শিরা-উপশিরায় স্বস্তি লাভ হল। আমি তো এমন স্বস্তির সন্ধানেই ছিলাম। আমার নির্জীব অন্তর জাগ্রত হল। হাসিমজাক চলল অনেক ক্ষণ। আমি এমনিতেও খুশি ছিলাম। কেননা, স্কুলে আমার চাকুরি হয়ে গিয়েছিল। এখন ছিল থাকার ব্যাপারটি। এরও সমাধান স্পষ্ট হচ্ছিল। হেড মিস্ট্রেজ উপরের তলায় থাকতেন। আমি ভেবেছিলাম, কয় দিন পর তাকে বলব, আমাকে আপনার সাথে রাখুন।

শিক্ষিকারা বাসায় চলে যাওয়ার পর যে রসিক শিক্ষিকা আমার চুল ও চোখের প্রশংসা করেছিল, সে আমার কাছে বসে থাকল। সমবেদনার কণ্ঠে বলল, 'হয়তো আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে চলো, অথবা আমার বাসায় চলো। স্কুলের ব্যাপারে কিছু বলে দেওয়া জরুরী মনে করছি।' আমি তার গাম্ভীর্য দেখে শঙ্কিত হলাম এবং তার বাসায় চলে গেলাম। সে ছিল বিবাহিতা। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির বদলে সে আমাকে বাপের বাড়িতে নিয়ে গেল। খানা খাওয়াল। এরপর জিজ্ঞেস করল, আমি বিবাহিতা কি না এবং চাকুরি করতে মজবুর কি না? আমি তাকে বললাম যে, আমি বিবাহিতা নই এবং মজবুর হয়েই চাকুরি করছি।

'যদি খুব মজবুর হয়ে থাক, তা হলে চাকুরি করো।' সে বলল। 'আর যদি মা-বাবার শারাফত ও নিজের ইজ্জত প্রিয় হয়ে থাকে, তা হলে এখানে চাকুরি করতে পারবে না। কয়েক দিন পর নিরাশ হয়ে এখান থেকে তোমাকে বের হয়ে যেতে হবে। এজন্য এ স্কুলে তোমার যোগদান না করাই ভালো।'

আমি তার কথা শুনেই নিরাশ হয়ে গেলাম। সে ছিল আমার সমবয়সী। সে বলল, 'আমার কথা যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে,

অথবা তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে, তা হলে কয়েক দিন চাকুরি করে দেখো। তখন আমার কথার সত্যতা তোমার জানা হয়ে যাবে।'

'বলতে থাকো।' আমি বললাম।

'চৌধুরী সাহেব তোমার কোন সার্টিফিকেট দেখে চাকুরি দেননি।' সে বলল। 'তোমার শিক্ষাদীক্ষা দেখে তোমাকে পঞ্চম শ্রেণি দেননি। তোমার কাছে শুধু একটি সার্টিফিকেট আছে, তা হল তুমি জোয়ান ও খুবসুরত। চৌধুরী শুধু এই বৈশিষ্ট্যই দেখেন। যেই শিক্ষিকার পরিবর্তে তোমাকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে, চৌধুরী তাকে বের করে দিয়েছেন। কেননা, তিনি চৌধুরীর বিনোদনের উপকরণ হতে অস্বীকার করেছিলেন। এই চৌধুরীর জৈবিক নিপীড়ন থেকে কোন শিক্ষিকা নিরাপদ নন।'

'তা হলে তুমি?' আমি নিঃসংকোচে জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি কি নিরাপদ?'

'না।' সেও আমার মত নিঃসংকোচে বলল। 'কিন্তু এতে চৌধুরীর কোন কৃতিত্ব নেই যে, তিনি আমাকে বশ করেছেন। আমি নিজেই এমন। তুমি আমাকে আওয়ারা বলো। বেশ্যা বলো। আমি সবকিছু। আমি শরীফ মেয়ে নই। তুমি হয়তো বিস্মিত হচ্ছ। কারণ, আমি প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে ভেদজান্তা সখী মনে গোপন কথা বলা শুরু করেছি। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাকে কুমারী ধারণা করে এই খতরা থেকে বাঁচানো নিজের কর্তব্য মনে করছি। তুমি খুবসুরত ও সরলা মেয়ে। চৌধুরী তোমাকে নাপাক করুক, তা আমি ভাবতেই পারছি না।'

সে যখন আমাকে কুমারী ও অবলা বলল, তখন আমার অন্তর থেকে দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল এবং হৃদয়ের গভীর থেকে দরদ উথলে উঠল; কিন্তু আমি নীরব থাকলাম। শুনতে থাকলাম তার কথাবার্তা। সে বলছিল, 'আমার যে অতীত জীবন, তা যদি শোনো, তা হলে আমি এই কর্মের উপর থেকে কেন পর্দা তুলে ফেলেছি, তা খুব সহজে বুঝবে। স্কুলের কথা পরে বলব। আগে আমার বিবরণ শোনো। মা-

বাবা আমাকে এমন একজন মানুষের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, যে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। তুমি তাকে পাগলও বলতে পার। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। আমার যৌতুক ও অলঙ্কারাদির মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। তবে একটি সত্য খুব কম লোকই জানে। তা হল এই চল্লিশ হাজার টাকা আমার মা-বাবাকে আমার শ্বশুর দিয়েছিলেন। তিনি ধনী লোক। তার ছেলে জন্মগতভাবে পাগল। বাহ্যত পাগল মনে হয় না। হাসতে থাকে, অথবা শিশুদের মত দৌড়াদৌড়ি করে। সে যে এমন, তা আমি একেবারেই জানতাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এর জন্য তারা কয়েক ঘরে প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু সব জায়গা থেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এক ঘর থেকে তাদের তিরস্কারও শুনতে হয়। এই পাগল ছেলের বাবা তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'দেখবে, এক মাসের ভিতরে ভিতরে আমার ছেলেকে বিয়ে করাব।'

আমি তো ঘরের বন্দী মেয়েদের মত সাদাসিধা ঘাপটিমারা মেয়ে ছিলাম না। আমি ছিলাম হাস্যোজ্জ্বল ও রসিক; বেপরোয়া ও দুষ্টু। কিন্তু ভিন্ন পুরুষ বা অপকর্মের কথা কখনও মাথায়ও আসেনি। তবে মা-বাবার আর্থিক অবস্থা দেখে খুব আফসোস হত। আমার যৌবন তাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। আমার চঞ্চল স্বভাব দেখে, তারা হয়তো আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাইছিলেন। অথচ তাদের যৌতুক প্রস্তুত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন; তবে আমীর ছিলেন না। একদিন আমাকে আচানক জানানো হল যে, পনেরো দিন পর আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। আমার হবু দুলার ব্যাপারে আমার মা এত খুবসুরত কথাবার্তা বললেন যে, আমি এই কিসমতের উপর গর্ব করতে লাগলাম। মায়ের একটি কথা অনেক বেশি ভালো লাগল, তা হল আমার দুলা সবসময় হাসিখেলের মানুষ।

আমার জন্য অনেক অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড়চোপড় এবং যৌতুকের অনেক জিনিসপত্র আসতে লাগল। আমি এগুলোর উৎস জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও কোন উত্তর দেওয়া হল না। মা-বাবা খুশি ছিলেন। এতে আমি বুঝছিলাম, এগুলো করজের পয়সা নয়। বারাতের

দিন এল। জানা গেল, পাঁচশত মানুষের বারাত আসছে। বারাত এল এবং জমকালোভাবে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ডুলিতে চড়িয়ে আমাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। আমি নববধূর মত ঘোমটা দিয়ে বসেছিলাম। এর মধ্যে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একজনের নয়; কমপক্ষে দুইতিন জনের পায়ের আওয়াজ। আমি কানকথাও শুনতে পেলাম। দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। এর একটু বাদেই খিলখিলে হাসি, তারপর গর্জে উঠল আওয়াজ- বে, বে, আয় কি আয়। এ ছিল আমার দুলার আওয়াজ, সে তার মাকে ডাকছিল। দরজায় গিয়ে থাপ্পড় মেরে বে বে বলে ডাকল। এরপর সে আমার কাছে এল এবং আমাকে খুব জোরে ধাক্কা দিল। আমি বিছানায় পড়ে গেলাম। সে হাসল। আমি ঘোমটা তুলে দিলাম। দেখতে সে অনেক সুন্দর এবং স্বাস্থ্যও তার ভালো। এরপর সে কেমন করতে থাকল, তার কী তোমাকে বলব। কখনও হাসছিল। কখনও আমার সেন্ডেল উপরে নিক্ষেপ করে আবার তা ধরছিল। তখন আমার মনে পড়ে গেল, আমার পরিবারে এবং মহল্লার মেয়েদের মধ্যে কখনও কখনও এক পাগলার কথা শুনতাম। দেখতে সে অনেক সুন্দর যুবক; তবে পাগল। একথাও শুনেছিলাম যে, তার মা-বাবা তাকে বিয়ে করাতে চাচ্ছেন, কিন্তু কেউ কুটুম্বিতা করতে চাচ্ছে না। আমি বুঝে ফেললাম, এটা সেই পাগলই।

এরপরও নিজের উপর জবরদস্তি করলাম এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। হতে পারে, আমার ভাগ্য খুলে যাবে এবং সে বিয়ের রহস্য বুঝবে। আমি তাকে পাশে বসালাম। আদর করলাম। অনেক যত্ন করলাম। কিন্তু সে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকল এবং শূন্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে কী যেন ধরার চেষ্টা করতে থাকল। আমি তাকে নিজের দিকে নিয়ে এলাম। উত্তেজিত করতে অনেক চেষ্টা করলাম; কিন্তু সে ছিল পাথরের মত। অনুভূতি ছিল না। আমার বৈবাহিক জীবনের প্রথম রাতের অবশিষ্টাংশ কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত হল। অথচ সে অপর পালঙ্কে আরামে ঘুমিয়ে থাকল।

সকাল হলে আমার শাশুড়ী আর এক ননদ আমার কামরায় এসে জিজ্ঞেস করল, রাত কীভাবে অতিবাহিত হল। আমি কেঁদে ফেললাম

এবং তাদেরকে বললাম, 'তোমরা সবাই আমাকে ধোঁকা দিয়েছ।' তারপরও আমি তার দেমাগ ঠিক করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ সম্পূর্ণ পাগল। তার এতটুকু অনুভূতিও নেই যে, সে একজন পুরুষ এবং আমি একজন নারী। একথা শুনে আমার শাশুড়ী হাতজোড় করে মিনতি করে বলতে লাগলেন, 'এ ঠিক হয়ে যাবে।' আমি তার প্রতিবাদ করলাম না। আমি নিজের বাড়িতে এসে মা-বাবাকে সব শুনিয়ে দিলাম। শুধু গালাগালি করলাম না; তা ছাড়া সবই করলাম। মা আমাকে আড়ালে নিয়ে আমার পা ধরে ফেললেন। এরপর স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, তারা আমার যৌতুকের কিছুই ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না। তারা আমার শ্বশুরালয়ের খরচের উপর যৌতুক প্রস্তুত করেছেন এবং আমার বিয়ে দিয়েছেন। বরযাত্রীদের খানার খরচ পর্যন্ত আমার শ্বশুর দিয়েছিলেন। ফল হয়েছে, আমার শ্বশুর তার পাগল ছেলেকে বিয়ে করাতে পেরেছেন; আর আমার মা-বাবা মেয়ের ফরয কর্তব্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

জাহান্নাম হয়েছে তো আমার জীবন হয়েছে। আমি নিজের পাগল স্বামীকে ভালো করার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম; কিন্তু তার মাথায় জন্মগত কোন ত্রুটি আছে। সে ভালো হতে পারল না। সে খায়, দায়, ঘুমায়, হাসে অথবা শিশুদের মত খেলে, কিংবা খাটে বসে বাতাস ধরতে চেষ্টা করে। এগুলো বাদে তার দেহ আর কিছু করতে পারে না। যেহেতু তার মা-বাবা অপরাধী ছিলেন এবং আমার মা-বাবাও, এজন্য তারা আমাকে তোষামোদ করতে শুরু করলেন। আমি এদের সবার ঘাড়ে চড়ে বসলাম। একবার সামান্য কথায় শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়কে হুমকি দিয়েছিলাম, আমি আদালতে যাব এবং মোকদ্দমা করব যে, আমাকে ধোঁকা দিয়ে পাগলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেউ আমার উপর জবরদস্তি করেনি। আমি মেট্রিক পাশ করেছিলাম। ঘরে মন বসত না; বরং কষ্ট হত। বাইরে কোন ব্যস্ততা সৃষ্টির জন্য আমি এই স্কুলে চাকুরি নিয়েছি। এখানে আমার এক বছর হয়ে গেছে। এখানে পেলাম এই চৌধুরী সাহেবকে। ইনি সক্রিয় ও আওয়ারা লোক। তিনি আমাকে অন্তরঙ্গ করতে চেষ্টা করলেন। আমি

সাড়া দিলাম। আমার মধ্যে এক ধরণের আগুন ছিল, যা আমাকে মজবুর করে বলছিল, এ কোন খারাপ বিষয় নয়। আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছিল। এক পাগলের মা-বাপ খান্দান ও সমাজে লাজ রাখার জন্য আমাকে খরিদ করেছিলেন। আমার বাবা আমাকে বিক্রি করেছিলেন। আমার ধৈর্য দেখো, এই পাগলকেই আমি কবুল করেছি; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে আমার জন্য শারীরিক ও মানসিক- উভয় বিচারে বেকার। তবে সে শারীরিকভাবে বেকার হওয়ার কারণে আমি খুশি। কারণ, তা না হলে আমার যে বাচ্চা হত, তারাও বাপের মত পাগল হত। আমি কি মানুষ নই? আমার কোন আবেগ নেই? আমি কি পাথর?

হাবেলীর দ্বিতীয় তলা

সে বলে যাচ্ছিল। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে সে স্পষ্ট করে দিত। তার আবেগ আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছিলাম; এমন কি অনুভবও করছিলাম। সে ছিল যুবতী। ছিল খুবসুরতও। তার মধ্যে যে আগুন ছিল, তা নারী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। এত বড় দুর্ঘটনা, যা তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে, সে হাসিমজাক, খুশি ও অপকর্মের বিনিময়ে বরদাশত করে নিয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে অপরাধী হয়তো এই নারী, নতুবা এই স্কুলের চৌধুরী। কিন্তু এমন নারী আর এমন চৌধুরীদেরকে জন্ম দেয় কে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে না; আপনি নিজেকেই দিন। আমি যদি মানসিক রোগের ডাক্তার হতাম, তা হলে এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ পেশ করতাম।

এই মহিলা আমাকে বলল, 'স্কুলের চাকুরি আমি শুধু সময় কাটানোর জন্য নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে সেই আনন্দও পেয়ে গেলাম, যা থেকে আমাকে মাহরুম করে দেওয়া হয়েছিল। চৌধুরী প্রেম ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে, আমি সেই হাত ধরে ফেললাম। আমি তার আকাঙ্ক্ষার ব্যতিক্রম, তার সঙ্গে নির্দ্বিধায় অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। একদিন তিনি আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে দ্বিতীয় তলায় নিয়ে গেলেন। প্রথম বারের মত বুঝলাম পুরুষের স্পর্শে কী আনন্দ আছে। তিনি আমাকে সেই আনন্দ দিয়ে দিলেন, যা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং যা আমার মা-বাবা চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে এক ধনী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে ফেলেছিলেন। এরপর তার ও আমার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে গেল। আমি একবার তার সাথে মারি গিয়েছিলাম। পরিবারের লোকজনকে বলেছিলাম, শিক্ষিকারা

যাচ্ছেন। আমি চৌধুরীর সাথে আট দিন মারি থেকেছিলাম। কেউ আমাকে বাধা প্রদান করেনি। কেউ আমাকে বাধা দিয়ে দেখুক। আমি মা-বাবা আর শ্বশুরালয়কে পুরো শহরের সামনে উলঙ্গ করে দিব। তাদেরকে আদালতে নিয়ে অপদস্থ করব। আমি সেই মৌলবীর দাড়ি ছিঁড়ে ফেলব, যে আমার বিয়ে পড়িয়েছিল। সে ভালো করেই জানত যে, ছেলেটা পাগল এবং কুরআনের দৃষ্টিতে পাগল কারও স্বামী হতে পারে না। এই মৌলবীই লাউড স্পিকারে ওয়াজ শোনাত। আমি শুক্রবারে তার চেঁচানোর আওয়াজ শুনতে পাই। এই মৌলবীর উপর এবং এই পর্যায়ের সমস্ত মৌলবীর উপর অভিসম্পাত করি।'

বলতে পারব না, এই মেয়েটি এখন কোথায় আছে এবং তার জীবন কীভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। হতে পারে, সে কারও হাত ধরে পালিয়েছে এবং সামাজিক জীবন যাপন করছে; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস নেই। কেননা, পাপকর্মে সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সে ছিল খুব দুষ্টু ও সাহসী। এও হতে পারে যে, সে আমার পথই অবলম্বন করেছে এবং প্রতি রাতে সে এমন স্বামী খুঁজে বের করে, যে জন্মগতভাবে পাগল নয়। আপনার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই মেয়েটির এমন প্রতিক্রিয়া অসাধারণ, বেনজির ও আশ্চর্যজনক নয়। এ হচ্ছে পাকিস্তানী সোসাইটি, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সমাজজীবনের অতিসাধারণ একটি উদাহরণ। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিব। যেখানে খোদা ও রসুলের নামে মেয়েরা মৌলবীদের হাতে বিক্রি হয়ে যায়, যেখানে বিশ বছরের মেয়েকে ষাট বছর বয়সী বুড়োর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যেখানে উদ্ধত যুবতীকে পাগলের বৌ বানিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে এমনসব ঘটনা ঘটে, যেগুলো রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। এসব বিতাড়িত বদকার নারী, যাদেরকে আপনারা পতিতা, রেন্ডি, বেশ্যা যৌনকর্মীসহ না জানি কত নাম দিয়ে স্মরণ করে থাকেন, যদি আপনারা তাদের বুকের ভিতর এবং তাদের অতীত জীবনে উঁকি দিয়ে দেখেন, তা হলে দেখবেন এসব পতিতা আর বেশ্যা আপনাদেরই হাতের সৃষ্টি।

ওই মেয়েটি আমাকে জানিয়েছিল যে, স্কুলের সমস্ত শিক্ষিকা চৌধুরী সাহেবের বিনোদনের উপকরণ। স্কুল থেকে তাদেরকে আলাদা

বেতন দেওয়া হয় এবং চৌধুরী সাহেব তাদেরকে আলাদা এলাউন্স দিয়ে থাকেন। এ কারণেই এখানকার সব শিক্ষিকা যুবতী ও খুবসুরত। হাবেলীর নীচ তলায় শিশুদেরকে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয়, আর উপরের তলায় অপকর্ম হয়। এসব শিক্ষিকা, বাহ্যত যাদেরকে হাস্যোজ্জ্বল মনে হয়, ভিতরে ভিতরে তারা বিদীর্ণ। একজন আরেক জনের দুশমন। এরা তোমারও দুশমন হয়ে যাবে। মেয়েটি বলল, 'এখানকার প্রত্যেক শিক্ষিকা একেকটি কাহিনীর পরিণাম। কেউ বৃদ্ধ ও অপারগ পিতার স্থলবর্তী, ছোট ভাইবোনের জীবিকার মাধ্যম। কেউ বেকার ও পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী। আর অন্যকেউ কোন না কোন কারণে আওয়ারা ও ব্যভিচারিণী।'

এই কাহিনী শোনার পরও আমি এই স্কুলে চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ভেবেছিলাম, শিক্ষিকাদেরকে ঐকবদ্ধ করে তাদেরকে চৌধুরী আর হেড মিস্ট্রেজের বিপক্ষে দাঁড় করাব; কিন্তু এ ছিল আমার ধারণা ও অপরিপক্ক চিন্তা। আমি এখানে প্রায় একমাস চাকুরি করেছি। শিশুদেরকে পড়িয়ে খুব তৃপ্তি পাওয়া যেত। কিন্তু স্কুলের পরিবেশ এত নোংরা ছিল যে, আমার প্রতিজ্ঞা ধ্বংস হয়ে গেল। আমার বান্ধবী ছিল শুধু এই মেয়েটি। আমি অন্য শিক্ষিকাদেরকে চৌধুরী আর হেড মিস্ট্রেজের বিপক্ষে এক কাতারে আনতে চেষ্টা করলাম। শিশুদের ভবিষ্যতের দোহাই দিলাম। সব ধরণের তদবির করলাম। ফল দাঁড়াল এই যে, সমস্ত শিক্ষিকা আমার বিপক্ষে চলে গেল এবং আমার বান্ধবী বলল, তারা তোমার উপর অভিযোগ আরোপ করছে যে, তুমি নিজের চেহারা-সুরতের আকর্ষণের মাধ্যমে চৌধুরীর একক মালিক হতে চাচ্ছ।

এ সময় চৌধুরী রীতিমত স্কুলে আসতে থাকলেন। আমাকে তিনি হেড মিস্ট্রেজের দপ্তরে ডেকে নিতেন। হেড মিস্ট্রেজ দপ্তর থেকে বের হয়ে যেতেন। আমার ডিউটি নিয়ে কথা শুরু হত এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদি পর্যন্ত আসত। আমি তার ইশারা বুঝতাম। একদিন তিনি বললেন, 'আসো, উপরে যাই।' আমি জওয়াব দিলাম, 'যা বলার এখানেই বলুন।' আমি একবারও তার সাথে দ্বিতীয় তলায় যাইনি। এই সময়ে স্কুলের অন্যান্য ধান্ধাবাজির খবরও আমার কাছে আসতে

লাগল। যেমন, ফিসের অবস্থা ছিল এই যে, তিন টাকা করে ফিস নিয়ে শিশুদেরকে এক টাকা ছয় আনার রশিদ দেওয়া হত। তিন টাকা ফিস নেওয়া হচ্ছে সেকথা যেন শিশুরা বাইরে কারও কাছে বলে, সেজন্য তাদেরকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। গরমের সময় প্রত্যেক ক্লাসের জন্য একটি করে কলসি কেনা হয়েছিল এবং এক টাকার কলসির জন্য ক্লাসের প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে দুই আনা করে উসুল করা হয়েছিল। প্রত্যেক ক্লাসে দুটি করে সিলিং ফ্যান ছিল। প্রত্যেক মাসে ফিসের সাথে পাখাবাবদ প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে চার আনা করে উসুল করা হত। কখনও কখনও মিলাদ-মাহফিল ও খতমে কুরআনের নামে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে চার আনা করে উসুল করা হত। এসব অর্থ দিয়ে শিক্ষিকাদেরকে দাওয়াত করা হত এবং শিশুদেরকে কিঞ্চিৎ করে দেওয়া হত। শিশুদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন খাতাপেন্সিল স্কুল থেকে কেনে। যে খাতা তখন বাজারে তিন আনায় পাওয়া যেত, স্কুলে তার বিনিময়ে চার আনা নেওয়া হত।

এসব ধান্ধাবাজির ফিরিস্তি অত্যন্ত দীর্ঘ ও দুঃখজনক। আজও এসব স্কুলে এ জাতীয় ধান্ধাবাজি বিরাজমান। গরীব মা-বাবাকে দিনেদুপুরে লুট করা হয়; কিন্তু তারা কিছু বলে না। প্রতিবাদ করে না। শিশুদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে কোথায় ভর্তি করবে। যদি তারা মেয়েদেরকে দশ ক্লাস না পড়ায়, তা হলে তাদের জন্য ভালো ঘরানার বর কীভাবে আসবে? সমাজ এসব ধান্ধাবাজি এবং শিক্ষার নামে লুটতরাজ দেখছে। এসব স্কুলে শিশুরা প্রতিদিন সকালে দোআ করে, 'হে খোদা! আমার জীবন প্রদীপের মত বানিয়ে দাও।' আমি এসব জায়গায় প্রদীপ নিভে যেতে দেখেছি। এক আছে সেই মিশনারী স্কুল, যেখানে মুসলমান শিশুদেরকে ইসলাম থেকে বধির করে দেওয়া হয়; আরেক হচ্ছে এই স্কুল, যেখানে ধর্মের নামে শিশুদেরকে মিথ্যা শিখানো হয়। মিলাদ আর খতমে কুরআনের নামে পয়সা ভাগাভাগি করে অপকর্ম করা হয়।

চৌধুরী আমাকে ফাঁসানোর অনেক চেষ্টা করলেন। বেতন বাড়ানোর লোভ দিলেন। শত শত টাকার নোট দেখালেন। একদিন

তিনি আমাকে মারী সফর করার দাওয়াত দিলেন। আমি মুখের উপর কিছু বর্ষণ করে দিলাম। মুখে যা এল, বকে দিলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন পোড়খাওয়া লোক। প্রথম দিকে হাসতে থাকলেন। পরে আমাকে বিতাড়িত করার হুমকি দিলেন। আমি পুরো মাসের বেতন উসুল করলাম এবং স্কুলকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানালাম। এরপর শরীফ জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা স্বপ্ন হয়ে অন্ধকারে মিলে গেল।

কুঠি পরিত্যাগ

ওই দিন আমি অনেক চিন্তা করলাম। খুব ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলাম যে, আমার ভবিষ্যৎ কী হবে। পরাজয়ের পর আমি নির্জনে কাঁদতাম; কিন্তু ওই দিন কাঁদলাম না। আমার কোন্ রাস্তা অবলম্বন করা উচিত, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলাম। বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা মন থেকে একদম বের করে দিয়েছিলাম। সেখানে আমার জন্য অভিশাপ, মর্মন্তুদ বন্দীত্ব ও অপমান ছাড়া কিছুই ছিল না। শরীফ জীবনের পথ ধরলাম, কিন্তু সেখানে ঊষর মরুভূমি এসে পড়ল। একটিই পথ ছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে চলে যাওয়া। যখন তিনি আমাকে ঘুসহিসেবে ব্যবহার করতে চাইবেন, তখন অস্বীকার করব না। তার বিনোদনের উপকরণ হয়ে থাকব এবং অর্থ উপার্জন করব। শর্ত করব এই যে, আমার থাকার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমার কাছে কেবলই মনে হচ্ছিল, কেউ আমাকে শরীফ থাকতে দিবে না। আমি কতটুকু শরীফ ছিলাম, সেকথা তো আপনাকে বলেছি। হারামের শিশু জন্ম দিয়ে খ্রিস্টানদের কাছে ন্যস্ত করে এসেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত হয়েছিল এবং আমার অপারগতা সাব্যস্ত হয়েছিল যে, আমি বিভ্রান্ত হতে পারি না। আমার মধ্যে যদি আলো ছড়িয়ে না পড়ত, তা হলে আমার জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না।

রাতে আমি আমার উপকারী বন্ধু, জায়গীদারপুত্রের সামনে এই ব্যাপারটি তুলে ধরলাম এবং তাকে বললাম, যদি প্রত্যেকটি পুরুষ কামুক হয়, তা হলে আমার পরিণতি কী হবে? আমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত, না কি যথারীতি পতিতা হয়ে যাওয়া উচিত। আমি তাকে নিজের ভাইয়ের কৃতকর্ম সম্পর্কেও বললাম।

'এতে পুরুষদেরও কোন অপরাধ নেই।' সে বলল। 'তোমার মধ্যে এমন আকর্ষণ আছে যে, তুমি যার সামনে যাও, সে-ই নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এও তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, মজবুর ও অসহায় নারী যদি বদসুরতও হয়, তা হলেও সে ওই ব্যক্তির দৃষ্টিতে খুবসুরত মনে হয়, সাহায্যের জন্য যার সামনে সে হাত প্রসারিত করে। আমাদের দেশে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই।'

আমি তাকে পরিবারের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে সবকিছু বলে দিয়েছিলাম। সেই আলোকে সে আমাকে পরামর্শ দিল যেন আমি ঘরে ফিরে না যাই। কেননা, পরিবার, মহল্লা আর আশপাশের লোকজনের দৃষ্টিতে আমার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাড়ি থেকে পালায়নের সময়সীমা তখন একবছর হয়ে গিয়েছিল। সে আরেক পরামর্শ দিল যে, সমাজে ভালো লোকও আছে। ভাগ্য আরেকটু পরীক্ষা করা দরকার। সুতরাং সে আমাকে সাহস দিল। এজন্য আমি আরও ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমি তাকে প্রথম বারের মত বললাম তার কোন বন্ধুর সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। এতে সে পরিষ্কার ও স্পষ্ট জওয়াব দিয়ে দিল। সে বলল, 'আমি কোন বন্ধুকে ধোঁকা দিতে চাই না। তোমার ব্যাপারে সব কথা খুলে বয়ান করতে হবে। এগুলো শুনে কেউ বিয়ে করতে রাজি হবে না। এ ছাড়া আমি কোন বন্ধুর ব্যাপারে নিশ্চয়তাও দিতে পারছি না যে, সে তোমাকে ধোঁকা দিবে না। বিয়ের সর্বোত্তম সমাধান হচ্ছে এই যে, কোথাও চাকুরি করো এবং নিজের জন্য কোন বর অনুসন্ধান করো। তার সাথে কয়েক দিন ঘুরো, ফেরো। তার নিয়ত ও মানসিকতা ভালো করে যাচাই করো। যদি ভালো লাগে, তা হলে বিয়ে করে ফেলো।'

পরিবারের কেউ আমাকে দেখে ফেললে, ঘরে নিয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কার ব্যাপারে সে বলল, 'তুমি প্রাপ্ত বয়স্কা। যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তা হলে আমি তোমার সাথে কোর্টে যাব। তুমি হলফ করে বয়ান দিবে যে, তুমি আমার সাথে থাকতে চাও।'

নিজের এই আইনী পজিশনের ব্যাপারে আমার জানা ছিল না। তার বর্ণনার কারণে পরিবারের কেউ আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারে, এই আশঙ্কা দূর হয়ে গেল।

এর কয়েক দিন পরে এই যুবকরা আমাকে একটি পাকিস্তানী কোম্পানীর ঠিকানা দিল। আমি সেখানে চলে গেলাম। কোম্পানীর মালিকের সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, 'আমার কাছে চারটি মেয়ে আছে। পঞ্চম মেয়ের জন্য কোন স্থান নেই।' আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার কাছে মিনতি করলাম। বললাম, 'আমার বাবা মারা গেছেন। ভাইবোন সব ছোট ছোট। জোয়ান কোন ভাই নেই। পরিবারকে ক্ষুধার যাতনা থেকে বাঁচানোর নাযুক দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়েছে।' আমার চোখ থেকে পানিও বেরিয়ে এল। তিনি কতক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আমাকে একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন। দেখুন, আমি এখানে অনেক ব্যস্ত থাকি। রাত সাড়ে আটটার দিকে আমার বাসায় আসুন। তখন সবিস্তারে কথা বলা যাবে।' এরপর তিনি আমাকে বাসার ঠিকানা দিলেন এবং বললেন, 'যদি আপনার পছন্দ হয়, তা হলে রাতের খাবার আমার সঙ্গে খাবেন।'

আমি রাতে তার কুঠিতে চলে গেলাম। বুঝতে পারলাম, বাসায় তিনি একাই থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সোয়াত গিয়েছিল। তার বয়স চল্লিশ বছরের কিছু কম ছিল। কথাবার্তায় দরদ ও মমতা ছিল। তিনি রাজকীয় খানা খাওয়ালেন। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। বাবার মৃত্যু এবং ছোট ভাইবোন সম্পর্কেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে, আমি তা বলতে অস্বীকার করলাম। তিনি তখন হাসতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমি আপনাকে একটি কথা বলব। আশা করব, আপনি ঘাবড়াবেন না এবং মনে করবেন না যে, আমি আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছি....।' আমি নীরব হয়ে গেলাম। তখন আমাদের খানা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা একই সোফার উপর বসে ছিলাম। আমি পুরুষসমাজের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে অবগত

ছিলাম; কিন্তু তার কথাবার্তায় নিষ্ঠার ঝলক দেখে আমার দুর্বলতা আর অসহায়ত্ব আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম।

তিনি মুচকি হেসে আমাকে এমন কথা জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার সামনে কামরা ঘুরতে শুরু করল। তিনি বললেন, 'বাচ্চা নষ্ট করেছ, না কি বিয়ে করেছিলে?' আমার চেহারার রং নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছিল, যা অবলোকন করে তিনি আমার চিবুক ধরে বললেন, 'আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না। ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি তোমাকে চিনি। আমি ওই হোটেলে কখনও কখনও যেতাম। একটু মন মাতানোর জন্য। সেখানে আমি তোমাকে দেখেছিলাম এবং তোমারই এক বন্ধুর কাছে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছিল, তুমি বেশ চড়া মূল্যের মেয়ে; কিন্তু এখন তোমার পা ভারী হয়ে গেছে। এরপর আমি তোমাকে খুঁজেছি; কিন্তু পাওয়া যায়নি। আজ তুমি আচানক আমার সামনে এসে পড়েছ। আমি একটু তালবাহানা তোমাকে বাসায় নিয়ে আসা মোনাসিব মনে করলাম।'

এখানে ডেকে আনা কেন মোনাসিব মনে করলেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভয় পেয়ো না।' তিনি বললেন। 'আমি তোমাকে অফিসে খুব ভালো পজিশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে গপশপ করার জন্য ডেকে এনেছি।' একথা বলে তিনি আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে ধারণ করে বললেন, 'এই মিথ্যা বলার কী প্রয়োজন ছিল, আমার বাবা মারা গেছেন। ভাইবোন ছোট ছোট?'

তিনি যেহেতু আমার অতীত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, এজন্য নিজেকে গোপন করা ভালো মনে করলাম না। আমি তাকে বললাম, 'বাচ্চা নষ্ট করেছি। এখন সম্মানের জীবন যাপন করতে চাই।' আমি কোথায় থাকি, সে কথা তাকে বললাম না। আমি যখন তাকে বললাম, বিয়ে করিনি, তখন তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি বিয়ে করে কী করবে। আরও কিছু দিন আনন্দ-উল্লাস করো।' আমি তাকে বিশ^াস করাতে চেষ্টা করলাম যে, এক বছর হল আমি আনন্দ-উল্লাস ছেড়ে

দিয়েছি। তিনি বাহ্যিকভাবে মেনে নিলেন যে, আমি পাপের দুনিয়া থেকে বের হয়ে এসেছি; কিন্তু আমাকে পাপ করার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। তিনি এমন কথাবার্তা বললেন, যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আমার প্রেমে তড়পাচ্ছেন এবং আমাকে পাওয়ার জন্য যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি যেমনই প্রেমভরা ভাষায় আমাকে পাপ করতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আমি তেমনই প্রেমভরা ভাষায় তাকে বারণ করছিলাম এবং তার কাছে মিনতি করছিলাম, যাতে তিনি আমার কসম ভেঙে না দেন। কিন্তু তিনি খুব ভালো করে জানতেন যে, আমি কুমারী ও শরীফ মেয়ে নই। তিনি আমাকে পাঁচশত টাকা বেতনের চাকুরির প্রস্তাব দিলেন।

জবরদস্তি তিনি আমাকে করলেন না; হাতও বাড়ালেন না। পকেট থেকে শত শত টাকার নোট বের করলেন এবং গুণে দশটি নোট আমার হাতে দিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে বাহুতে ধারণ করে বুকে লাগালেন এবং আমার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলেন। আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না। শার্ট-প্যান্ট পরে ছিলে তিনি। আমি তাকে বললাম, 'আপনি কাপড় বদলে ফেলুন। চলুন, বেডরুমে যাই।' পুরুষের উপর যখন কামনার ভূত সোয়ার হয়, তখন সে নারীর হাতে এমনই খেলনায় পরিণত হয়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠলেন এবং বললেন, 'দুই মিনিটের মধ্যে আমি কাপড় বদলে আসছি।'

এই দুই মিনিটের মধ্যে আমি ড্রয়িং রুম থেকে বের হলাম এবং খুব দ্রুত কুঠি থেকে বের হয়ে বড় গেট পার হয়ে গেলাম। বেশি যেতে পারলাম না। এর মধ্যেই কুঠি থেকে গাড়ি বের হল এবং থামল। তিনি আমাকে ধরতে বের হয়েছিলেন। আমি কুঠির পেছন দিকে চলে গেলাম। গাড়ি চলার আওয়াজ পেলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, গাড়ি অন্যদিকে চলে গেল। সেই এক হাজার টাকা আমি তার সোফায় রেখে এসেছিলাম। কোন রিকশা, ট্যাক্সি নজরে পড়ছিল না। রাস্তায় অনেক ট্রাফিক ছিল এবং লোকজনও আসা-যাওয়া করছিল। আমার ভয় ছিল, তিনি যদি আমাকে দেখতে পান, তা হলে কোন অপবাদ দিয়ে আমাকে বেইজ্জতি করবেন। খোদার অনুগ্রহ হল। ট্যাক্সি পাওয়া গেল এবং আমি বেঁচে গেলাম।

এরপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল

এ ছিল আমার আরেক পরাজয়। আমার অতীত আমার রাস্তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে, আমার পাপ প্রেতাত্মার মত আমার ভবিষ্যতের উপর সোয়ার হয়ে থাকবে এবং আমার কিসমতে পাপপঙ্কিল জীবন লিখে দেওয়া হয়েছে। সে রাতে আমি নিজের চেহারা দেখলাম। তখন নিজের উপর আমার ঘৃণা সৃষ্টি হল। নিজের উপর আমার খুব গোস্বা হল। নিজের চেহারা নিজেই খামচাতে মন চাইল। অন্তরে এক ভয়ানক ইচ্ছাও জাগ্রত হল যে, নিজের চেহারার উপর গরম পানি ঢেলে দিই, অথবা আগুন দিয়ে কিছুটা ঝলসে ফেলি; কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, বদসুরত চেহারায় চাকুরিও জুটবে না; স্বামীও জুটবে না। এ ছিল মনের এক আকুতি। কে নিজের চেহারা খামচায় এবং কে নিজের চেহারা ঝলসায়? রাগ উঠত, তখন আমি নিজের খুন নিজে পান করতাম।

এর মধ্যে কয়েক বার আমি সেই স্কুল ও কলেজের সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হলাম, যেখানে আমি লেখাপড়া করেছিলাম। কিন্তু হৃদয়ে পাপের বোঝা ধারণ করে ঘরছাড়া হয়েছিলাম। আমি সেই স্কুল ও কলেজ এবং অন্যান্য স্কুল-কলেজের সামনে কার, স্কুটার ও মোটরসাইকেলের ভিড় দেখতে পেলাম। সেগুলোতে ওই শিকারীকেই দেখতে পেলাম, যার হাতে আমি ধরা পড়েছিলাম। এর চাকচিক্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান পুরোপুরি 'স্বাধীন' হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে থামি এবং মেয়েদেরকে চিৎকার দিয়ে বলি, এসব গাড়ি থেকে দূরে থাকো; এসব শাহজাদার মুচকি হাসি থেকে দূরে থাকো; এই সংস্কৃতির চমক থেকে পালাও; আমার অবস্থা

দেখো; আমার শিক্ষাপ্রদ পরিণতি দেখো। আমার অস্থির দৃষ্টি, আর আমার নীরব চিৎকার কোন মেয়েকে থামাতে পারল না। আমি তাদেরকে বিভিন্ন গাড়িতে লিফ্‌ট নিতে দেখলাম। সন্ধ্যার সময় আমার কাছ দিয়ে যাওয়া বিভিন্ন গাড়ি থেকে অট্টহাসিও শুনতে পেলাম; শুধু দেখতেই থাকলাম এবং শুনতেই থাকলাম।

ওই কুঠি থেকে পালানোর পর আমি পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত কী করব, তা নিয়ে ভাবতে থাকলাম। তখন একটি চিন্তাই মাথায় এসেছিল যে, নিজেকে বিক্রি করে দিই। আমার অবস্থা ছিল তুফানের খড়কুটোর মত। আমি তখন যুবকদের কুঠিতে বেশি দিন থাকতে পারছিলাম না। চূড়ান্ত সীমা হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এক বছর চার মাস। সন্দেহ হচ্ছিল, যেন এরা আমার উপর বিরক্ত হচ্ছে। এখন দ্রুত আশ্রয় ঠিক করা ছিল আবশ্যক। কাউকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করতে হবে, অথবা আত্মহত্যা করে এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হবে।

এরপর ওষুধ প্রস্তুতকারক একটি বিদেশী কোম্পানীর দপ্তরে গেলাম। তার ম্যানেজার ছিল পাকিস্তানী। তার সাথে একই অভিজ্ঞতা অর্জিত হল, যা এর আগে তিনবার অর্জন করেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে যে ধুলো ভরা ছিল, তা আমি তার উপর ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সেখানে আমি ষোলো দিন চাকুরি করেছিলাম। দুই যুবতী, আরেক মধ্যবয়স্কা নারী সেখানকার চাকুরে ছিল। তিনজনেরই চেহারা ছিল দেখার মত। ম্যানেজার আমার উপর খুব মেহেরবান হয়ে গেলেন। আমার কাজ ছিল অন্যকিছু; কিন্তু তিনি আমাকে বার বার দপ্তরে ডাকতেন, কাছে বসাতেন এবং সমবেদনা প্রকাশ করতেন। আমি নির্দ্বিধায় সয়ে গেলাম। অবশেষে তিনি আমার সাথে এমনসব কথা বলতে লাগলেন, যেগুলো আমার জন্য নতুন ছিল না। তিনি যখন আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন, তখন আমি বললাম, 'কোন নতুন কথা শোনান। এ তো খুব পুরনো খবর।' এরপর আমি তাকে আরও বললাম, 'জি, হাঁ; আমি জানি যে, আমি অনেক সুন্দর। আমি চাই যে,

আপনি ... দেখুন। আপনি বাইরে যতটুকু কালো, ভিতরে তার চেয়ে বেশি কালো।'

আমি তাকে পেয়ে বসেছিলাম। মুখে যা এল, বকে দিলাম এবং এত জোরে বকওয়াস শুরু করলাম যে, তিনি আমাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করতে লাগলেন, 'খোদার জন্য তুমি আমাকে মাফ করে দাও। বাইরে পুরো দপ্তর শুনতে থাকবে।' আমি খুব কষ্টে তাকে ছেড়ে দিলাম এবং ষোলো দিনের বেতন চাইলাম। তিনি চাকুরি না ছাড়ার জন্য অনেক মিনতি করলেন; কিন্তু আমি বেতন নিয়ে নিলাম এবং দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

এত অভিজ্ঞতার পর চাকুরির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভাগ্যে আরও দুর্গতি ও অপমান ছিল। বন্ধ হওয়ার জন্য শেষ দরজা থেকে গিয়েছিল। ভাবলাম, নাও এটাও পরীক্ষা করে দেখি। এ ছিল আরেকটি বিদেশী কোম্পানী। পত্রিকায় খবরে দেখলাম যে, সেখানে দুইতিন জন নারীর প্রয়োজন। আমি চলে গেলাম। পনেরোষোলো জন মেয়ে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এসেছিল। শুধু আমি ছিলাম বোরকা পরিহিতা। বাকি সবাই ছিল আধুনিক ফ্যাশনের নমুনা। বিদেশী কোম্পানীতে চাকুরি করার জন্য বিদেশী রূপ তারা ধার করে এনেছিল। ইন্টারভিউ শুরু হল। আমি ভিতরে গেলাম। ইন্টারভিউ গ্রহীতা বললেন, 'বোরকা খুলতে হবে।'

'আচ্ছা, খুলব।' আমি বললাম।

এদিক ওদিক থেকে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। এরপর ইংরেজী বলতে আরম্ভ করলেন। আমার ইংরেজী বলার দক্ষতা ছিল বেশ। তিনি আমার কথাবার্তায় অভিভূত হলেন। তিনি ছিলেন উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারী। জোয়ান মানুষ। বয়স মনে হচ্ছিল ত্রিশ বছরের মত। ম্যানেজার ছিল ইটালীর বাসিন্দা, আর এই সেক্রেটারী ছিল পাকিস্তানী। আমার কাজ ছিল এমন যে, বেশির ভাগ সময় দপ্তরে আমাকে তার সাথে থাকতে হত। কথাবার্তার ঢং আর পরিচ্ছন্নতার কারণে লোকটাকে আমার কাছে ভালো লাগল। তার কথাবার্তায় সূক্ষ্ম প্রফুল্লতা আর আচরণে দৃঢ়তা ছিল। তিনি আমার

সাথে অপ্রয়োজনীয় এবং বিষয়বহির্ভূত কথা বললেন না। তিনি আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি আমাকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেলেন। অন্য প্রার্থীদেরকে তিনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইটালীর ম্যানেজার দু'চারটি কথা বললেন এবং আমাকে কর্মচারী রাখার মঞ্জুরি দিয়ে দিলেন। বেতন মাসে সাড়ে চারশত টাকা নির্ধারিত হল। দুইতিনটি এলাউন্স মিলে সোয়া পাঁচশত হয়ে যেত।

এখন আমার অবস্থা ছিল ভাঙা নৌকার মত, অথবা ডুবমান ব্যক্তির মত, যে খড়কুটোর সাহায্য অনুসন্ধান করছে। এই পাকিস্তানী সেক্রেটারীর কথায় মমতাও ছিল, সমবেদনাও ছিল। আমি তার মধ্যে অশুভ অভিপ্রায়ের কোন লক্ষণও দেখলাম না। তবে মনে হত, যেন তার বুকের মধ্যে কোন পেরেশানী বা দুঃখ আছে, যা তিনি লুকাতে চেষ্টা করছেন। এটাই ছিল আমার দুর্বলতা। তিনি আমাকে কাজ শেখাতে শুরু করলেন এবং পুরো আন্তরিকতার সাথে আমাকে দিকনির্দেশনা দিতে লাগলেন। তার অন্তরিকতা আর নিষ্ঠা দেখে আমার মন চাইত যে, তার মনের কথা শুনব এবং নিজের মনের কথা তার কাছে বলব। অফিসে হয়তো আমার পঞ্চদশ দিন ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার অন্তরে কী আছে, যার লক্ষণ আমি আপনার চেহারায় দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু আপনি লুকানোর চেষ্টা করছেন?'

'নিশ্চয়ই আমি লুকাতে চেষ্টা করছি।' তিনি বললেন। 'নারীর সামনে পুরুষের জন্য কাঁদতে বসে যাওয়া মানায় না। আপনি আমার কী সাহায্য করবেন? কিছুই না। আমার আত্মহত্যা করা উচিত।'

মনের রোগ বলার জন্য আমি তাকে পীড়াপীড়ি করলাম। তিনি বললেন, 'আপনার বয়সের একটি মেয়ে আমাকে দংশন করেছে। বাস্তব সত্য হচ্ছে আপনার বয়স ও আপনার মত সুশ্রী মেয়েদের প্রতি আমার ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়েছে।'

লোকটির প্রতি আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। কারণ, আমার বয়স ও আমার চেহারার মেয়েদের প্রতি তার অনীহা ছিল। এই

লোকটি ছিলেন আমার জন্য বিস্ময়। কেননা, এ পর্যন্ত আমি যেসব পুরুষকে দেখেছিলাম, কোন রকম নারী দেখলেই তারা কার্টুনের মত নড়াচড়া শুরু করে দিত। কিন্তু এই লোকটি আমার মত চেহারাসুরতের মেয়েদেরকে ঘৃণা করতেন। দপ্তরে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব ছিল না। তিনি বললেন যেন চারটার পরে তার সাথে হোটেল বা পার্কে যাই। আমি এই দাওয়াত কবুল করলাম। আমরা একটি ইউরোপিয়ান হোটেলে চা পান করলাম, তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটি উদ্যানে গেলাম। আমি ছিলাম স্বাধীন। সারা রাত বাইরে থাকলেও জিজ্ঞেস করার কেউ ছিল না। আমরা এক জায়গায় বসলাম। আমার পরনে বোরকা ছিল। তিনি যে দুর্ঘটনার কথা আমাকে শোনালেন, তার সারসংক্ষেপ ছিল এই যে, চার বছর আগে আমার মত এক অসহায় মেয়ে তার কাছে চাকুরির জন্য এসেছিল। সে দেখতে খুব সুদর্শন ছিল। অতিমাত্রায় দারিদ্র্যের কারণে সে চাকুরি করতে মজবুর হয়েছিল। এই সেক্রেটারী এই বিদেশী ম্যানেজারের কাছ থেকে মঞ্জুরি নিয়ে তাকে অফিসে জায়গা করে দেন। তার বক্তব্যানুযায়ী মেয়েটি চাকুরির যোগ্য ছিল না। দশম শ্রেণিতে উঠে সে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।

এই সেক্রেটারী তার প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে ইংরেজী কথোপকথন শেখাতে থাকেন এবং অফিসে কাজের ট্রেনিংও দিতে থাকেন, যাতে তার অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়ে না যায়। মেয়েটি জোয়ান ছিল, সেক্রেটারীও জোয়ান ছিলেন। এই আকর্ষণ প্রেমে রূপ নেয়। বিয়ের কথাবার্তা হয়ে যায়। মেয়েটি ছিল গরীব পরিবারের। মেয়ের মা-বাবা হাজার শোকর আদায় করে এই লোকের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন; কিন্তু বিপদ হয়ে যায় এই লোকের। তিনি ছিলেন আমীর মা-বাবার ছেলে। তাদের ইচ্ছা ছিল লেবেল ঠিক রেখে ছেলেকে বিয়ে করাবেন। তিনি মা-বাবার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং তারা নারাজ হয়ে যান। তারা অন্যএক শহরে থাকেন। সেক্রেটারী মা-বাবার অনুমতি ছাড়াই মেয়েটিকে বিয়ে করেন। মা-বাবা তাকে জায়গা-জমীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেন। তিনি দারিদ্র্যে জর্জরিত মেয়েটিকে একটি ছোট্ট কুঠিতে তোলেন এবং তাকে বেগম বানান। দপ্তরে সে চাকুরিও করতে থাকে। স্বামী তাকে এত দক্ষ করে তোলেন

যে, সে মাতৃভাষার মত ইংরেজী বলতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। এরপর সে তাকে উন্নত হোটেল এবং উঁচু সোসাইটিতে ঘুরাতে ফেরাতে থাকেন।

তার কথায় মেয়েটির প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্ন কিছু। তার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে যায় এবং সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আযাদ হয়ে যায়। এবং স্বাধীনভাবে এর ওর সাথে বন্ধুত্ব গড়তে থাকে। এক্ষেত্রে স্বামীর দোষও ছিল। তিনিই তাকে রঙিন দুনিয়ার সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন, যেখানে শরম ও হেজাবকে অপসংস্কৃতি মনে করা হয়। সেক্রেটারীর গাড়ি ছিল না। মেয়েটি গাড়িতে সোয়ার হওয়ার জন্য গো ধরে এবং বিয়ের দ্বিতীয় বছরে সে এমন স্বাধীন হয়ে যায় যে, স্বামীকে না বলেই ঘর থেকে বের হয়ে যেত এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে ফূর্তি করত। স্বামী বাধা প্রদান করলে তিনি যে তাকে দারিদ্র্যের গর্ত থেকে তুলে এনেছিলেন সে কথা ভুলে গিয়ে কাটা জওয়াব দিয়ে দেয় যে, সে ঘরের কয়েদী হয়ে থাকতে পারবে না। স্বামীর উত্তম আচরণ, তার ভালোবাসা, তার ত্যাগ- মা-বাবাকে নারাজ করা এবং উত্তাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া- সবকিছু সে ভুলে গিয়ে আযাদ হয়ে যায়।

স্বামী ভালোবাসার খাতিরে সবকিছু বরদাশত করেন এবং তাকে সঠিক পথে আনতে চেষ্টা করতে থাকেন। শেষে একদিন মেয়েটি তাকে নির্লজ্জভাবে বলে দেয় যে, সে তালাক নিতে ইচ্ছুক। স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেন। বড় এক ধনী ব্যক্তি মেয়েটিকে বিয়ে করার ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সেই ওয়াদা পুরা করেননি। কয়েক দিন ফূর্তি করার পর তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। স্বামী তাকে সোসাইটি গার্ল, অর্থাৎ অভিজাত পতিতারূপে কয়েক বার দেখেছেন। এটা এমন এক আঘাত, যা জোয়ান লোকটিকে মানসিক দিক থেকে মেরে ফেলেছে। এই ছিল তার পেরেশানীর দাস্তান, যা আমি সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলাম।

কমবেশি দুই ঘণ্টায় তিনি গল্প শেষ করেছিলেন। এখন তিনি নিজের কুঠিতে একা থাকতেন। আপনাআপনি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে, নিজেকে তার সামনে পেশ করি এবং বলি যে, আমাকে বিয়ে করুন। কিন্তু সাথে সাথে এমন কথা বলা ঠিক মনে হল না। প্রথম

দিনই এই লোকটিকে আমার কাছে ভালো লেগেছিল। এখন তার জীবনকাহিনী শুনে তার প্রতি আমার দরদ আর ভালোবাসা সৃষ্টি হল। আমি মনে মনে স্থির করলাম, তাকে আমি শাদীর প্রস্তাব দিব। এতে আমারও লাভ ছিল; বরং সমস্যার এটাই সমাধান ছিল। তা ছাড়া এই লোকটির সাথে আমার আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমি তাকে বলতে চাইছিলাম যে, সব মেয়েই অকৃতজ্ঞ নয়।

ওই দিনের পর থেকে আমি তাকে কাছে টানতে শুরু করলাম। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে আমরা হোটেলে চলে যেতাম; চা পান করতাম এবং উদ্যানে গিয়ে বসতাম। আমি তার কথা শুনতাম এবং শতভাগ আগ্রহ প্রকাশ করতাম। এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমার বুকের ভার হাল্কা করে দিয়েছ। এখন আশা করছি যে, বেঁচে থাকতে পারব। তুমি ছাড়া আমি এই রোগের কথা আর কাউকে বলিনি।' এমন আন্তরিক হওয়ার পরও তিনি শরীর স্পর্শ করলেন না এবং এমন কোন কথাও বললেন না, যা থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি আমাকে সেই নজরে দেখেন, অন্যরা আমাকে যেই নজরে দেখত। সন্ধ্যার পরেও আমরা অন্ধকারে বসে থাকতাম। তারপরও মনে হত যে, তার সাথে যে একজন জোয়ান ও খুবসুরত মেয়ে আছে এবং সে তাকে কামনা করে, এই অনুভূতিই তার নেই।

আমার ব্যবহার দেখে তিনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে আগ্রহ দেখানো শুরু করলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মধ্যে এমন বিপরীতধর্মিতা কীভাবে এল? বোরকা ছাড়া তুমি বাইরে বের হও না। তোমার ইংরেজী কথাবার্তা বলে দেয় যে, তুমি অনেক দিন ইংল্যান্ডে থেকেছ। আবার সন্ধ্যার পর বাসায় ফেরার জন্য তোমার তাগাদা নেই। তোমার স্বভাব, চালচলন আর কথাবার্তা থেকে মনে হয় তুমি সম্পূর্ণরূপে একটি স্বাধীন মেয়ে। নিজের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো। চাকুরি কি কোন অপারগতার কারণে করছ, না কি সখে?

অপারগতার কারণে। আমি জওয়াব দিলাম। বোরকাও পরি অপারগতার কারণে। আমি এখানে গোলমাল লাগিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে আপন ও অন্তরঙ্গ বানিয়েছিলেন। আমি তাকে নিজের

হাকীকত বলতে গিয়েছিলাম; খেয়াল হল যে, এর আগে যাকেই আমি নিজের প্রকৃত অবস্থা বলেছি, সে-ই আমাকে বেশ্যা মনে করে জৈবিক চাহিদার লক্ষবস্তু বানানোর চেষ্টা করেছে। আরেক কারণ হল আমি তাকে আরও কয়দিন দেখতে চাচ্ছিলাম। যা হোক, আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, ইনি সেই খাঁটি মানুষ, যাকে আমার দরকার। তারপরও আমি তাকে আরও যাচাই করছিলাম। আমি তাকে বললাম, একদিন আপনাকে শোনাব আমার উপর দিয়ে কী তাণ্ডব অতিবাহিত হয়েছে।

মারীতে একরাত ও শরাব

তিনি আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন; কিন্তু টলিয়ে দিলাম। সে দিনের পর তাকে কবে এবং কীভাবে বলব যে, আমাকে নিজের কাছে রাখুন এবং বিয়ে করুন- এ বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। একটি সুযোগ তিনিই সৃষ্টি করে দিলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। তখন আমরা একজন আরেক জনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরও তিনি আমাকে এমন কোন ইশারা করেননি, যা থেকে আমি তার নিয়ত বুঝতে পারি। আমার অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল। একদিন তিনি বললেন, 'মনটা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে মারী গিয়ে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তুমি যেতে পারবে না? ভাবছি, তোমাকে ছাড়া মারী গেলেই কী লাভ হবে। একাকিত্ব আর উদাসীনতা আমাকে মেরে ফেলবে। ... যেতে পারবে?'

'গেলেই যেতে পারব।'

'পরিবারের লোকদেরকে কী বলবে?'

'উল্টা সিধা মিথ্যা বলব।' আমি বললাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ছুটি নিয়ে দিতে পারবেন?'

'এ তো কোন ব্যাপারই না।' তিনি বললেন। 'দশ দিন যথেষ্ট হবে। তবে অফিসের কারও কাছে উল্লেখও করবে না যে, তুমি আমার সাথে মারী যাচ্ছ।'

পরের দিনই তিনি দশ দিনের ছুটি নিলেন। আমার মা খুব অসুস্থ একথা বলে আমারও ছুটি নিয়ে দিলেন। পরবর্তী সন্ধ্যায় আমরা

মারীতে ছিলাম। আমরা একটি উন্নত হোটেলে অবস্থান করছিলাম। হোটেলের ম্যানেজারকে তার বন্ধু মনে হচ্ছিল। তিনি আমাদেরকে উষ্ম অভ্যর্থনা জানালেন এবং থাকার জন্য আলাদা একটি কামরা দিলেন। আমি জানালা খুললাম, তখন মনে হল আমার সামনে জান্নাতের দরজা খুলে গেছে। মারীর কথা আমি শুনে ছিলাম; কখনও যাওয়া হয়নি। হোটেল ছিল একটি উঁচু জায়গায় এবং আমাদের কামরা ছিল দ্বিতীয় তলায়। জানালা দিয়ে আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পেলাম। দূরে কাশ্মীরের বরফঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। সবদিক ছিল সবুজ। দূরের নিম্ন ভূমি থেকে দূরের উঁচু ভূমি পর্যন্ত গাছগাছালির লম্বা লম্বা সারি জমীনের এই ভূখণ্ডকে স্বপ্নের রাজ্য বানিয়ে রেখেছে। মেঘের বড় বড় সাদা সাদা খণ্ড বিভিন্ন উপত্যকায় উড়ছিল। কখনও এই মেঘ বেড়ে গেলে মনে হত, আমি জমীনে নেই; শূন্যে আছি। যখন মেঘের একটি টুকরা আমার জানালার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হল, তখন আর কোন সন্দেহ থাকল না যে, আমি শূন্যে আছি। মনে হল কোন গায়েবী হাত বড় আদর করে আমার রুগ্ন হৃদয়কে সোহাগ করে যাচ্ছে। আমি কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম।

যেই হাত আমাকে সোহাগ করছিল, সেই হাতের পরশ আমি ডান কাঁধ ও ঘাড়ের উপর অনুভব করলাম। সম্বিত ফিরে পেলাম আমি। সেক্রেটারী আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার ডান হাত আমার কাঁধের উপর ছিল। আমার বাম কাঁধ লেগে ছিল তার বুকে এবং মুখ লেগে ছিল আমার মাথায়। মানসিকভাবে তো আমি তার নিকটবর্তী হয়েই গিয়েছিলাম, শারীরিকভাবে এই প্রথম তিনি আমার এত কাছাকাছি ছিলেন। আমি তার আরও নিকটবর্তী হয়ে তার দিকে তাকালাম। তার ঠোঁটে ছিল হাল্কা মুচকি হাসি। তার যে হাত কাঁধের উপর ছিল, সেটা সরে আমার চিবুকের নীচে এল। তিনি আমার মুখ উপরে তুললেন এবং এরপর তার মুখ খুব আস্তে আস্তে সামনে অগ্রসর হতে দেখলাম। জানালার পর্দা পড়ে গেল এবং সেই পর্দা উঠে গেল, যার সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম না। তবে পার্থক্য ছিল; অনেক পার্থক্য ছিল। এর আগে আমি আর কোন পুরুষের ঠোঁটে এমন নেশা অনুভব করিনি। এই লোকের ঠোঁটে নেশার সাথে বিশেষ পয়গাম ছিল।

আমার মুক্তির পরোয়ানা ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন আমার ঠোঁট নয়; রবং পরাজিত আর আহত আত্মা তার ঠোঁটের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এই লোকটি বদকার ও খারাপ চরিত্রের ছিল না। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আমার মত খুবসুরত ও জোয়ান নারীর মাধ্যমে দংশিত। কৃতজ্ঞতা কাকে বলে, আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে বলিনি যে, তাকে তো মাত্র একটি মেয়ে দংশন করেছে; কিন্তু আমাকে দংশন করেছে অনেক পুরুষ এবং এখন আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি তার বাহুবন্ধনে তার গালের সাথে নিজের কপোল লাগিয়ে অচেতন হয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এক কথা বলে সচেতন করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি হয়তো সেই ভুলই করতে যাচ্ছি, যা আমাকে একবার আত্মহত্যা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।

আমি তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য সামান্য চেষ্টাও করলাম যে, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আবেগ আমাকে সেই মেঘের কোলে নিয়ে গিয়েছিল, যা আমি মারীর উপত্যকায় সাঁতার কাটতে দেখছিলাম। আমি এই আনন্দ থেকে বের হতে চাচ্ছিলাম না। এ ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা। এর আগে তো আয়েশ আর পশ্চিমা ফ্যাশনে অভ্যস্থ ছিলাম। হয়তো আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এর মধ্যে বেয়ারা চা নিয়ে উপস্থিত হল এবং ঘোর কেটে গেল। চা পান করতে করতে আমি তাকে বললাম, 'ওই মেয়েকে ভুলে যান। প্রত্যেক মেয়ে আওয়ারা আর বিশ্বাসঘাতক নয়। কমপক্ষে আমি এমন নই।' তিনি নীরবে শুনছিলেন। চা পান করার পর আমরা বাইরে বের হলাম। কেউ যাতে চিনতে না পারে, এজন্য আমি বোরকা পরেছিলাম। নাক ও চিবুক নেকাবে ঢেকে ফেললাম। শুধু চোখ আর কপাল খোলা থাকল।

মারীর মাল রোড আমাকে বিস্মিত করে দিল। রাতের আঁধার গভীর হয়েছিল। বাতির আলোতে মাল রোড দিনের মত আলোকিত ছিল। ইংরেজী শিক্ষা, পশ্চিমা সংস্কৃতি আর ইউরোপিয়ান হোটেলগুলো আমাকে আমেরিকান বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মারীর মাল রোডে যখন নিজ দেশের ছেলেমেয়েদেরকে দেখলাম, তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, এটা সেই পাকিস্তানের অংশ, যাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলা হয়ে

থাকে। এমন নগ্নতা আর এমন বিলাসিতা? আমার মত বেপর্দা মেয়েও হয়রান হয়ে গেল। পুরুষরা ছিল দর্শক, আর মেয়েরা ছিল এমন নির্লজ্জ তামাশা যে, ইউরোপও দেখে শরম পাবে। আমি কিছু নওজোয়ান জোড়াকে একজন আরেক জনের কোমরে হাত দিয়ে হাঁটতে দেখলাম। নির্লজ্জতা শুধু মেয়েদের মধ্যেই ছিল না। পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়ো মহিলাদেরকেও গাঢ়ো মেকাপে দেখলাম। তখন শেলোয়ারের পায়া সংকীর্ণ করার প্রচলন ছিল। দেখলাম, বুড়ো মহিলাদের শেলোয়ারের পায়া মেয়েদের চেয়েও সংকীর্ণ। কিছু কিছু বুড়ো মহিলাকে হাতা ছাড়া কামিস পরিহিতাও দেখলাম।

আমি যখন মা আর দাদীদেরকে বুড়ো বাপ আর দাদাদের সঙ্গে এই অবস্থায় দেখলাম, তখন আমার দোস্তকে বললাম, 'এখন এই নওজোয়ান ছেলেমেয়েকে সামলানো সম্ভব নয়।' তিনি আমাকে বললেন, 'কিছু কিছু বুড়ো মহিলার সাথে যে জোয়ান মেয়েরা আছে, এরা তাদের মেয়ে। যাদেরকে তারা দেখানোর জন্য এনেছেন। তাদের জন্য এরা বর ফাঁসাতে চেষ্টা করে থাকেন।' তিনি বললেন। 'মারীর মাল হচ্ছে বাজার। এখানে একরাতের জন্য বৌ পাওয়া যায় এবং সারা জীবনের জন্যও।'

আমি পুরোপুরি বেহায়া হয়ে গিয়েছিলাম, যাকে ইংরেজীতে এ্যাডভান্স ও মডার্ন বলা হয়ে থাকে; কিন্তু মারীর মেয়েদেরকে দেখে নিজেকে সেকেলে মনে করতে লাগলাম।

আমি এই ভিড়ের মধ্যে দুটি জানাশোনা পরিচিত মুখ দেখলাম। আমার বা ইউরোপোৎপন্ন আমার দেহের এরা বন্ধু ছিল। আমার জায়গায় অন্য একটি মেয়ে ছিল তাদের সাথে। আচানক আমার অন্তরে উত্তাপ সৃষ্টি হল। আমি বেচাইন হয়ে গেলাম। আমি মেয়েটিকে ফেরাতে পারছিলাম না। যে দুই শাহযাদার সাথে সে মারী এসেছিল, তাদের চেহারা আঁচড়ে দিতে পারছিলাম না। আমি আমার সাথীকে বললাম, 'এই ভিড় থেকে বের হোন। হোটেলে চলুন, অথবা এমন কোন স্থানে চলুন, যেখানে আর কেউ থাকবে না।'

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সেই রাতে আমরা অনেক কথাবার্তা বললাম। একজন আরেক জনের কাছে বসে থাকলাম। বুকের ভার হালকা করতে থাকলাম। কিন্তু আমি তাকে নিজের অতীত সম্পর্কে কিছু বললাম না। তবে বিয়ে করার জন্য আমি তাকে রাজি করিয়ে ফেললাম। তিনি আসলে পুরোপুরি রাজি হচ্ছিলেন না। তবে ধরে নিয়েছিলাম যে, তিনি আমাকে কবুল করেছেন। আমরা আলাদা আলাদা পালঙ্কে শুইলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার ঘুম উড়ে গেল। তাকে আমার অতীত দেখাব, না কি আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখব, আমি এই চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভয় ছিল, তিনি আমাকে রাস্তার মেয়ে বলে প্রত্যাখ্যান করবেন। আবার এই ভয়ও ছিল যে, শাদীর পর আমি যখন তার সাথে বোরকা ছাড়া ঘোরাফেরা করব, তখন আমার পরিচিতরা হয়তো তাকে বলে দিবে, আমি কে? কোন আশঙ্কাই অর্থহীন ছিল না। কাজেই আমার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল ছিল।

পরের দিন তিনি আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। বাজার থেকে আমার জন্য একটি আংটি কিনলেন এবং নীচের দিকে সেখানে নিয়ে গেলেন, যেখানে পিকনিক স্পট আছে। আমরা অনেক দূর নীচে নেমে গেলাম। এক নির্জন কোণায় গিয়ে বসে তিনি আমাকে সিদ্ধান্ত শোনালেন যে, তিনি আমাকে বিয়ে করবেন। তিনি সেই আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। এ ছিল আমাদের এংগেজমেন্ট। হেচকি এল আমার এবং আমি বেসামাল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, যদি সীমান্তের ওপারের শারাফত আমার বাকি থাকত, তা হলে আজ বান্ধবীরা আমাকে দুলহান হিসেবে সাজাত এবং রাতভর ভিড়ের মধ্যে বসিয়ে গান গাইত। আমি লজ্জায় মরি মরি করে ডুলিতে চড়ে বসতাম। একটি পবিত্র দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার কারণে আমার মা-বাবা খুশি হতেন। কিন্তু আমার কিসমতে অপরাধীর বিয়ে লেখা হয়েছিল। প্রথম বিয়ের সময়ও অপরাধী ছিলাম। এখন দ্বিতীয় বিয়ে হচ্ছে, এখনও আমি অপরাধী। তিনি আমাকে সান্ত¡না দিলেন; কিন্তু কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন না।

'আমাদের বাগদান তো হয়ে গেল।' তিনি বললেন। 'তোমার মাবাবা যদি না মানেন, তা হলে কী হবে?'

'যদি না মানেন।' আমি বললাম। 'তা হলে আমি আপনার কাছে এসে পড়ব এবং বিয়ে করে ফেলব। এ তো তেমন কোন জটিল সমস্যা নয় যে, এ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

'আজ রাতে আমরা বাগদানের উপৎসব পালন করব।' তিনি খুব উৎসাহের সাথে বললেন। 'এবং উৎসব কীভাবে হবে, সেই সিদ্ধান্ত আমি একা নিব। আমি তোমাকে আপত্তি করার সুযোগ দিব না।'

তার সতেজতা দেখে আমার হৃদয়ও সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আমরা ওখানে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব তীব্র বৃষ্টি আমাদেরকে জাগিয়ে দিল। আমি এতটাই খুশি ছিলাম যে, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য স্থান খুঁজলাম না। গাছগাছালির বাইরে চলে গেলাম। বৃষ্টি ছিল খুব তীব্র। আমি মুখ উপর দিকে তুললাম। আমার এমন স্বস্তি অনুভূত হতে লাগল, যেন মুষলধারের বর্ষণ আমার বুক থেকে গুনাহের অসূচিতা এবং অন্তর থেকে দুঃচিন্তার কালিমা ধুয়ে দিল। আমি অনেক দিন পর জোরে জোরে অট্ট হাসি দিলাম এবং আমি হালকা হয়ে গেলাম। গাছের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এবং বৃষ্টিতে ভিজছিলেন। আমি তাকে বাহু দিয়ে ধরে টেনে গাছগাছালির বাইরে নিয়ে গেলাম। আমরা একজন আরেক জনকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম এবং শিশুদের মত নাচতে লাগলাম। যতক্ষণ বৃষ্টি হল, ততক্ষণ আমরা শিশুদের মত খেলতে থাকলাম।

সেই দিনগুলোর কথা আমার মনে পড়ছিল, যখন আমি পশ্চিমা সংস্কৃতির বেহায়াপনায় উন্নত হোটেলের অন্দরমহলে গাঁজা, মারিজুয়ানা ও শরাবের মধ্যে, উদ্যানের অন্ধকার কোণে রাতের আঁধারে, কারের পেছনের সিটের উপর, পশ্চিমা গানের হাঙ্গামায় আর স্বাধীন যৌনতায় সুখ খুঁজছিলাম এবং মনে করছিলাম, আমি সুখ পেয়ে গেছি; কিন্তু যা পেয়েছিলাম, তা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। মানসিক সুখ যা পেয়েছিলাম, তা পেয়েছিলাম মারীতে মুষলধারার বৃষ্টিতে, যখন আমার আঙুলে বাগদানের আংটি ছিল। এই আংটি

আমাকে তিনি পরিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে আমি অন্তরের গভীর থেকে কামনা করছিলাম। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মানসিক সুখ রয়েছে হৃদয়ে পরিচ্ছন্নতা এবং খোদার বৃষ্টির মত নেয়ামতের মধ্যে। এই বৃষ্টির মধ্যে আমি খোদাকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম এবং মনে মনে অঙ্গীকার করেছিলাম, খোদাকে কখনও নারাজ করব না।

কিন্তু খোদা আমার উপর নারাজ ছিলেন।

তখন রাতের নয়টা বাজছিল। আমরা ছিলাম হোটেলের কামরায়। গোসল করে কাপড়চোপড় বদলে ফেলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এখন বাগদানের উৎসব পালন করব।' আমি ভেবেছিলাম, উৎসব উত্তম খাবারের কোনকিছু হবে। এ ছাড়া আমরা আর কী করতে পারতাম। ইতোমধ্যে বেয়ারা কামরায় প্রবেশ করল। তার হাতে ছিল ট্রে। ট্রেতে ছিল হুইস্কি, দুই বোতল সোডা, দুটি গ্লাস আর রোস্টকৃত আস্ত মুরগী। বেয়ারা টেবিলে এসব জিনিস সাজিয়ে রেখে চলে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি শরাব পান করেন?

'না তো।' তিনি আজব কণ্ঠে জওয়াব দিলেন। 'আমি অভ্যস্থ নই। একটু একটু করে দু'জনই পান করব।'

আমার জন্য হুইস্কি নতুন কিছু ছিল না। আমি তো এর চেয়েও নিকৃস্ট নেশা করেছিলাম। কিন্তু হবু স্বামীর কল্পনার সাথে শরাব সংশ্লিস্ট করতে চাইছিলাম না। আমি তাকে পরিচ্ছন্ন জীবনের মানুষ মনে করছিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, বিয়ে করব এবং প্রাচ্যের স্ত্রী হয়ে দেখাব। আমি তাকে বললাম, 'একটি শরীফ মেয়েকে শরাব পেশ করা কোন ভালো কথা নয়। আপনি কীভাবে মনে করলেন যে, আমি শরাব পান করব।'

তার হাসি আজও আমার মনে আছে। তিনি যখন হাসলেন, তখন আমি পরিষ্কার দেখলাম যে, তার হাসি নির্মল আর অকৃত্রিম নয়। সেই হাসি আমি খুব ভালো করে চিনতাম। তিনি খুব চমৎকারভাবে হাসতেন; আমাকে শরাব পেশ করার সময় তার ঠোঁটে যেই হাসি এসেছিল, তাতে এমন সংবাদ ছিল যে, তিনি নিজে শরীফ পুরুষ নন,

অথবা তিনি আমাকে আওয়ারা মনে করেন। হুইস্কির বোতল খুললেন এবং একটু একটু করে হুইস্কি উভয় গ্লাসে ঢেলে কিছু কিছু করে সোডাও ঢেলে দিলেন।

'আমি পান করব না।' আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম। 'আপনি পান করুন।'

'না, পান করো।' রুষ্ঠ হয়ে বললেন তিনি। 'আমি একা তো পান করব না। একটু আনন্দ করব।'

আমি তাকে অসন্তুষ্টও করতে চাইছিলাম না। 'বিয়ের পর আমি পান করতে দিব না' বলে আমি গ্লাস হাতে নিলাম। তিনি আমার গ্লাসের সাথে গ্লাস ঠেকালেন এবং ঠোঁটে লাগালেন। আমি প্রথা রক্ষার্থে গ্লাস মুখে লাগলাম এবং দুইতিন ফোঁটা মুখে দিলাম। হাসিমজাকের মুড এসে পড়ল তার। দুইতিন ঢোকে গ্লাস খালি করে দিলেন তিনি। আরও দুই পেগ ঢাললেন। যতটুকু সময়ে আমি দুইতিন ঢোক হুইস্কি শেষ করলাম, ততটুকু সময়ে তিনি চতুর্থ বোতল খতম করে ফেললেন। তিনি আমার গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। সোডাও দিলেন এবং বললেন, 'এটা একশ্বাসে পান করে ফেলো।'

আমি এক শ্বাসে পান করলাম না। এক ঢোক পান করে তাকে বললাম, 'এখন বোতল একদিকে রেখে দিন। আপনি অনেক পান করেছেন।' তার সেবনের ভাব দেখে বুঝে ফেললাম যে, ইনি মাদকাসক্ত। তিনি খিলখিলিয়ে হেসে বললেন, 'আরে কতটুকু বা পান করেছি?' তার যবান কাঁপতে আরম্ভ করল। তিনি আরও পান করতে থাকলেন। একবার তিনি বললেন, 'আমি প্রথম স্ত্রীর ভালোবাসার পেরেশানী শরাবের মধ্যে ডুবিয়ে দিব।' এরপর নিজেকে তোমার ভালোবাসায় ডুবিয়ে দিব। তুমিও পান করো, আরও পান করো। আগামী কাল থেকে আমরা যাহিদ ও পারসা হয়ে যাব; লায়লা ও মজনু হয়ে যাব; শিরিঁ ও ফরহাদ হয়ে যাব।

তিনি চূর হয়ে গেলেন। আমি উঠে বোতল সরিয়ে রাখলাম। ততক্ষণে দেড় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। তিনি উঠে বোতলের

দিকে এগোলেন। তখন তার পা কাঁপছিল। আমি তাকে বাধা দিলাম। তিনি গ্লাস রেখে আমাকে বাহুতে ধারণ করে এত জোরে নিজের সাথে চেপে ধরলেন যে, আমার হালকা চিৎকার বেরিয়ে এল। আমার ঠোঁট তিনি নিজের মুখে নিলেন। এরপর আমাকে উঠিয়ে পালঙ্কে ফেলে দিলেন এবং আমার নিম্নবস্ত্র ধরে টানতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, ইনি সেই ব্যক্তি নন, যাকে দুঃখী ও আন্তরিক মনে করতাম। আমি তার হাত থেকে কাপড় ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং দুই হাতে তার মাথা ধরে তার ঠোঁটে চুমু দিলাম এবং মিনতি করে বললাম, 'কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে। এখানে এই কামরায় এসে আমরা হানিমুন পাল করব। মহব্বতকে অপবিত্র করবেন না।'

'আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।' তিনি বললেন। আসো, 'হানিমুন পালন করি।' তিনি আমাকে আরও একবার চেপে ধরে পালঙ্কে এনে বসালেন।

আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। খুব গোস্যা হল। আমি বললাম, 'আমি তোমাকে শরীফ মানুষ ভেবে আসছি; অথচ দেখা যাচ্ছে তুমি একটা শরাবখোর, বদকার। একটি শরীফ মেয়েকে শরাব পান করাতে তোমার লজ্জা হয় না।'

'আরে বসো।' শান্তভাবে তিনি বললেন। 'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমিও শরীফ মেয়ে নও; আমিও শরীফ ছেলে নই। তুমি শরীফ হলে এত সাহস করে আমার সাথে মারী আসতে না। এত সহজে শরাবের গ্লাস হাতে নিতে না। শোনো সুইট! আমি তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানি। বোরকা তোমার অতীতকে ঢেকে রাখতে পারে না। দপ্তরে অনেক লোক আসে। দু'জন লোক তোমার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি কে এবং কেমন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তুমি অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর। আমি তোমাকে চাকুরি নিয়ে দিয়েছি। অনেক বেশি বেতন ধার্য করে দিয়েছি। নিজের সাথে রেখে তোমার পজিশন উন্নত করে দিয়েছি; কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য এই দেহ আমাকে দিতে অস্বীকার করছ, যা তুমি অসংখ্য মানুষকে দিয়ে ফেলেছ।'

‘আমি তোমাকে এই দেহ সারা জীবনের জন্য দিয়ে দিয়েছি।’ আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম। তিনি আমার অতীত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, এই দুঃখ আমাকে আহত করে দিল।

‘তুমি আমাকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছ।’ সে বলল। ‘তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলে; কিন্তু তুমি বলতে চাচ্ছিলে না যে, তুমি অনেক মানুষের ব্যবহৃত।’ বেসামাল হয়ে গিয়েছিল সে। নেশার ঘোরে মানুষ অন্তরের রহস্য প্রকাশ করে দেয়। কেননা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তার থাকে না। তারও এমনই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, ‘আমার কুরবানী দেখো। তোমার জন্য আমি কত ভালো স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

‘কোথায় তোমার স্ত্রী?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘আমার বাড়িতে।’ নেচে উঠে বলল সে। ‘আমার দুই বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে।’ গ্লাসে পড়ে থাকা হুইসকি সে গলধ করল এবং কাঁপতে কাঁপতে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল। বন্ধুত্বের সুরে বলল, ‘এমন পাথর আর পবিত্র হয়ো না।’

আমার কেমন দুঃখ হওয়ার কথা, তা হয়তো আপনি অনুমানও করতে পারছেন না। আসমান-জমীন ঘুরে গেল। ঠিকানা পেয়েছি বলে আমি খুশি ছিলাম; কিন্তু ঠিকানা ছিল বিভ্রান্ত। আমার মধ্যে ঘৃণা ও প্রতিশোধের তুফান শুরু হল; কিন্তু আমি তা বুকের মধ্যেই লুকিয়ে রাখলাম। কিছু বলা ছিল বেকার। তাকে সাচ্চা মহব্বতের দোহাই দেওয়া ছিল অনর্থক। সে আমার সাথে নাটক করেছিল। আমার মন ও হৃদয়ের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাকে মারী নিয়ে আসতে চেয়েছিল সে। এতটুকুতে সে কামিয়াব ছিল। তার স্ত্রীর উপর আমার করুণা হল, যিনি তার কথামত সতী ও শরীফ ছিলেন। বেচারী ঘরে বসে এর বাচ্চা পালছিলেন, আর এই বদকার মারীতে আয়েশ করছিল।

বার বার সে আমাকে বাহুবন্ধনের নিচ্ছিল। তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল মনে হচ্ছিল। আমি এমন লোকদের চিকিৎসা জানতাম। সাথে সাথে আমি আচরণ বদলে ফেললাম এবং তার সাথে

পালঙ্কে বসে পড়লাম। আমি তার গ্লাসে হুইস্কি ঢাললাম এবং সোডা না দিয়ে গ্লাস তার মুখে লাগিয়ে দিলাম। নারী, বিশেষত আমার মত জোয়ান ও খুবসুরত নারী, যে অ্যাক্টিংও করতে পারে, সে বড় বড় মরদ লোককে আঙুলের উপর নাচাতে পারে। আমি তার মুখে গ্লাস লাগিয়ে দিলাম এবং একহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে আনলাম। হাসি দিয়ে বললাম, 'তুমি একটা পাপী।'

'আমরা পাপী।' শ্লোগানের সুরে বলল সে। 'সারা পাকিস্তান পাপী। আরও পান করাও। আমাকে আরও পান করাও। ঘরে আমার বউ হারামযাদী সিগারেট পর্যন্ত পান করতে দেয় না।' গ্লাস খালি করে সে আমার গাল চুষতে লাগল। আমি আরও হুইসকি তাকে সোডা ছাড়া পান করালাম। হুইসকি এখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি উঠতে গেলে সে আমার বাহু ধরল। আমি হেচকা দিলে সে পালঙ্কে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আবার উঠে হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; কিন্তু দুই কদম এসে থেমে গেল। তার শরীর ঢুলছিল। আমি যে তাকে খালি হুইস্কি পান করিয়েছিলাম, সেটা তার জোর খতম করে দিয়েছিল। আমি পুরো শক্তি দিয়ে তার মুখে থাপ্পড় মারলাম। যতটুকু ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন ছিল, ততটুকু শক্তি থাপ্পড়ে ছিল না। কেঁপে উঠল সে। আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিলাম। পালঙ্কে গিয়ে সে এমনভাবে পড়ল যে, তার হাঁটু মেঝেতে ঠেকে থাকল এবং ধরের উপরের অংশ পালঙ্কে। সে আর উঠতে পারল না।

আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম এবং জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মারীতে শ্রাবণের রাত ছিল শীতল। মারীর আলো ছিল আমার সামনে। আমি মঞ্জিলে এসে পড়েছিলাম; কিন্তু এটা মঞ্জিল ছিল না; ছিল মরীচিকা। আমি অনবরত কাঁদতে থাকলাম। আমার হেচকি বন্ধ হয়ে গেল। অতীতের একেকটি মুহূর্ত, একেক জন মানুষের কথা মনে পড়তে লাগল। প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাপে নিমজ্জিত দেখা গেল। আমার বাচ্চার কথাও মনে পড়ে গেল। প্রথম বারের মত বাচ্চার কথা মনে করে কাঁদলাম এবং এমন কাঁদলাম, যেন শিশুর খেলনা ভেঙে গিয়েছে। মনে পড়ে গেল যে, আমার বাচ্চা হচ্ছে

দুনিয়ার একক পুরুষ, যার কাছ থেকে ফেরেশতার হাতে ধৌত করা ভালোবাসা মিলতে পারত। এই খাহেশ আমাকে এমন পেরেশান করে দিল, মনে হল খ্রিস্টানদের কাছে গিয়ে বাচ্চাটা ফিরিয়ে আনি এবং তাকে বুকে লাগিয়ে বলি, 'আয় আমার কলজের টুকরা, আমরা দু'জন আপাদমস্তক পাপ। আয়, মসজিদ আর গির্জা থেকে দূরে এমন কোথাও চলে যাই, যেখানে আমরা খোদাকে পেয়ে যাব।'

আবেগে আমি বয়ে যেতে লাগলাম এবং জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলাম। আমার সামনে অতীত জীবনের ফিল্ম চলতে থাকল। এরপর আচানক মারীর সমস্ত আলো এক চক্করে ঘুরে গেল। আমার চিন্তাভাবনার ধারা পেছনে ফিরল। আমি বাতি জ্বালিয়ে দিলাম এবং লম্ফ দিয়ে হুইসকির বোতল মুখে লাগালাম। ট্রেতে আস্ত মুরগীর রোস্ট ছিল। ছুড়ি দিয়ে কেটে কেটে মুরগীর টুকরা খেতে লাগলাম। হতভাগা, ধোঁকাবাজ অর্ধেক পালঙ্কে, আর বাকি অর্ধেক মেঝেতে পড়েছিল। সকাল পর্যন্ত তার উঠবার শক্তি ছিল না। আধা মুরগী আর সালাদ খেয়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণ হুইস্কি পান করে আমার উদাসীনতা ডুবে গেল। পরাজয় বিজয়ে বদলে গেল। আমি নিজে বদলে গেলাম। মস্তিষ্ক অন্যকোন দিকে চলতে লাগল। নিজের অস্তিত্ব নাপাক ও অপবিত্র মনে হতে লাগল। আমার যে চুল, চোখ ও গোরা রঙের উপর পুরুষ বিভ্রান্ত হত, এগুলো বিক্রির বস্তু মনে হতে লাগল। এত চেষ্টা আর এত অভিজ্ঞতার পর এই পরিণত হল যে, আমি বিতাড়িত; দরবারচ্যুত। আমার সেই চার অনুগ্রহকারী আমাকে আর কতদিন লুকিয়ে রাখবে। এখন আর আমি তাদের কাছে যাব না।

আমি তো জোয়ানই হয়েছিলাম কিছুটা বেহায়াপনার মধ্য দিয়ে, তার উপর ছিল শরাবের বেশ আসর। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পুরুষদের জালেই যেহেতু বার বার ফাঁসতে হয় এবং ধোঁকার উপর ধোঁকা খেতে হয়, তবে আমি নিজেই কেন ধোঁকায় পরিণত হব না? আমি আর শরীফযাদী ছিলাম কোথায়? কিছুটা স্বস্তি অনুভূত হতে লাগল। যেহেতু নেশার ঘোরে ছিলাম, এজন্য আমার বিবেক কাজ করছিল না। আমি ভাবলাম না যে, নতুন জীবনের সূচনা কীভাবে

করব? আমার একটি ঠিকানা দরকার এবং একটি লোকের প্রয়োজন হবে। আমি নেশা আর আবেগে থাকতে থাকতেই কামরা থেকে বের হয়ে গেলাম। নীচে নামলাম এবং বাইরে বের হয়ে পড়লাম। সামনে ছিল হোটেলের বাগান। তার সামনে ছিল ঢালু। বাগানে এক জোড়া ইউরোপিয়ান বসে ছিলেন। আমি ঢালুর কাছে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম।

'চেয়ার এনে দিব?' কেউ এসে জিজ্ঞেস করল।

আমি ঘুরে দেখলাম। তিনি ছিলেন হোটেলের ম্যানেজার। আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'একটু পায়চারী করতে বের হয়েছি।' তিনি হয়তো জেনে ফেলেছিলেন যে, আমি পান করে এসেছি। এক বেয়ারাকে ডেকে তিনি দুটি চেয়ার আনালেন এবং আমরা দু'জন বসলাম।

'আপনার সঙ্গী তো বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন।' তিনি বললেন। 'খুব পান করেছেন। আমি ওদিক দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় দেখেছি। উনি কি আপনার স্বামী?

'বন্ধু।' আমি জওয়াব দিলাম। তিনি আগ্রহ নিয়ে কথা শুনতে ও বলতে লাগলেন। আমি বেহুঁশ বন্ধুর ব্যাপারে এমন কিছু কথা বললাম, যা থেকে তিনি বুঝে নিলেন, আমি তাকে পছন্দ করি না। আমি তাকে বললাম যে, আমি তার কোম্পানীর চাকুরে।

'বেতন কত?'

'সোয়া পাঁচশত টাকা।' আমি জওয়াব দিলাম।

আমি আপনাকে একটি পরিষ্কার কথা বলব। আপনি খারাপ ভাববেন না তো? তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং যখন আমি বলুন বললাম, তখন তিনি বললেন, 'যদি এমন বদকার লোকদের সাথেই ঘুরতে হয় এবং চাকুরির জন্য তাকে খুশি রাখতে হয়, তা হলে এই সওদা আপনার জন্য অনেক দামের। আপনার তো এ-ই ভয় যে, যদি আপনি তাকে খুশি না রাখেন, তা হলে আপনাকে চাকুরি থেকে বের

করে দিবে, তাই না?' আমার জওয়াব না শুনেই তিনি বললেন, 'এই হোটেলে বিদেশী লোকজন আসেন। আপনার মত মেয়ে আমার দরকার। আপনি সোয়া পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে খুব সহজে কামাতে পারবেন। এই হোটেলেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে।'

আমি আপত্তি করলাম না। তিনি ওই লোকের ব্যাপারে জানালেন যে, লোকটি বদকার ও ফূর্তিবাজ। হোটেলের ম্যানেজারের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বললেন, 'এই লোক গ্রীষ্মকালে দুইতিন বার মারী আসেন। তার সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। এই হোটেলেই কয়েক দিন অবস্থান করেন।'

'আমাকে আলাদা কামরা দিন।' আমি ম্যানেজারকে বললাম। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন। কাল সকালে যখন তার হুঁশ ফিরে আসবে, তখন আমার ব্যাপারে তাকে বলে দিবেন, 'আমি আপনাকে অবগত করে চলে গেছি।'

ম্যানেজার আমাকে খুব ভালো কামরা দিলেন। সাজানো গোছানো প্রশস্ত কামরা; কিন্তু আমার কাছে ফাঁসির কক্ষের মত ভয়ংকর মনে হল। আমি ভয়ে ভয়ে ওই বদকারের কামরায় গেলাম। আমার কাপড়চোপড় ও আরও কিছু জিনিস ওখানে পড়ে ছিল। পালঙ্ক থেকে সরে মেঝেতে পড়ে ছিল সে এবং বেহুঁশ ছিল। আমি নিজের কাপড় ও অন্যান্য জিনিস গোছালাম। এটাচি কেইস হাতে নিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলাম। সিদ্ধান্ত বদলানোর কোন পথ হতে পারে কি না, এ নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। কোন পথ ছিল না। আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর আমার অতীত কালো মেঘের মত ছেয়ে গিয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সমাজে এমন কোন পুরুষ নেই, যে আমাকে স্ত্রী বলে ঘরে নিবে এবং আমার দেহের সাথে খেলবে না। আমার জন্য রাস্তা ছিল একটিই, যা ম্যানেজার আমাকে দেখিয়েছিলেন।

হয়ে গেলাম অভিজাত পতিতা

চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ম্যানেজার এলে তাকে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলাম যে, আমি এই হোটেলে থাকব। আমি পেশাদার পতিতা ছিলাম না; পেশাদার পতিতা কখনও দেখিনি। তাদের কথা শুনেছিলাম। সেগুলো সব আমার মাথায় হাযির হল। আমি যখন ম্যানেজারকে সিদ্ধান্ত শোনালাম, তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল, যা বয়ান করতে পারব না। কান্না উচিত ছিল আমার; কিন্তু আমার চোখ ছিল শুষ্ক। চোখ শুকানোর তো প্রশ্নই আসে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আমি চিন্তিতও ছিলাম না। তখন আমার কিছুই মনে পড়ল না। বাড়ি, মাবাবা, ভাই- কিছুই না। সেই বান্ধবীদের কথাও মনে পড়ল না, যারা নোংরা নোংরা উর্দু স্কুলে পড়ত বলে আমি তাদেরকে তুচ্ছ মনে করতাম। সেই বন্ধুদেরকেও মনে পড়ল না, যাদের সাথে আয়েশ করেছিলাম এবং পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম।

'আমি কুঠির পতিতা হব না।' আবেগশূন্য ভঙ্গিতে বললাম।

'আপনি কীসের ভাবনায় পড়েছেন?' তিনি বললেন। 'এই হোটেলে আপনাকে বড় মর্যাদার আসন দেওয়া হবে। আপনি উঁচু স্তরের মেহমান ও বিদেশী আমীরযাদাদের দেখাশোনা করবেন। তাদেরকে স্বাগত জানাবেন। তাদের কেউ আপনার সাথে ফূর্তি করতে চাইলে ইচ্ছামত ফিস নিবেন। তবে সেই ব্যক্তি অনেক উঁচু পর্যায়ের হওয়া চাই। আপনি এমন সস্তা জিনিস নন যে, আমি আপনাকে যেকারও সামনে নিক্ষেপ করতে থাকব। আপনি এই হোটেলে শরাব ও নাচের পার্টিতে সসম্মানে শরীক হতে পারবেন।'

এসব কথায় আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তিনি আমাকে কিছু শর্ত বললেন, যেগুলো আমি কাউকে বলব না। আমি সেগুলোর কয়েকটি মেনে নিলাম; কয়েকটি মানলাম না। আমি তাকে কিছু শর্ত দিলাম। সেগুলোর কয়েকটি তিনি মানলেন; কয়েকটি মানলেন না। আমি আসলে হোটেলের কয়েদী হতে চাচ্ছিলাম না। আমি তাকে শর্ত মানাতে চাইছিলাম যে, আমি বোরকা পরে বাইরে ঘুরে বেড়াব এবং আমার পছন্দের খদ্দের বা বন্ধু সঙ্গো আনার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকব। তিনি এই শর্ত মেনে নিলেন। এরপর আমরা বাকি শর্তগুলো স্থির করলাম। এই হোটেলে কোন্ ধরণের লোকজন আসে, তারা কী চায় এবং তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়, এসব কথা তিনি সবিস্তারে বয়ান করলেন। তিনি জানালেন যে, এখানে বাইরে থেকে মেয়েদেরকে ডেকে আনা হয়।

এখন আমার জন্য কান্নাকাটি করা, আফসোস করা, নিজেকে বা অন্যকে দোষারোপ করা এবং দুঃখ করা- সব বেকার। আমি স্থির করলাম যে, নিজেকে মজলুম বলব না এবং কারও কাছে সমবেদনা ও আদরের ভিক্ষা চাইব না। ম্যানেজারকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলাম, যদি তার মনে খেয়াল এসে থাকে যে, আমি যেহেতু তার মুখাপেক্ষী, এজন্য আমি তার রক্ষিতা হয়ে থাকব, তা হলে তিনি যেন এমন চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তার অন্তরে এমন কোন দুরভি সন্ধি নেই। যা হোক, মজবুর ও অসহায় হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ পেতে দিলাম না যে, আমি অসহায়। নিজের মূল্য সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম।

আমি অভিজাত পতিতা বনে গেলাম। নিজের স্বপ্নগুলোকে কাঁচের চুরির মত চূর্ণ করে দিলাম। বিয়ের কথা মস্তিষ্ক থেকে বের করে ঝেড়ে ফেলে দিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলাম যে, আমি কারও মেয়ে বা কারও বোন। ম্যানেজার আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি আমাকে জানালেন, আমার একরাতের বাগদত্তক চলে গেছে। আমি মহব্বতকে দাফন করে দিলাম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সোসাইটি নগ্ন হয়ে আমার সামনে এসে পড়ল। সেই

বুযুর্গও আমার কাছে এসে উলঙ্গ হলেন, যিনি উঠতে বসতে একটিই শ্লোগান আওড়ানে, 'পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, এখান থেকে মাদক ও পতিতাবৃত্তি নিঃশেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।' তিনি মদ পান করে আমার কাছে এলেন এবং এলেন তিনিও, যিনি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর ওয়াদা করে বেড়াতেন।

আপনার যদি সাহস থাকে যে, জাতির পেরেশানী যেসব রাজনীতিক শরাবের মধ্যে ডুবিয়ে দেন, তাদের নাম প্রকাশ করবেন, তা হলে আমি তাদের নাম বাতলে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন না। যদি আপনি তাদের নাম প্রকাশ করতে সাহস করেন, তা হলে আপনাকে বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে না। যদি আপনি ১৯৬৪'এর পত্রপত্রিকা দেখেন, তা হলে সেগুলোতে দেখতে পাবেন, প্রথম পাতাগুলোতেই আইয়ুবশাহীর এক মন্ত্রীর বিবৃতি ছাপা হয়েছিল, যাতে তিনি এই শব্দগুলো বলেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানে খোলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেই দম নিব।' এই বিবৃতি তিনি মারীতে অবস্থান করেই পত্রপত্রিকায় প্রেরণ করেছিলেন। আমি মারীতেই পড়েছিলাম। ওই রাতেই তার নির্দেশ 'তাজা মাল চাই' অনুসারে আমি তার কামরায় গিয়েছিলাম এবং ফিরেছিলাম তখন, যখন শরাব ও নিদ্রা তাকে বেহুঁশ করে দিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি, 'জনাব! খোলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কি এগুলোর কিছু ছিল?'

এটি শুধু একটি উদাহরণ। যদি আমি আপনাকে তাদের ব্যাপারে বলতে শুরু করি, যারা আমার কাছে আসতেন এবং এখনও আসেন, তা হলে আপনি বিশ্বাসই করবেন না। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে, পাকিস্তানে কুরআনী আইন বাস্তবায়কারী দু'জন ধর্মীয় লিডার আমার পার্সোনাল খদ্দের? পাকিস্তানের মানুষের জন্য আমার দুঃখ হয়, যারা তাদের নামে 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেয় এবং নিজেদের ভাগ্য তাদের বয়ান-বক্তৃতার সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। একটু চিন্তা করুন তো, এই সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট লিডার পাকিস্তানকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা থেকে মুক্তি দিবেন, যিনি আমার হাতে শরাব পান করেন এবং সম্পদ

লুটিয়ে বেড়ান। এগুলো এই দেশের সম্পদ; গরীব জনগণের সম্পদ, যা তারা লুট করছেন এবং তার বেশিরভাগ অংশ 'তাজা মাল' ও সমুদ্রপাড়ের শরাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

তলোয়ারের জোরে যারা কাশ্মীর আযাদ করতে চান, তারা আমার হাতে শরাব পান করেছেন এবং আমার সাথে রাতযাপন করেছেন; শুধু এক রাত নয়; বরং তারা আমার সাথে বহু রাত যাপন করেছেন। জাতির চিন্তায় পেরেশান [পত্র-পত্রিকার] এডিটররাও আমার কাছে এসে এমনভাবে উলঙ্গ হয়েছেন যে, আমি তাদের হৃদয় পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। আমার কাছে আইন ভঙ্গাকারী আসেন; আসেন আইনের মোহাফেজও। দেশ ও দেশের শাসকদের যেই ভেদ আমার বুকের মধ্যে অথবা আমার সমপেশার নারীদের বুকের মধ্যে রয়েছে, তা অন্যকারও জানা নেই। নারী বাদশাহরও দুর্বলতা; ফকীরেরও দুর্বলতা। এই কারণেই যতটা সফল চরবৃত্তি নারী করতে পারে, একজন সাহসী ও বিরাটকায় পুরুষ তা করতে পারে না।

সৌন্দর্য ও যৌবনের কাছে আইন অসহায়

এখন আমি আপনাকে যেসব কথা বলব, সেগুলো আমি খুব সতর্কতার সাথে বলব। শহরসমূহের নাম বলব না। কোন ব্যক্তির নামও বলব না। আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না। কেননা, আপনার কোনও প্রশ্নের আমি দিব না। যা-কিছু বলা আমি যথার্থ মনে করছি, তা আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। আপনি লিখতে থাকুন। আমি আপনাকে আরেক বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমি বাজারী পতিতা নই। আমি সেই বেশ্যাদেরও দলভুক্ত নই, যারা খদ্দের ফাঁসানোর জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং একেক রাতে কয়েক বার বিক্রি হয়। আমি হোটেলে থাকতাম। হোটেলে আগত বিদেশী এবং নিজের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাথে এমনভাবে ওঠাবসা করতাম, যেন হোটেলমালিকের মেয়ে অথবা হোটেলের ব্যবস্থাপনা ইনচার্জ। আমি মদ ও নাচের পার্টিতে শরীক হতাম এবং সেই ফাঁকে দু'চার জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজ পছন্দের উঁচু ব্যক্তিকে ফাঁসিয়ে ফেলতাম। তা-ও এমন অহঙ্কারের সাথে করতাম যে, কারও সন্দেহও হত না যে, আমি পতিতা এবং হোটেলেই থাকি। আমার কাছে অ্যাডরেস ও টেলিফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করা হত। আমি জওয়াবে বলতাম, 'ডেডি বলে থাকেন, কাউকে অ্যাডরেস ও টেলিফোন নাম্বার দেওয়া যাবে না।'

এমন পতিতাবৃত্তি সেই মেয়েরাও করে থাকে, যাদের মা-বাবা তাদেরকে এ্যাডভান্স ও মডার্ন বানিয়ে রেখেছেন এবং গর্বের সাথে

তারা তাদেরকে সেই পার্টিসমূহে নিয়ে আসেন, যেখানে মদ ও ড্যান্স চলতে থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ স্বামীর উপস্থিতিতে এমন পতিতাবৃত্তি করে থাকেন, যা আমি কলেজজীবনে ইউরোপিয়ান স্টাইলের বিভিন্ন হোটেলে করতাম। আমীর ঘরানার মেয়েরা সেখানে কেন যেত, সে কথা আমি আপনাকে সবিস্তারে শুনিয়ে এসেছি; কিন্তু তাদেরকে পতিতা বা বেশ্যা বলা হয় না। কেননা, তাদের ঘরঘাট আছে। তাদের পিতা ও স্বামী তাদেরকে ইজ্জতের সাথে ঘরে নিয়ে যান এবং এই বেহায়াপনাকে নতুন সংস্কৃতি বলে থাকেন। কিন্তু আমি এখন পতিতা ছিলাম। কেননা, আমার ঘর ছিল না। কোন বাপ ছিল না এবং কোন স্বামীও ছিল না।

এসব পার্টি আমি দেখাশোনা করতাম। আমি ইংরেজী বলতে পারতাম। অভিনয়ও করতে পারতাম। খোদা আমাকে চেহারাও দিয়েছিলেন। বয়সও মানানসই ছিল; স্বাস্থ্যেও আকর্ষণও ছিল। কেউ আমাকে বিক্রির মাল মনে করত না। তারপরও আমি তাদের কাছ থেকে ইচ্ছামত দাম উসুল করে নিতাম। উপহার-উপঢৌকন ছিল আলাদা। মাত্র দুই মাসে আমি এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে গেলাম এবং নিজের পেশায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলাম। এতটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করলাম যে, তৃতীয় মাসে হোটেলের ম্যানেজার পুলিশের অনেক বড় এক অফিসারের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'বড় খবীস ইনসান, যখনই এখানে আসে, এই হোটেলে বিনেপয়সায় থাকে। বিনেপয়সায় সবচেয়ে দামী শরাব পান করে এবং প্রত্যেক বার বিনেপয়সায় 'তাজা মালে'র অর্ডার করে। আমাদের জান থাকে তার হাতের মুঠোয়। এই অফিসারের প্রত্যেক অর্ডার আমাদের পুরা করতে হয়। আজ রাতে তোমাকে তার কামরায় যেতে হবে। ফিস আমার কাছ থেকে নিয়ো। এই কাফের মাঙনা খদ্দের।

আসলেই সে খবীস ইনসান ছিল; কিন্তু ম্যানেজার যাকে মাঙনা খদ্দের বলছিলেন, সে দ্বিতীয় দিন যখন হোটেল থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন তার সাতশত টাকা আমার পার্সে ছিল। আমি তার কাছে তেমন কোন দাবি করিনি। নিজের নিপীড়িত হওয়ার কথা তুলে ধরিনি। শুধু

তাকে আঙুলের উপর নাচিয়েছিলাম। সে আমাকে ফিসহিসেবে সাতশত টাকা দেয়নি; বরং সে বলেছিল, ‘কাল আমার কাছে এতটুকু সময় থাকবে না যে, আমি তোমার জন্য কোন উপহার কিনে আনব। এই পয়সাগুলো রাখো। আমার পক্ষ থেকে নিজের পছন্দমত কোন উপহার কিনে নিয়ো।’

মারীর সিজন শেষ হয়ে আসছিল। মাল রোডের সন্ধ্যা বিরান হতে চলছিল; কিন্তু আমার হোটেলের রওনকে কোন তফাত সৃষ্টি হয়নি। ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী বয়সের এক লোক কিছু দিনের জন্য হোটেলে এলেন। তাকে কোন রাজ্যের নওয়াব মনে হত। তার সাথে পরিচয় হওয়ার পর দেখলাম বেশ প্রাণবন্ত লোক। রসিক মানুষ। আমি তার নজরে পড়ে গেলাম। আহারের পর তিনি আমাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত গপশপ চলতে থাকল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ করলাম, তার আচরণ ওইসব লোকের মত ছিল না, যারা আমাকে নিজ নিজ কামরায় নিয়ে যেত। মনে হচ্ছিল, আমি যে সুন্দর ও জোয়ান মেয়ে, তা নিয়ে তার কোন আকর্ষণ নেই। আমিও তাকে এমন কোন ইশারা করলাম না যে, আমি দেহব্যবসার মেয়ে এবং তাড়াতাড়ি দায়মুক্ত করে দিতে হবে। তার কথাবার্তায় বেশ মজা পাচ্ছিলাম এবং বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সময় অতিবাহিত করার জন্য ইনি বেশ ভালো সঙ্গী।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তিনি মূল কথায় এলেন। বললেন, ‘ম্যানেজার তোমার ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছেন যে, তুমি নবাগতা; কিন্তু আমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যে কামরায় ডেকে আনিনি। আমি তোমাকে কয়েক দিনের জন্য সাথে নিয়ে যেতে চাই। যা চাবে, দিয়ে দিব; আমি কিন্তু তোমাকে রক্ষিতা হিসেবে নিব না। গাড়ি দিয়ে নিয়ে যাব; গাড়ি দিয়ে দিয়ে যাব।

স্পষ্ট কথা যে, আমি সাথে সাথে রাজি হতে পারছিলাম না। আমি চিন্তা করলাম, তিনি আমাকে কোথায় এবং কেন নিয়ে যাবেন। তখন তিনি আমাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন। তিনি এও বললেন, ‘তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পার, তা হলে পঞ্চাশ হাজার, এক

লাখ, দুই লাখ টাকা তোমার নামে ব্যাংকে জমা করিয়ে দিব।' আমি তার প্রয়োজন বুঝলাম এবং কোন প্রকার নগদ জামানত ছাড়াই তার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

এই কাজের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন প্রখ্যাত স্মাগলার। পঁচিশ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ, যার মাধ্যমে তিনি চল্লিশ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারতেন, এক জায়গায় আটকে গিয়েছিল। আমি প্রথম বারের মত জানতে পারলাম যে, স্মাগলিং শুধু আমলাদের সহায়তায় হয় না; বরং স্মাগলারদের প্রতি মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতাও থাকে। কখনও কখনও হিস্‌সা নিয়ে তাদের আপসে বিবাদ হয়, তখন স্মাগলারদের প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় থাকে। যেহেতু তারা অপরাধী, এজন্য গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাদের। এই স্মাগলারেরও এই সমস্যাই হয়েছিল। বিবাদ ছিল এই যে, তার বিশ লাখ মূল্যের সম্পদ আমাদের সীমান্তের বাইরে হিন্দুস্তানে আটক করা হয়েছিল; কিন্তু পাকিস্তানের অনেক বড় এক অফিসার, যিনি তার অংশদার ছিলেন, বলছিলেন যে, এই লোক মাল হিন্দুস্তানে আটক হয়েছে বলে তাকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

স্মাগলার আমাকে জানালেন, এই অফিসার পুলিশের অনেক বড় কর্মকর্তা। তিনি স্মাগলারকে হুমকি দিয়েছেন যে, মালের হিস্‌সা দিতে হবে এবং এই মালের অংশ আগেই দিতে হবে। অন্যথায় মাল সীমান্ত পেরিয়ে এদিকে আসবে না। মাল আশঙ্কাজনক স্থানে আটকে ছিল। এই স্মাগলার আমাকে ঘুসহিসেবে সেই অফিসারের কাছে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, নারীতে এই অফিসার খুব কাবু; কিন্তু কোন নারী তাকে বশে আনতে পারে না। 'আমি তোমাকে পেছনের চার দিন থেকে পর্যবেক্ষণ করছি।' স্মাগলার আমাকে বললেন। 'তোমার মধ্যে সেই জাদু লক্ষ করেছি, যা এই শয়তানকে বোতলে ভরতে পারে।'

আমি তাকে কীভাবে বশে আনতে পারব, তা আমাকে স্মাগলার বুঝিয়ে দিলেন। আমি চিন্তা করলাম, অভিজ্ঞতাটি অর্জন করা দরকার। আমি তাকে বললাম, 'আমি যাব।' রাত দুইটা পর্যন্ত আমরা এই

অভিযান নিয়ে মতবিনিময় করতে থাকলাম। প্রতি মুহূর্তে আমার আশঙ্কা ছিল যে, হয়তো এই স্মাগ্লার বললেন, আসো, আমার সাথে শুয়ে পড়ো; কিন্তু তিনি বললেন, 'তুমি যাও। নিজের কামরায় গিয়ে আরাম করো।' আমি নিজের কামরায় চলে গেলাম।

পরের দিন হোটেলের ম্যানেজার আমাকে মিনতির সুরে বললেন, 'তুমি একেবারে চলে যাচ্ছ? আমি কোন বিষয় নিয়ে খোটা দিব না। তবে এতটুকু অবশ্যই বলব যে, আমি এখানে তোমার বদনাম হতে দেইনি। যে-ই তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছে, বলেছি, স্বাধীন মেয়ে। কারও সন্দেহ হতে দেইনি যে, তুমি কলগার্ল ((পেশাদার পতিতা)।'

তিনি যা বলছিলেন, তার অনুভূতি আমার ছিল এবং আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমি তার কাছে ওয়াদা করলাম যে, আমি ফিরে আসব। আমি যে যাচ্ছিলাম, তার ব্যাপারে তার কী রায়, সে কথাও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'যদি তুমি লাইন অনুযায়ী চলো, তা হলে খারাপ নয়। হোটেলের জীবনের চেয়ে উত্তম। অনেক উঁচু স্তরের লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয়। সমস্যা হচ্ছে স্মাগ্লিং ভয়ঙ্কর পেশা। অনেক স্কান্ডাল তৈরী হয়। খুনের ক্ষেত্রও এসে পড়ে। জীবন রহস্যঘেরা; তবে শাহী। ওখানে কেউ তোমাকে পতিতা বলবে না।' এরপর তিনি আমাকে কিছু দিকনির্দেশনা দিলেন।

রাতের অন্ধকার গভীর হল। আমি সেই মডেলের গাড়িতে চড়ে মারী থেকে বের হলাম, যেই মডেলের গাড়ি মন্ত্রীদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে। স্মাগ্লার বসে ছিলেন আমার সাথে পেছনের সীটে। তার দুই সাথী ছিল সামনের সীটে। তাদের মধ্য থেকে একজন গাড়ি চালাচ্ছিল। স্মাগ্লার আমাকে বললেন, 'ঘুম পেলে আমাকে বলবে।' আপনার মস্তিষ্কে এসব স্মাগ্লার সম্পর্কে নিশ্চয় এমন ধারণা থাকার কথা যে, তারা শরাবে বুদ হয়ে থাকবে; অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকবে; হল্টারবাজি করবে; গাড়ির মধ্যে আমার সাথে অশ্লীল কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু আপনার এসব ধারণা সঠিক নয়। আমার নিজের মাথায়ও স্মাগ্লার সম্পর্কে ধারণা এমনই ছিল। এরা তিনজন শরাব পান করলেন না। অবশ্য এরা মদপানে অভ্যস্থ ছিলেন। রাতে স্মাগ্লার আমাকে

সবচেয়ে মূল্যবান শরাব পান করিয়েছিলেন। কিন্তু রাতের সফরে তিনি সচেতন থাকতে চাইছিলেন। তিনি এমন শরীফ গপশপ করছিলেন, যেন তিনি ভালো ঘরানার সুশিক্ষিত ভদ্র সন্তান। আমার কাছে বসে যখন স্মাগ্লার বললেন, 'ঘুম পেলে বলবে।' তখন আমি বললাম, 'আমার তো এখনই ঘুম পাচ্ছে।' একথা শুনে তিনি সীটের শেষ কোণে সরে গেলেন। আমার মাথা ধরে নিজের রানের উপর রাখলেন এবং বললেন, 'পা উপরে তোলো।'

আমি তা-ই করলাম। কার যথেষ্ট চওড়া ছিল। এখন আমার ধারণা ছিল তিনি আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিবেন। আমার দেহে হাত চালাবেন। নত হয়ে অবশ্যই আমার মুখে ঠোঁট লাগাবেন। কিন্তু এমন কিছুই করলেন না। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তার কোন বন্ধু তার কোলে মাথা রেখেছে। তিনি এসব আচরণের কোনকিছু করলে আমার আপত্তি করার কী ছিল। আমি শরীফ মেয়ে ছিলাম না; তিনিও শরীফ যুবক ছিলেন না। কিন্তু আমাকে তিনি অন্যকোন উদ্দেশ্যে সঙ্গো নিয়ে যাচ্ছিলেন; আয়েশ করার জন্য নয়। আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল।

যখন আমার চোখ খুলল, তখন আমি তার রহস্যাবৃত দুনিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন ভোর চারটা বাজছিল। গাড়ি থেকে বের করে তিনি আমাকে কোন এক কুঠির বড় খুবসুরত কামরায় নিয়ে গেলেন। কামরায় ডাবল বেড লাগানো ছিল। এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'ঘুমাও; যখন ইচ্ছা হবে তখন উঠবে।' আমার ধারণা ছিল, দুটি বেড লাগানো আছে। তিনিও আমার সাথে শোবেন। কিন্তু বাতি নিভিয়ে তিনি চলে গেলেন। ঘুমের চাপ আমাকে বেহাল করে রেখেছিল। আমার মাথায় কোন শঙ্কা আর ভয় ছিল না। নারীর জীবনে শুধু ভয় থাকে, কেউ যদি তার সতীত্বে হস্তক্ষেপ করে। আমি ছিলাম সেই নারী, যে তার সতীত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। আমি নিজের হাতে নিজের সতীত্ব কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করেছি। আমি পালঙ্কে শুইলাম এবং গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেলাম।

পরের দিন সাড়ে এগারোটার সময় আমার ঘুম ভাঙল। গা গোসল দিয়ে এবং নাস্তা করে ফারেগ হওয়ার পর তিনি কামরায় এলেন।

আমার নাস্তা কামরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কামরায় এসে আমাকে খুব নিবিড়ভাবে দেখে বললেন, 'আমার দুটি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার চুল অসাধারণ সুন্দর। এগুলো কাটবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, চুলের মধ্যে তেল দিবে না। খুবই চমৎকার চুল।' এরপর তিনি কাজের কথা বলতে লাগলেন। শেষে তিনি বললেন, 'কেউ যদি তোমার বুকের উপর পিস্তল রাখে, তবুও বলবে না, তুমি কে এবং কোথায় থাক। তবে কেউ তোমার বুকের উপর পিস্তল রাখবে না। তুমি চোখ দিয়েও মিটমিটিয়ে হাসতে পার। তোমার চোখের হাসিতে পিস্তলের নল নত হয়ে যাবে।'

হলও এমনই। আমি পরের দিনই পাথরকে মোম করে ফেললাম। কীভাবে করলাম, কোথায় করলাম? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। শুধু এতটুকু বলব যে, আমার মিটিমিটি চোখ, আমার যৌবন আর আমার সৌন্দর্য আইনের পিস্তল নত করে দিল। দুটি শত্রু দেশের সীমান্ত আপসে মিলে গেল। টেলিফোনে শুধু একটি বাক্য বলে দিলাম। এই একটি বাক্য বলার জন্য আমাকে সেখানে সারা রাত থাকতে হয়েছিল। বিশ লাখের মাল সীমান্তের ভিতরে এল এবং গায়েব করে দেওয়া হল। এ ছিল শরাব ও নারীর কারিশমা। এই গ্রুপের মেয়েরা একজনের উপর দিয়ে আরেক জন সুন্দর। কিন্তু তাদের চালচলন ছিল পেশাগত, বিষয়টি আমার কাছে ধরা পড়েছিল। তারা ঘুসহিসেবে অফিসারদের কাছে চলে গেলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তারা কলগার্ল। আমার চাল ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। আমি যখন তার সাথে মিলিত হলাম, তখন তাকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি অমুকের সুপারিশ নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, 'এর আগে চারটি মেয়ে তার সুপারিশ নিয়ে এসেছে। ওই বেঈমান মনে করে যে, আমাকে পতিতাদের জালে আটকে ফেলবে। এখন তুমি এসেছ।'

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি আমাকেও পতিতা মনে করছেন? আমি যদি আপনাকে বলি, আমি কে, তা হলে আপনি আমার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।'

তিনি ভয় পেয়ে গেলেন; কিন্তু তিনিও ছিলেন পোড়খাওয়া লোক। বললেন, 'আপনারও জানা থাকা দরকার যে, আমি কে? আপনার এ-ও জানা থাকা দরকার যে, আপনি এমন অপরাধীর সুপারিশ নিয়ে এসেছেন, যে দেশের শিকড় কেটে দিচ্ছে।'

আমি তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করলাম। আগে তিনি তুমি বলেছিলেন। এখন আপনি বলতে লাগলেন। আমি বললাম, 'যদি আপনি জানেন যে, তিনি দেশের শিকড় কেটে দিচ্ছেন, তা হলে আপনি তাকে ধরেন না কেন? আপনি তার সাথে মিলে দেশের শিকড় কাটছেন। কে না জানে? আমার ডেডিও জানেন। কিন্তু এত বড় হয়েও আপনি অপরাধী। তিনি একা অপরাধী নন, যার বিশ লাখ টাকা সীমান্তে এসে ডুবতে বসেছে। ব্যাপার কিছুই না। আপনি তিলকে তাল করেছেন।'

'আপনার ডেডি কে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'তা বলব না।'

আমাদের আলোচনা এমনই হালকা তিক্ততার মধ্য দিয়ে শুরু হল। এরপর আমি অনেক কথা বললাম। বেশিরভাগ বললাম ইংরেজীতে। এতে তিনি প্রভাবিত হয়ে গেলেন। কিন্তু কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই অভিনয় যথেষ্ট ছিল না। তিনি ছিলেন নারীর পাগল। তার একীন হয়ে গিয়েছিল যে, আমি পেশাদার মেয়ে নই; কিন্তু তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি পরিচ্ছন্ন নারী নই। কেননা, একজন স্মাগ্লারের পক্ষে সুপারিশের জন্য এসেছি। এজন্য তিনি রশি ফেলতে লাগলেন এবং আমি আঁচল বাঁচানোর অভিনয় করতে লাগলাম। আমি তার জন্য ধূম্রজাল হয়ে গেলাম। কথায় কথায় হুইস্কি এল। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন এল, 'তাকে আসতে দাও।' এই টেলিফোন যে শর্তের উপর হল, সেটা আমি পূরণ করলাম; কিন্তু সাথে হুমকি দিলাম, তার (অর্থাৎ স্মাগ্লার সম্রাটের) কাছে উল্লেখ করা যাবে না। অন্যথায় তিনি আপনাকে গুলি করিয়ে দিবেন।

এই বড় অফিসারের রগরেশা লোহার মত শক্ত হওয়া এবং ঈমান লোহার মত সুদৃঢ় হওয়ার মধ্যে ছিল দেশের স্বার্থ। কিন্তু তিনি একটি মেয়ের সামনে বালির স্তুপে পরিণত হলেন।

এই সাফল্য আমার সাহস এত বাড়িয়ে দিল যে, আমি এই স্মাগ্লারের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি নিজের গ্রুপে আমাকে বড় উঁচু ও 'সম্মানে'র অবস্থান দিলেন। আমার খাবার ও পোশাকের প্রতি রাজকীয় গুরুত্ব ছিল। এখন আমি প্রত্যেক রাতে বিভিন্ন জাতের খদ্দেরের হাতে বিক্রি হওয়া পতিতা ছিলাম না। উঁচু পর্যায়ের লোকজনের সাথে মেশার সুযোগ পাওয়া যেত। সরকারী ও বেসরকারী নিমন্ত্রণপত্র আসত। আমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির মিসেজ ছিলাম। অর্থাৎ নাম কা ওয়াস্তে আমার একজন স্বামীও ছিল। কিন্তু সেখানে আমি একা ছিলাম না। আমার মত কয়েকটি মেয়ে ছিল এবং ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের নারী বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল। আমরা সবাই পেশাজীবি ছিলাম; মিসেজ অমুক, মিসেজ অমুক বলা হত। এই ধারা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মেয়েরা শরাবপান, অপকর্ম আর রাতজাগরণের কারণে সময়ের আগেই বুড়ো হয়ে বিস্মৃতির চোরাবালিতে হারিয়ে যায় এবং তাদের জায়গায় নতুন মেয়েরা আসে। বেশ কিছু দিন হয়ে গেছে, আমি ওই গ্রুপ থেকে বের হয়ে এসেছি; কিন্তু সেখানে শূন্যতা ও অভাব পড়েনি। আমার চেয়েও খুবসুরত কোন মেয়ে আমার জায়গায় এসে থাকবে। অপরাধী প্রজননের জন্য পাকিস্তান বড় উর্বর।

এই মেয়েরা আসে কোত্থেকে?

আমি কোন স্মাগ্লারকে শনাক্ত করতে চাই না। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনেক দিন চলে গেছে। হতে পারে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি কোন প্রদেশের সংসদসদস্য হয়ে গেছেন। স্মাগ্লিং কীভাবে হয় এবং সেখানে মেয়েদেরকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সেই বিবরণ আমি আপনাকে শোনাতে চাই না। নিজের একটি কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে দিয়েছি। সেটার আলোকে এই অপরাধের প্রকৃত রূপরেখা আপনার সামনে স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনাকে তো বলেই দিয়েছি যে, স্মাগ্লিং অপরাধী ব্যক্তি বা গ্রুপ মিলে করে না; করতে পারে না। তাদের সাথে সরকারী মেশিনারীর বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কাজ করতে থাকে। অনেক বার মালসহ স্মাগ্লার ধরা পড়েছে; তাকে কয়েদখানায় বন্দীও করা হয়েছে। কিন্তু পরে বড় কোন মন্ত্রী বা অফিসারের ফোন এসেছে, ওকে ছেড়ে দাও। সুতরাং তাকে শুধু ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং অনেক সম্মানের সাথে তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং যেখানকার কথা তিনি বলেছেন, সেখানে তার মাল পৌঁছে দিতে হয়েছে। পুলিশের থানা-কর্মকর্তা কোন স্মাগ্লারের প্রতি হাত উঠানোর সাহস করে না। ওই বেচারাদের চাকুরি বাঁচানোর ফিকিরই থাকে সবসময়।

স্মাগ্লার কোন জিনভূত নয়; একেবারে আপনার মতই মানুষ। তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ কেন্দ্রিভূত থাকে আমার মত নজরকাড়া মেয়েদের মধ্যে। এই দুটি বস্তুই পাথরের মত মানুষকে মোম করে দেয়। একটু চিন্তা করুন, ঘরে বসে একটি সুন্দরী মেয়ে আর বিশ হাজারের চেক পেলে আপনি কী করবেন? আপনার মাথা থেকে দীন

আর ঈমান আপনাকে না বলেই বের হয়ে যাবে। একটু নিজেকে এই পজিশনে নিয়ে আসুন। আমি আপনার স্ত্রীর জন্য আরবের খাঁটি সোনার একটি হার, আপনার জন্য রোলেক্সের তিন হাজার টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি উপহার নিয়ে এসেছি এবং আপনার সাথে হোটেলের কামরায় রাতযাপন করার দাওয়াত দিচ্ছি, তা হলে আপনি কী করবেন? আপনি মাথা নত করে আমার উপহার কবুল করবেন। মন্ত্রী, তাদের দপ্তরের সচিব আর অফিসাররা তো পাথর নন। স্মাগ্লার তাদের দুর্বলতা ও মানসিকতা খুব ভালো করে বোঝেন। এ-ই হচ্ছে স্মাগ্লারদের শক্তি।

আমি আপনাকে বলতে চাই যে, স্মাগ্লারদের কাছে এসব মেয়ে কোত্থেকে আসে, যারা পাথরকে মোম করে এবং বিভিন্ন কিসিমের মানুষের সাথে বিভিন্ন হোটেলে রাতযাপন করে। এই প্রশ্নটির উত্তর আমি আপনাকে বিস্তারিতভাবে দিতে চাই। কেননা, আমার নিজের কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আমি মা-বাবা ও সমাজকে বলে দিব যে, আসল অপরাধী তারা নয়, যারা অপরাধ করে। অপরাধী তারা, যারা অপরাধী সৃষ্টি করে। এই অপরাধ মা-বাবা ও সমাজের। আইন লঙ্ঘনের অন্তরীণ দুনিয়াতে এক তো আমার মত মেয়েরা যায়। আমি আপনাকে নিজের পুরো প্রেক্ষাপট বাতলে দিয়েছি। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিপালিত মেয়েরা উন্নত জাতের পতিতা হয়। তারা ব্লাক মেইলিঙের জন্য ব্যবহৃত হয়, অথবা স্মাগ্লারদের গ্রুপে চলে যায়, কিংবা শত্রুদেশে চরবৃত্তি করার জন্য তাদের এস্তেমাল করা হয়। শত্রুদেশ বলতে হিন্দুস্তান, আমেরিকা ও রাশিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার সিআইএ'তে পাকিস্তানী মেয়েরা কাজ করছে। রাশিয়াও পাকিস্তানী মেয়েদেরকে পাকিস্তানে ব্যবহার করছে। আর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে এসব মেয়েরা হিন্দুস্তানের পক্ষেও কাজ করে। পাকিস্তানের নির্বাচনে মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হয়। এরা সব আমার মত প্রেক্ষাপটের ফসল।

আমার গ্রুপে অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। এখন কোথায় আছে, বলতে পারব না। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছিল সে, যেখানে

পর্দার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েটি মেট্রিক পাশ ছিল। মা-বাবা পঁচিশ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করে ষাট বছরের এক বুড়োর সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। পর্দানশীন মেয়ে কিছুই করতে পারেনি। বুড়ো মা-বাবার ঘর থেকে মেয়েটি বুড়ো স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। বুড়োর কাছে টাকা ছিল; গাড়ি ছিল; কুঠি ছিল এবং স্বভাবে অপকর্ম ছিল; কিন্তু শরীরে কিছুই ছিল না। তার এক বউ মারা গিয়েছিল। আরেক জনকে তালাক দিয়েছিল সে। এখন শেষ বয়সে আঠারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তার মেয়ে ছিল দু'জন। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির উপর দিয়ে যে তুফান অতিবাহিত হয়, তা সে-ই ভালো বয়ান করতে পারত। সারা দিনে সে শাহযাদী হয়ে থাকত; কিন্তু তার ছিল জাহান্নামের টুকরো। বুড়ো শরাব পান করে সারা রাত জোয়ান মেয়েটিকে উত্তেজিত করত; কিন্তু মেয়েটি তারপরও কুমারী থেকে যায়। তারপরও মেয়েটি পর্দা ও শরমের আঁচল ছাড়েনি; কিন্তু সে নওজোয়ান ছিল। রক্তের মধ্যে যৌবনের তাপ ছিল। সে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

একসময় তার স্বামীর এক জামাই ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করল। সে ছিল জোয়ান লোক। সে মেয়েটিকে হাত করে ফেলল। মেয়েটি হায়া-লজ্জাকে বিদায় জানিয়ে দিল এবং যে পিপাসা তার স্বামী সৃষ্টি করে দিত, সেটা সে তার জামাইয়ের মাধ্যমে মেটাতে লাগল। রাস্তা যখন বের হল, মেয়েটিও তখন বের হয়ে গেল। পর্দা সে ফেলে দিল। কারে বসে বাইরে যেতে আরম্ভ করল। বুড়োর জামাই কয়েক বার তাকে বাইরের দুনিয়া দেখিয়ে দিলে তার পাখা খুলে যায়। আরও ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সে। এরপর এই ধারা চলতে থাকে। এই ধারায় সে একজন প্রেমিক পেয়ে যায়, যে তাকে বিয়ে করার ওয়াদা করে। দুইজন পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। মেয়েটি পালিয়ে তার সাথে করাচি চলে যায়। স্বামীর বেশকিছু পয়সা সঙ্গে নিয়েছিল সে। কয়েক দিন তারা করাচিতে খুব ফূর্তি করে। প্রেমিক তাকে শরাব পান করানো শুরু করেছিল। একদিন ঘুম থেকে উঠে মেয়েটি জানতে পারল, বিয়ের ওয়াদাকারী চলে গেছে।

তার কামরায় সুন্দর পোশাকের আরেক সুদর্শন ব্যক্তি এসে হাযির হল। তার কথায় এমন জাদু ছিল যে, মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সে তাকে ভয়ও পেল না। লোকটি তাকে জানাল যে, তার বন্ধু তাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে। এখন মেয়েটি যদি স্বামীর কাছে ফিরে যায়, তা হলে সে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে। লোকটি মেয়েটিকে জানাল যে, পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেননা, সে স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে তার ঘর থেকে চুরি করে পালিয়েছে। মেয়েটি খুব ভয় পেল। কিন্তু লোকটি তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে হোটেলের বিল পরিশোধ করে দিল এবং তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেল। মেয়েটি ইতোমধ্যে এমন কয়েক জন পুরুষের সাথে বন্ধুত্বের পাট চুকিয়ে ফেলেছিল। তার কোন ভয় ছিল না। শেষে এই লোকটি মেয়েটির সাথে সেই আচরণই করেছিল, স্মাগ্লার আমার সাথে যা করেছিল। মেয়েটির দেহের প্রতি তার কোন আকর্ষণ প্রকাশ পায়নি। মেয়েটির হৃদয় কব্জ করার পর লোকটি তাকে জানায় যে, সে তাকে আটাশ হাজার টাকায় খরিদ করেছে। এই লোকটি ছিল স্মাগ্লার। সে তাকে ট্রেনিং দিয়ে নিজের কাজে পাঠিয়ে দেয়। আমি যখন সেই মেয়েটিকে দেখলাম, তখন সে এত পাকা হয়েছিল যে, পাথর খুড়ে দুধ বের করতে পারত। এ ছিল গরীব মা-বাবার শরীফ ও পর্দানশীন মেয়ে।

আরেকটি মেয়ে মা-বাবার খুব আদরের ছিল। তার বয়স যখন এগারো বছর হয়, তখন তার মা মারা যায়। তার ছোট একটি ভাই ছিল। তার বাবা ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার এক বছর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন অন্যত্র থেকে তালাকপ্রাপ্তা। তিনি ঘরে এসেই এগারো বছরের মেয়েটিকে চাকরানীর মর্যাদা দিয়ে দেন। মহিলা খুবসুরত ও চালাক ছিলেন। স্বামীর উপর তিনি জাদু চালিয়ে দেন এবং বাচ্চাদের বিরুদ্ধে তার কান ভারী করতে থাকেন। যেই বাপের দিলের মধ্যে বাচ্চাদের ভালোবাসা ছিল, সেই বাপ বাচ্চাদেরকে মারপিট করতে লাগলেন। দেড় দুই বছর পর সৎ মায়ের ঘরে সন্তান হয়। তখন সৎ ছেলেমেয়ের গুরুত্ব একেবারে খতম হয়ে যায়। সৎ মেয়ে আগেই চাকরানী হয়েছিল। নতুন বাচ্চা হওয়ার পর তার রাতও দাসত্বের মধ্যে কাটতে শুরু করে। এরপর মা বাচ্চাকে

বোতলের দুধ পান করানো শুরু করেন এবং বাচ্চাটি সেই মেয়ের কাছে হস্তান্তর করেন। রাতে বাচ্চাটি কাঁদলে মেয়েটি জাগ্রত হয়ে তাকে দুধ পান করাত। সে-ও তো শিশু ছিল। কখনও বাচ্চা কাঁদলে তার চোখ খুলত না, তখন বাপ অথবা সৎ মা উঠে তাকে দু'চারটি থাপ্পড় দিয়ে টেনে উঠাত।

একই হাশর হত ছোট ভাইটিরও। তারা দু'জন ঘরে আদর ও অনাবিল শান্তি দেখেছিল। ঘৃণা আর অভিশাপ কাকে বলে, তারা জানতই না। কিন্তু এখন ঘরে তাদের জন্য ঘৃণা আর অভিশাপই ছিল এবং আদর ভালোবাসা উঠে গিয়েছিল। যে বাপকে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ মনে করত, তিনি দুশমন হয়ে গেলেন। সৎ মা আলাদা মারপিট করতেন। সন্ধ্যার পর বাপ ঘরে এলে তাকে দিয়ে আবার মারপিট করাতেন। দুই ভাইবোন আদর ও ভালোবাসা খুঁজছিল; কিন্তু বাবার আদরের ধারা সৎ মায়ের সন্তানের প্রতি ঘুরে গিয়েছিল। পাঁচ বছরে সৎ মায়ের দুটি বাচ্চা হয়। তখন এই মেয়ের বয়স আঠারো-উনিশ বছর হয়েছিল এবং তার ভাইয়ের বয়স হয়েছিল পনেরো বছর। ভাই তো পুরুষ ছিল। সে বাইরে চলে যেত এবং সান্ত্বনা লাভ করত। সমস্যা ছিল মেয়েটির। চব্বিশ ঘণ্টা সে ঘরের কয়েদী ছিল। ঘরের উঠোন ও দেয়ালের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

বারো-তেরো বছর বয়সের সময় ছেলেটি আওয়ারা হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সে। পনেরো বছর বয়স হলে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর আর কখনও দেখা যায়নি। তেরো বছর বয়সেই মেয়েটি ভালোবাসার মাধ্যম খুঁজে বের করেছিল। সে ছিল প্রতিবেশী একটি ছেলে, যার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। দুপুরে যখন সৎ মা কামরার ভিতর ঘুমিয়ে যেত, তখন মেয়েটি ছাদে চলে যেত। ছেলেটা পাশের বাড়িতে থাকত। সে নিজেদের ছাদে উঠত। ছাদে একটি আবদ্ধ বর্যাতি ছিল। সেখানে তারা ভালোবাসার খেলা খেলত এবং স্বামী-স্ত্রী হয়ে যেত। মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্য অসম্ভব তৃপ্তি লাভ করত। ওই ছেলেটির সাথে জৈবিক খেলা খেলে সে মায়ের জাহান্নামের

কথা ভুলে যেত। এরপর সে বড় হয়ে যায়; ছেলেটিও জোয়ান হয়ে যায়। এখন তারা ছাদের বর্ষাতিতে গিয়ে মিলতে পারত না; সুতরাং তারা নিজ নিজ কুঠি থেকে একে অপরকে দেখত।

বাবা মেয়ের বিয়ের কথা তুললেন। তখন সৎ মা বিরোধিতা করলেন। দলিল হিসেবে তিনি বললেন, মেয়ে এখনও ছোট। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়েকে তিনি ছোট বলতেন। তার কারণ, সংসারের যাবতীয় কামকাজ মেয়েটি সামলাত। সৎ মা মেয়েকে আদর করে একমত বানানোর পরিবর্তে তিনি কঠোরতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। মেয়েটি এখন জোয়ান হয়ে গিয়েছিল। সে সৎ মায়ের ইটের জওয়াবে পাটকেল ছুড়তে আরম্ভ করল। সৎ মা মেয়ের বাবার কাছে অভিযোগ দিলেন। বাপ প্রথম বারের মত মেয়েকে গালাগালি করলেন। মেয়ে বাপকেও খাড়া জওয়াব শুনিয়ে দিল। সে একথাও বলল, তুমি তো বউপাগলা। বাপ তাকে মারার জন্য দৌড় দিলেন, তখন মেয়ে জ্বলন্ত লাকড়ি হাতে নিল। বাপ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, তার মেয়ে এমন আচরণ করতে পারে। তার অনুভূতিই ছিল না যে, মেয়েকে আদর-ভালোবাসা থেকে মাহরুম করে এবং তাকে সৎ মায়ের হাতে পিটিয়ে পিটিয়ে তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন ভরে দিয়েছেন। যার ফলে মেয়ে আর সামলাতে পারেনি। সৎ মা-ও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। মেয়ে সাহসী হয়ে গেল; কিন্তু সে এ-ও জানত যে, এখন আর এই সংসারে থাকা সম্ভব নয়। একদিন সে সেই যুবককে ছাদের উপর ডেকে নিল, যার সাথে সে তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে স্বামী-স্ত্রীর খেলা খেলত। এখন সে জোয়ান হয়ে গিয়েছিল। তার সাথে নতুন করে ইশক-মহব্বতের খেল শুরু করে দিল।

মেয়েটি সংসারের কামকাজ ছেড়ে দিল। সৎ মায়ের সাথে ছোট ছোট ব্যাপারে ঝগড়াবিবাদ হতে লাগল। মেয়েটি বাইরে যাওয়া শুরু করল। প্রতিবেশী যুবক তার অপেক্ষায় বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকত। সে মেয়েটিকে সিনেমা দেখাল। ঘোরাল, ফেরাল এবং খুব খারাপ করে দিল। সেখানে আরও শিকারী মজুদ ছিল। তারা দেখল, এত সুশ্রী মেয়ে এত স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। তারা জাল ছুড়ে দিল এবং মেয়েটি

ফেঁসে গেল। মেয়ের কোন দোষ ছিল না। আঠারো-উনিশ বছর সে পিঞ্জিরায় অতিবাহিত করেছিল, যেখানে তার জন্য ছিল ঘৃণা ও অভিশাপ। হারানো ভালোবাসা খুঁজে ফিরছিল সে। তার বিবেকের উপর আহত আবেগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। জৈবিক তৃপ্তিকে সে আদর মনে করেছিল। শেষে একদিন সে বন্ধু বদল করতে করতে এই অন্তরীণ দুনিয়ায় এসে পড়ে, যেখানে আপনি আমাকে দেখছেন।

আমার ধারণা, আপনি এসব কাহিনী শুনে বিরক্ত হয়ে গেছেন। এমন কাহিনী আপনি অসংখ্য বার পড়েছেন। ঔপন্যাসিকরা এমন হাজারও কাহিনী লিখেছেন। আপনিও লিখে থাকবেন; কিন্তু ঔপন্যাসিকরা যেহেতু ঘরে বসে লেখেন, এজন্য তারা জানতে পারেন না যে, এসব কাহিনীর তৎপরতা কোথায় গিয়ে হারিয়ে যায়। আমি আপনাকে এসব কাহিনীর পরিণতির পরের কথা শোনাচ্ছি।

আপনি তো জানেন যে, পাকিস্তানে সবার আগে করাচির পতিতালয় বন্ধ করা হয়েছিল। এটা ছিল পাকিস্তানের পতিতাবৃত্তির সবচেয়ে বড় বাজার। সব মাপের পতিতা এখানে পাওয়া যেত। অশিক্ষিত, মূর্খ এবং গ্রাজুয়েট পর্যন্ত। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু বাস্তবকে আমি মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারি না। ভদ্র পরিবারের কিছু মেয়ে এখানে পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে পার্ট টাইম পতিতাবৃত্তি করত। ঠিকাদারের সাথে তাদের চুক্তি থাকত যে, খদ্দের অভিজাত ও আমীর হতে হবে। এই পতিতালয় বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন পতিতারা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং একই কাজ অলি-গলি আর মহল্লায় শুরু হয়ে গেল। কিছু দিন পরে লাহোরের হিরামন্ডিতেও এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। সেখানেও বদকার মহিলারা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কিছু পতিতা খুব অভিজাত ছিল। তারা বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে বসবাস শুরু করল। তাদের ব্যাপারে কারও ধারণাও হয়নি যে, তারা পেশাদার নারী। তাদের মধ্যে জোয়ান মেয়েরাও ছিল এবং তাদের মধ্যে শিক্ষিতাও ছিল। তারা শরীফ ঘরানার মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব পেতে নিজেদের পথে পরিচালিত করল এবং পতিতাবৃত্তিতে আরও বড়সড় প্রবৃদ্ধি ঘটাল।

আমার গ্রুপের একটি মেয়ের কাহিনী চার দেয়ালের দুনিয়ার আরেক সমস্যা। এই মেয়েটি ছিল পেশায় সূত্রধর খান্দানের। তার মা-বাবা সমাজে মান বাড়ানোর জন্য মেয়েকে বিএ পর্যন্ত লেখাপড়া করান। বিয়ের সময় হলে মা-বাবা খান্দানের প্রস্তাব 'মেয়ে গ্রাজুয়েট, মামুলি ঘরে বিয়ে দিব না' বলে নাকচ করে দেন। খান্দানের বাইরে খাওয়া-পরায় ভালো পরিবারে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে জওয়াব এল যে, সূত্রধর গোষ্ঠীর মেয়ে আমরা গ্রহণ করব না। খান্দানের লোকজন এই পরিবারকে বয়কট করল। মেয়েটি গ্রাজুয়েট ছিল; কিন্তু তার জ্ঞানবুদ্ধি ছিল কম। এজন্য সাধারণ লোকজনের সাথে সে কথাবার্তাও বলত না। ফ্যাশন, কৃত্রিম রীতি-নীতি আর আচার-অনুষ্ঠানকে উঁচু মর্যাদার প্রতীক মনে করত। কলেজের বান্ধবীদের সাথে তার সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক বহাল ছিল। তাদের মধ্যে আমীর পরিবারের মেয়েরাও ছিল। তাদের মধ্যে আমার মত মেয়েরাও ছিল। ওই মেয়েদের বন্ধু ছিল এবং বন্ধুদের গাড়িও ছিল।

মেয়েটি প্রথম বার গাড়ির লিফ্‌ট পেলে তার দেমাগ আসমানে উঠে যায়। এক শাহযাদা তাকে উন্নত হোটেলে যাওয়ার দাওয়াত দেয়। এতে তার চোখ ও বিবেকের উপর পর্দা পড়ে যায়। মেয়ে মডার্ন হয়েছে বলে তার মা-বাবার গর্বের সীমা ছিল না। এখন তারা খান্দানের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তাও করছিলেন না এবং জোয়ান মেয়ে সন্ধ্যার সময় কোথায় যায়, তা নিয়েও ভাবছিলেন না। মেয়েটি সেই রাস্তাই ধরেছিল, যেই রাস্তা আমি অতিবাহিত করেছি। এই রাস্তা মেয়েটিকে অভিজাত পতিতা থেকে স্মাগ্লিং পর্যন্ত নিয়ে যায়।

ফিল্মের আকর্ষণ এবং ফিল্মি গানের নেশা ফিল্ম স্টুডিও'র পথ ধরে অনেক মেয়েকে পতিতালয় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এদের মধ্যে যারা চৌকস প্রমাণিত হয়, তারা স্মাগ্লারদের কাছে পৌঁছে যায়।

আরেক মেয়ের কথা আপনাকে বলে দিই। তার মাধ্যমে আপনি অনেক ঘরানা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন। এই মেয়েটি আমাকে বলেছিল যে, যখন থেকে তার জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকে মা-বাবাকে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত দেখে আসছে। এ ছিল তাদের প্রথম

বাচ্চা। কখনও কখনও মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া হলে, তার রেশ মেয়ের উপর গিয়ে পড়ত। তাদের ঘরে কোন বস্তুর অভাব ছিল না। তাদের বিবাদের কারণ ছিল এই যে, মেয়ের বাবা অন্যকোথাও বিয়ে করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মা-বাবা তাকে নিজেদের মর্জি মোতাবেক বিয়ে করিয়ে দেন। তিনি মেয়ের মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। স্ত্রী তাকে প্রত্যেক কথার জওয়াব দিতেন। এতে মেয়েটি মা-বাবার ভালোবাসা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হতে থাকে। বড় হওয়ার পর বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকার চেষ্টা করত। বাবা ভালো বেতন পেতেন। তিনি মেয়েকে কলেজে ভর্তি করে দেন। মেয়েটির ছোট আরও তিনটি সন্তান হয় তাদের। আজব ব্যাপার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী একজন আরেক জনের দুশমন হওয়ার পরও তাদের সন্তান হতে থাকে।

কলেজে মেয়েটি একজন বান্ধবী পেয়ে যায়। সে মাঝে মাঝে এই বান্ধবীর বাসায় চলে যেত। সেখানে সে দেখতে পায় যে, বান্ধবীর বাবা হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মানুষ এবং তাদের ঘরে প্রশান্তি ও সৌন্দর্য ভরপুর। পুরো পরিবার একসাথে বসে আহার করত। এই মেয়েটি বান্ধবীর বাসায় গেলে স্বস্তিও লাভ করত, কষ্টও পেত। কেননা, তার নিজের ঘরে এমন স্বস্তি ছিল। নিজের বাপের পরিবর্তে বান্ধবীর বাবাকে পছন্দ করতে থাকে সে। মেয়েটি বলত, এই লোক প্রত্যেকটি কথা বিশেষ ভঙ্গিতে বলতেন। মেয়েটি থার্ড ইয়ারে ওঠার পর বান্ধবীর ঘরের আকর্ষণ তার অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে পড়ে। একদিন বান্ধবী কলেজে আসেনি। এজন্য ছুটির পর মেয়েটি বান্ধবীর বাসায় চলে গেল। বান্ধবীর বাবা বাসায় একা ছিলেন। তিনি জানালেন যে, তার পুরো পরিবার তিন-চার দিনের জন্য মুলতান চলে গেছে।

বান্ধবীর বাবার কাছে বসল মেয়েটি। সে এই পিতাকে নিজের ঘরের অবস্থা বর্ণনা করল এবং কাঁদতে লাগল। মেয়ে খুবসুরত ছিল এবং তার বুকে আদরের পিপাসা ছিল। বান্ধবীর বাবা প্রথমে তার মাথায় হাত বোলালেন। তারপর কাছে টেনে নিলেন। এরপর নিজের কোলে বসালেন। মেয়েটি এই লোকের প্রতি দুর্বল ছিল। সে নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করে দিল। সে তখনও খারাপ মনে করল না, যখন

বান্ধবীর বাবা তার গালে চুমু দিলেন এবং তার ঠোঁটের সাথে নিজের ঠোঁট লাগালেন। মেয়েটি আমাকে বলেছিল যে, শৈশবে তার বাবা কখনও তাকে চুম্বন করেননি। বান্ধবীর বাবা তাকে চুমু দেওয়ার পর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায়। তার প্রতি ঘৃণা হতে থাকে মেয়েটির এবং বান্ধবীর বাবাকে আরও ভালো লাগতে থাকে।

বান্ধবীর বাবা ছিলেন খোশ মেজাজের লোক। এটাই ছিল তার বড় আকর্ষণ। তিনি মেয়েটিকে আদর করতে করতে এবং তার সাথে হাসি খেলা করতে করতে বিছানায় চলে যান। এরপর মেয়েটিও ভুলে যায় যে, এই লোকটি তার বাবার সমবয়সী এবং তিনিও ভুলে যান যে, এই মেয়েটি তার মেয়ের সমবয়সী ও সহপাঠী। মেয়েটি এমন তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে যে, তার মধ্যে নেশা সৃষ্টি হয়ে যায়। ঘরের তিক্ততা আর নারকীয় পরিবেশ থেকে পলায়নপর মেয়েটির মাথায় একটু চিন্তাও এল না যে, এটা গুনাহের কাজ। তার বান্ধবী পরিবারের সাথে তিনদিন মুলতান থাকল। মেয়েটি কলেজ ছুটির পর বান্ধবীর বাবার কাছে আসতে লাগল এবং একই খেলা খেলত লাগল। এরপর তার বান্ধবী এসে পড়ল। তখন তার বাবার সাথে নির্জনে এই মেয়েটির মিলিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন সে মহল্লার এক ছেলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করল। এরপর শুরু হল বন্ধুর পর বন্ধু বানানোর ধারা। একদিন সে এক বন্ধুর সাথে ফিল্ম স্টুডিওতে চলে গেল। ফিল্মি দুনিয়ার প্রোডিওসার ও ডিরেক্টররা তাকে পতিতা বানিয়ে স্মাগ্লারদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিল। মেয়েটি থার্ড ইয়ার পাশ করেছিল। সৌন্দর্যের সাথে শিক্ষা মিলিত হয়ে তার মধ্যে এমনসব গুণাগুণ পয়দা করেছিল, যেগুলো স্মাগ্লারদের খুব প্রয়োজন হয়।

মেয়েটিকে রাজনৈতিক ব্লাকমেইলিঙের জন্য অনেক বার ব্যবহার করা হয়েছিল। আইয়ুব খানের শাসনকালে একবার তাকে এক মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। মন্ত্রীর কাছে সে দুই দিন, দুই রাত থাকে। ফিরে এসে সে জানাল, মন্ত্রী তাকে আমেরিকার সিআইএ'তে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। মন্ত্রী না কি তাকে একথাও বলেছিলেন যে, তাকে আমেরিকা সফর

করার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু মেয়েটি প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। আমি একীনের সাথে বলতে পারব না যে, সে এমন আকর্ষণীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকবে। ছয় মাস পর এই মেয়েটি আর কখনও আমার নজরে পড়েনি।

এগুলো আমার গ্রুপের কয়েকটি মেয়ের কথা। আমি নিজের কোন রায় দিচ্ছি না। আপনাকে এসব মেয়ের নেপথ্যের কথা বলে দিলাম। পাঠকরা নিজেরাই রায় কায়েম করতে পারবেন যে, অন্তরীণ দুনিয়ায় মেয়েদের প্রেরণকারী কে এবং এসব মেয়ে কোত্থেকে আসে? আমি শুধু এই রায় দিব যে, এসব মেয়ে মেধার বিচারে নরমাল নয়; তবে অ্যাবনরমাল পরিবারের ফসল। এদের মধ্যে ওই মেয়েরা খুবই হতভাগা, যাদেরকে খোদা দায়িত্বহীন ও অ্যাবনরমাল মা-বাবার ঘরে সৃষ্টি তাদেরকে সৌন্দর্যও দান করেন। এসব মেয়ে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সোসাইটি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে বেহায়া বানিয়ে দেয়। তাদের কোন বাপ থাকে না; কোন ভাই থাকে না। তাদের সৌন্দর্য আর যৌবন তাদেরকে ধ্বংসের গর্তের নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়।

অতীত আমার সামনে এসে পড়ল

আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমার কাহিনী শুনতে এসেছিলেন, অথচ আমি দর্শন পেশ করা শুরু করেছি। কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্য আগেও বলেছি। আরেক বার স্পষ্ট করছি। আমি নিজেকে শিক্ষা গ্রহনের জন্য পেশ করছি। পিতা-মাতা, সমাজের দায়িত্বশীল ও হুকুমতকে বলছি, আমি সেইসব জায়গা শনাক্ত করে দিয়েছি, যেখানে অপরাধী সৃষ্টি হয়। দুইএক জন স্মাগ্লার আর পতিতাকে গ্রেফতার করে আপনারা দেশকে কদর্যতা থেকে পবিত্র করতে পারবেন না। সেই উৎসগুলো বন্ধ করুন, যেখান থেকে এই কদর্যতা প্রবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি স্মাগ্লারদের ওই গ্রুপে দুই বছর ছিলাম এবং শাহযাদীর মত ছিলাম। নাম কা ওয়াস্তে আমার একজন স্বামী ছিল। কার ছিল; কুঠি ছিল। ওঠাবসা ছিল মন্ত্রীদের সমাজে। স্মাগ্লিং চলছিল জোরদার ও স্বাধীনভাবে। ব্লাকমেইলিং হত। আমাদের জন্য সীমান্ত বলতে কিছু ছিল না। ছিল না কোন আইন। আইনের রক্ষকরা থাকত আমাদের হাতের মুঠোয়। নারী, শরাব ও দৌলত শাসকদেরকে মজবুর ও অসহায় করে রেখেছিল। যেই মন্ত্রী স্মাগ্লারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই বক্তৃতায় বলতেন, স্মাগ্লিং সমূলে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। আপনারা খবরের কাগজে কখনও কখনও পড়ে থাকেন যে, এত আফিম ও গাঁজা ধরা পড়েছে এবং স্মাগ্লারদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এগুলো সব ছোটখাট স্মাগ্লার, যারা বড় স্মাগ্লারদের মত সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলোকে যথারীতি সন্তুষ্ট রাখার তদবির করে না। কখনও ধরা পড়লে ঘুস প্রদান করে। গ্রেফতার করা হলে ঘুস

বেশি, বরং অনেক বেশি দাবি করা হয়। এর পরিমাণ এতই বেশি যে, কোন কোন স্মাগ্লার তা পরিবোধ করতে পারে না। তখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। কখনও কখনও পুলিশ তাদের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য কোন অসহায় স্মাগ্লারকে গ্রেফতার করে এবং এই কৃতিত্বের খবর সমস্ত খবরের কাগজে ছাপানো হয়। উঁচু স্তরের স্মাগ্লারদেরকে গ্রেফতার করার সাহস কেউ করে না।

আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন ছিল গরম কাল। আমি আমার স্মাগ্লার সম্রাটের কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে একদেড় মাসের জন্য মারী চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না। নাম কা ওয়াস্তে আমার যে স্বামী ছিল, তিনিও আমার সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'তুমি দেখি আমার সাচ্চা স্বামী হয়ে বসেছ। এখানেই থাকো। আমার পিছু নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।' এরপর একা মারী চলে গেলাম। নিজেকে বোরকার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। আমি সেই হোটেলেই অবস্থান করলাম, যেখান থেকে আমি এই কারবারের সূচনা করেছিলাম। ম্যানেজার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। আমি তাকে বললাম, 'কিছু দিন আরাম করার জন্য এসেছি। এজন্য কারও সাথে আমার পরিচয় করাবেন না।' তিনি আমাকে কামরা প্রদানের প্রস্তাব করলেন, আমি তা গ্রহণ করলাম।

অনেক দিন পর আমি অবসর পেয়েছিলাম। আমি এমন নারী বনে গিয়েছিলাম, যার মধ্যে কোন আবেগ ছিল না। অনুভূতি মরে গিয়েছিল। কিন্তু মারী ছিল স্বপ্নের জগৎ। আমি প্রথম দিন হোটেলের কামরার খিড়কি যখন খুললাম, তখন আমার কাছে মনে হল যেন আমার অতীতের কোয়াড় খুলে গেছে। প্রথম বার যখন আমি মারী এসেছিলাম, তখন আমার কাছে জমীনের এই টুকরো জান্নাতের মত সুন্দর মনে হয়েছিল। মূর্ছাকারী জাদুর মত আমাকে সম্মোহিত করেছিল এবং আমি চাচ্ছিলাম যে, মারীর সবুজ বসুন্ধরা আর উড়ন্ত মেঘের পরতে পরতে নিজেকে হারিয়ে ফেলব। সে সময় আমার উপর ভালোবাসার জাদুও আচ্ছন্ন ছিল। আমার সাথে ছিল সেই ব্যক্তি, যাকে

আমি কামনা করছিলাম এবং আমি যাকে মনে মনে সারা জীবনের সাথী বানিয়েছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সেই জাদু চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। যাকে আমি মঞ্জিল ভেবেছিলাম, সেটা মরীচিকা প্রমাণিত হয়। এখন আমি খিড়কি খুললাম। আমার কাছে মারীর সৌন্দর্য বিষাক্ত মনে হল। পাইন ও দেবদারুর লম্বা লম্বা সারি ভূতের মত মনে হত লাগল। চার-পাঁচটি গাছ আমার জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলোর মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। সেগুলো থেকে এমন সাঁ সাঁ আওয়াজ আসছিল, যেন গাছ আর বাতাস আমার ভালোবাসার মৃত্যুর জন্য ফুপিয়ে কাঁদছিল। তিন-চার বছর আগে এই আওয়াজই ছিল, যার মধ্যে স্বর্গীয় ছন্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

আমার চোখ ঝাঁপসা হয়ে এল। ঝাঁপসা হয়ে এল অশ্রুর কারণে। আমি চোখের পানি মুছলাম না। জানালার সাথে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে মারীর আর্দ্রতা অনুভব করতে থাকলাম। আমার মস্তিষ্ক আমাকে দূর অতীতে নিয়ে গেল। সময়ের গতি পেছন দিকে চলতে লাগল এবং আমাকে পূর্ব পাঞ্জাবের সেই স্কুলে নিয়ে গেল, যেটা দেখে কেউ বলত না যে, এটা স্কুল। আমি সেই বয়সে ওই কাঁচা কুঠির মর্যাদা অনুভব করিনি। আমি শিশু ছিলাম। সেখানে উর্দু আর কুরআন পড়তাম। শৈশবের সেই স্মৃতির মধ্যে কে জানে কী জাদু ছিল যে, উন্নত এই হোটেলের এত ভালো কামরায়, যেখানে শুধু ধনী লোকেরাই থাকতে পারে, আমার দম বন্ধ হয়ে এল। আমি এখান থেকে পালিয়ে সেই কাঁচা কুঠিতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অস্থির হতে লাগলাম। এখন আমি তার মর্যাদা অনুভব করলাম, যখন আমি সবকিছু খুইয়ে বসেছি এবং এই মরীচিকার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে এত দূর এসে পড়েছি যে, সেখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না।

পাকিস্তানের বাড়ির কথা মনে পড়ল আমার। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের কথা মনে পড়ল। বাবার স্মৃতি আমাকে মুষড়ে দিল। আমার ধ্বংসের ক্ষেত্রে তাঁরও হাত ছিল। কিন্তু আমার ভাইয়েরা যখন উপযুক্ত হয়ে গেল, তখন ঘরে বাবার কোন মর্যাদা ছিল না। সেই মায়ের কথাও মনে পড়ে গেল, যাঁর উদর থেকে আমি পাক সাফ ও স্বর্গীয়

বারিবিধৌত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার মা-বাবার কিঞ্চিৎ ধারণাও ছিল না যে, এই পবিত্র শিশু বড় হয়ে পুরো সমাজকে নাপাক করবে এবং পাপপঙ্কিলতার বড় খুবসুরত প্রতীক হয়ে পরিবার থেকে পালিয়ে খান্দানকে অপমান ও লজ্জায় ফেলবে। তারপর আমার বাচ্চার কথা কথা মনে পড়ে গেল। তার কান্নাও মনে পড়ল। তখন আমার কেমন অবস্থা হয়েছিল, সে কথা বর্ণনা করতে পারব না। এর আগে বাচ্চার কথা আমার এই মারীতেই মনে পড়েছিল এবং আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, খ্রিস্টানদের সেই হাসপাতালে গিয়ে নিজের বাচ্চা অনুসন্ধান করে বের করব এবং দূরে কোথাও চলে যাব। এখন আবার একই খাহেশ অন্তরে জাগ্রত হল, যা আমাকে মুষড়ে দিল।

বাচ্চার কথা মনে পড়তেই আমার আবেগ ও অনুভূতি আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠল। আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, আমার কোন অনুভূতি মরেনি এবং আমার বুকের মধ্যে সেই নারী জীবিত আছে, যে মহব্বতের পিয়াসী। তীব্র পিপাসা এবং নিজের মধ্যে একটি ভয়ানক শূন্যতা অনুভূত হল। এই অনুভূতি মৃত্যুর তিক্ততার পর্যায়ে চলে গেল। আমি এতটা পেরেশান আর বেহাল হয়ে গেলাম যে, জানালা থেকে সরে এসে টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিলাম। হোটেলের এক্সচেঞ্জ থেকে হোটেলেরই নম্বর নিলাম এবং বললাম, চার পেগ স্কটিশ হুইস্কি আর সোডা আমার কামরায় পাঠিয়ে দাও। এসব তিক্ততার আর কী বা চিকিৎসা ছিল।

কিন্তু চার পেগ হুইস্কি গলার ভিতরে প্রবেশ করার পর মনে হল যেন আমি বুকের আগুনের মধ্যে তেল ঢেলে দিলাম। অতীত আরও স্পষ্ট হয়ে সামনে এল। আমার সামনে বাচ্চা জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। আমার স্তনের মধ্যে ব্যথা অনুভব হতে লাগল। আমি একদম জানি না যে, মায়ের স্তনে যখন দুধ আসে, তখন সে ব্যথা অনুভব করে কি না এবং বাচ্চাকে দুধ পান করিয়ে সে কেমন অনুভব করে, আর যেসব মায়ের বাচ্চা হয়ে সাথে সাথে মারা যায়, তাদের দুধ এলে দুধের ব্যথা বাদে তাদের মনের অবস্থা কী হয়। আমারও দুধ এসেছিল; কিন্তু মাত্র তিনচার দিন। ওষুধপত্র খেয়ে আমি দুধ শুকিয়ে

ফেলেছিলাম। কিন্তু এই কামরায় বসে যখন স্তনের মধ্যে ব্যথা অনুভূত হল, তখন বুঝতে পারলাম না যে, এটা কি দুধের জোশ, না কি আবেগের রক্তের জোশ। তা যা-ই হোক না কেন, তা আমার বাচ্চাকে সামনে এনে খাড়া করল। আমি বাচ্চা দেখিনি। শুধু তার কান্না শুনেছিলাম। আমি নার্সকে বলেছিলাম, এরে নিয়ে যাও। আমি এর মুখ দেখতে চাই না। নার্স বাচ্চা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

এমন তীব্রভাবে বাচ্চার কথা আগে কখনও মনে পড়েনি। আমার গাল ভেজা মনে হল। কিন্তু সেদিন আমার জযবা শুধু এজন্যই তড়প অনুভব করল যে, আমার বাচ্চা থাকবে এবং আমি তাকে দুধ পান করাব। এটা স্বভাবগত আবেগ। দৈহিক তৃপ্তি অথবা অশ্লীলতা স্বভাবগত সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। নারী সন্তান থাকার এই চাহিদা দমন করতে পারে না। আমি চাহিদার তীব্রতা অনুভব করলাম এবং তা দমন করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিক্ততা বাড়তে লাগল এবং এতটা বৃদ্ধি পেল যে, আমার ইচ্ছা হল নিজের পছন্দের কোন ব্যক্তিকে ডেকে আনি এবং তাকে বলি, আমার একটি বাচ্চা দরকার। কিন্তু আমার পেশার বাস্তবতা ছিল এমন, যা বাচ্চা কবুল করার জন্য প্রস্তুত নয়। আমাকে শাদী করার জন্য কোন লোকও পাওয়া যেত না। তারপরও প্রাকৃতিক এই শূন্যতা, যা পূরণ হওয়ার কোন রাস্তা নজরে পড়ছিল না, আমাকে পেরেশান করতে থাকল। আমি আরও তিন পেগ হুইসকি আনালাম। কিন্তু এগুলোও সেই শূন্যতার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গেল। শেষে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গেলাম এবং তার কাছ থেকে আমেরিকান গাঁজা (মারিজুয়ানা) নিয়ে নিজেকে অচেতন করে দিলাম।

পরের দিন যখন চোখ খুলল, তখন বেলা দশটা বাজছিল। অন্তরে কিছুটা ভয় ছিল। গোসলখানায় চলে গেলাম। শরীরের উপর অনেক পানি ঢাললাম। কিন্তু তবিয়ত সামলাতে পারলাম না। অসহায়ত্বের অনুভূতি বাড়তে লাগল। আমার একজন সাথী প্রয়োজন ছিল। এমন সাথী, যে পেশাদার নয় এবং যে আমার তৃষ্ণা ও আবেগ বুঝতে পারে। ভালোবাসা ছাড়া কে জীবিত থাকতে পারে। আমার এই ইচ্ছাও হল

যে, ফিরে যাব এবং নিজের পেশায় মগ্ন থাকব। সেখানে আমার জযবা এভাবে জ্বলে ওঠেনি। কখনও বাচ্চার কথা মনে পড়েনি। পাপের রাত আর পাপের দিন আমার প্রাকৃতিক শূন্যতা পূরণ করে রেখেছিল। শেষে একথা ভেবে থেমে গেলাম যে, কিছু দিন মারীতে থাকব। যদি জযবা সামলাতে না পারি, তা হলে চলে যাব।

যদি তাকে না পেতাম

দু'দিন পরের ঘটনা। তখন দিনের পরন্ত বেলা। বোরকা পরে মন্থর গতিতে আমি মাল রোডের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তেমন ভিড় ছিল না; কিছু লোকের জটলা ভিড়ের মত দেখা যাচ্ছিল। ছেলে-মেয়েরা পোশাক, চুল ও ফ্যাশন দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে এদেরকে খালি মানুষ মনে হচ্ছিল। উদ্দেশ্যহীন জন্ম নেওয়া লোক। আমি বোরকায় আবৃত ছিলাম। একটি নেকাব উপরে ছিল, আরেকটি দিয়ে আমি চিবুক ও নাক ঢেকে রেখে ছিলাম। কপাল ও চোখ ছিল খোলা। কপালের উপর কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চুল পড়ে ছিল। আয়না দিয়ে আমি নিজের চেহারা দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, বোরকায় আমার অর্ধ লুক্কায়িত চেহারা বেশি আকর্ষণীয়। মাল রোড দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে লোকজনের তৃষ্ণাকাতর দৃষ্টি এড়িয়ে পোস্ট অফিসের চক থেকে আগে বের হয়ে গেলাম। একটু আগে বাড়ার পর যে রাস্তাটি নীচে নেমে গেছে, সেটা দিয়ে নামতে লাগলাম। মনে হল আমার পেছনে পেছনে কেউ আসছে। ফিরে দেখলাম, আমার বয়সের এক নওজোয়ান আসছেন।

তিনি কাছ দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেলেন। আমাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি। আমি তাকে ভালো করে দেখলাম। তার ভরাট সুস্থ ও চেহারায় নিষ্পাপতার যে লক্ষণ দেখলাম, তা আমার কাছে একটু ভালো লাগল। তাঁর চোখে বড় আকর্ষণ ও পৌরুষের চমক ছিল। তার মাথার চুল ছিল ছোট ছোট। যদি তার চুল বড় থাকত, তা হলে আমি তার চেহারা দেখাও সহ্য করতাম না। তার স্মার্ট ও হালকা দেহ ছিল আকর্ষণীয়। তার চালচলনে দৃঢ়তা আর পৌরুষ ছিল। মারীতে একজনই

নওজোয়ান আমার নজরে পড়েছিল, যার চুল রুচিসম্মতভাবে কাটা ছিল। তিনি মাল রোডের রওনক ছেড়ে নীচের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, যেখানে কোন রওনক নেই। সেখানে কৃত্রিম কোন সৌন্দর্য নেই। সেখানে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আছে নির্জনতা; কিন্তু সেখানে গিয়ে সাথীর আগ্রহ তীব্র হয়।

তিনি আগে চলে গেলেন। আমি আস্তে আস্তে নামতে থাকলাম এবং সেখানে পৌঁছে গেলাম, যেখানে খানিকটা ময়দানের মত আছে। পাথরের বেঞ্চ আছে এবং লম্বা লম্বা গাছের সমাহার আছে। আমি সেখানে পায়চারী করতে লাগলাম। আমি জানতাম না যে, তিনি কোন্ দিকে চলে গেছেন। আচানক একদিক থেকে তাকে আসতে দেখা গেল। তিনি আমাকে দেখলেন, আমিও তাকে দেখলাম। আমার আবেগ উথলে উঠেছিল। নির্জনতা আমাকে খেয়ে ফেলছিল। বিশ্বাস করুন, তাকে দেখে আমার মাথায় খেয়াল এল, আমার বাচ্চাটি বড় হয়ে তার মত জোয়ান আর সুদর্শন হবে। আমার কাছে তাকে নিজের বাচ্চার মত মাসুম ও নিষ্পাপ মনে হল। তার চেহারায় বিশেষ এক গাম্ভীর্য ছিল, যা তার বয়সের জোয়ান লোকদের চেহারায় খুব কমই নজরে পড়ে। হতে পারে, আমার উপর একাকিত্বের যে প্রভাব ছিল, এটা ছিল তার প্রতিক্রিয়া। এজন্য নিজের মত এক লোককে একাকী ঘুরতে দেখে, তাকে ভালো লেগে গেছে।

সম্মুখ থেকে তিনি আমার দিকে আসছিলেন এবং আমাকে দেখছিলেন। কিছুটা এ রকম মনে পড়ে যে, তার ঠোঁট দুটিতে মিটিমিটি হাসি বিরাজ করছিল, অথবা আমি মুচকি মুচকি হাসছিলাম এবং আমার সেই হাসি বোরকার পাতলা নেকাব ভেদ করে তার নজরে পড়েছিল। কিছু একটা অবশ্যই হয়েছিল। আমি তো শরীফ মেয়ে ছিলাম না। আমার ভিতর হায়া আর শরম বলতে কিছু ছিল না। মুচকি হাসি দিয়ে পুরুষদেরকে নাচানো ছিল আমার পেশা। যা হোক, যদি আমি হেসে থাকি, তা হলে সেই হাসি পেশাগত ছিল না। তার মধ্যে ভালোবাসার পিপাসা ছিল; কিন্তু তার মধ্যে আনন্দ ছিল না। তিনি আমার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় খুব ক্ষীণ আওয়াজে

জিজ্ঞেস করলেন, দকারও অপেক্ষায় আছেন; না কি একাই ভ্রমণে বেরিয়েছেন?'

আমি থেমে গেলাম এবং জওয়াব দিলাম, 'একাই বের হয়েছি।'

'ক্ষমা করবেন।' একটু সন্ত্রস্ত কণ্ঠে তিনি বললেন। 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। জানি না, আপনাকে কেন জিজ্ঞেস করে বসেছি।'

'জিজ্ঞেস করায় কোন দোষ নেই।' আমি জওয়াব দিলাম। 'পুরুষদেরকে আমি সাধারণত ভুলই বুঝে থাকি।'

বাকশিল্পে তো আমার দক্ষতা ছিল। আমি তাকে নিবিড়ভাবে দেখলাম। তাঁর দাঁতগুলো মুক্তার মত পরিষ্কার আর চমকদার ছিল। তার চেহারার সুস্থতায় যে রওনক ছিল, তা থেকে এবং তাঁর দাঁতের চমক থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি সিগারেট পান করেন না। তিনি আমার কপাল আর চোখ দেখে দৃষ্টি অবনমিত করছিলেন। আমি আরও কিছু কথা বললাম, তখন তিনি এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, যেন তিনি পালানোর রাস্তা দেখছিলেন, অথবা কেউ দেখে কি না, সেই ভয় করছিলেন। আমি হয়রান হলাম। কেননা, তিনি নিজেই সম্বোধন করার সাহস করেছিলেন; কিন্তু যখন আমি তাকে সম্বোধন করলাম, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আপনি ঘুরে বেড়ান। আমি চললাম।'

'যদি আপনার তাড়া না থাকে, তা হলে আসুন, একটু একসাথে ঘুরি।' আমি বললাম। তিনি কী যেন ভেবে থেমে গেলেন। তারপর আমরা একসাথে পায়চারী করতে লাগলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কোথায় থাকেন এবং কী করেন।

তিনি কোথায় থাকেন, তা বললেন; কিন্তু কী করেন, তা বললেন না। আরও বললেন, 'কয়েক দিন মারীতে বেড়াতে এসেছি।'

'বিয়ে করেছেন?'

'না।' তিনি জওয়াব দিলেন। বললেন, 'নিজের ব্যাপারেও কিছু বলুন।'

আমি আমার সাময়িক নাম জানিয়ে বললাম, 'আমিও মারীতে কয়েক দিন বেড়াতে এসেছি।'

'আপনাকে তো বিবাহিত মনে হচ্ছে না।' তিনি বললেন। 'পড়াশোনা করেন?'

তার দৃষ্টি কত ত্রুটিপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা কত সীমিত ছিল। তিনি আমার চেহারা দেখে এটাও অনুমান করতে পারেননি যে, আমি এতগুলো বিয়ে করে ফেলেছি, যেগুলোর সংখ্যাও আমার স্মরণ নেই এবং আমার রগের মধ্যে এতটুকু রক্ত নেই, যতটুকু শরাব আছে। এ ছিল সেই উত্তম আর শক্তিবর্ধক খাদ্যের ফল, যা আমি স্মাগ্লারদের ওখানে খেতাম। যা হোক, তখন আমার বয়স ছিল চব্বিশ বছর। চেহারায় আমার বয়স কম মনে হত। আমি তাকে বললাম, এ বছর বিএ পরীক্ষা দিয়েছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কোথাকার বাসিন্দা এবং কার মেয়ে। আমি মিথ্যা বলে তাকে আশ^স্ত করে দিলাম। আমরা মারীর ঋতু নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ গপশপ হতে থাকল। আমি তার মধ্যে গাম্ভীর্যপূর্ণ উদারতা লক্ষ করলাম। তার আচরণের মধ্যে স্বনির্ভরতা ছিল। আশঙ্কা করছিলাম, এই সাক্ষাতের পরিণতি হবে এই যে, তিনি আমাকে কোন হোটেলে যাওয়ার দাওয়াত দিবেন এবং সেই খাহেশ প্রকাশ করবেন, যার সম্পর্কে আমি খুব ভালো করে অবগত আছি। কিন্তু তার কথাবার্তার ঢঙের মধ্যে এমন প্রভাব ছিল যে, তাকে নির্জনতার একজন উত্তম সাথী মনে করে আমি তাকে কবুল করলাম। এখানে বলে দেওয়া জরুরী মনে করছি যে, আমি তার নাম এবং তার শহরের নাম বলব না।

'আপনার সাথে আর কে এসেছেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'একাই এসেছি।'

'কোথায় অবস্থান করছেন?'

আমি যখন হোটেলের নাম উল্লেখ করলাম, তখন তিনি চমকে উঠলেন এবং আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। তার চেহারার

রং বেশ বদলে গেল, যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, আমার প্রতি তার কোন আকর্ষণ আর থাকছে না। তিনি বললেন, 'অনুমতি হবে? আমি চলি।' কিন্তু আমি তাকে পীড়াপীড়ি করে বসিয়ে রাখলাম। তিনি কিছুটা অস্থির হলেন। তার কথাবার্তায় আগের স্বস্তি ও আবেগ ছিল না। হোটেলের নাম শুনে তিনি অসম্পূর্ণ কথা বললেন। তারপর আমিই বলতে থাকলাম। তিনি আরেক বার যাওয়ার কথা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি হঠাৎ কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেছে? তাড়া কীসের?'

'এমন কোন তাড়া তো নেই।' তিনি বিরক্তির স্বরে বললেন। 'ব্যাপার হচ্ছে কেউ দেখলে সন্দেহ করবে।'

'করতে দিন।' আমি হেসে বললাম। 'যদি আপনার পছন্দ হয়, তা হলে রাতের খাবার আমার সাথে খাবেন।'

'নাহ।' স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন তিনি।

'কেন?'

'কেননা, আমি ছোট মানুষ।' তিনি বললেন। 'এত বড় হোটেলে যাওয়ার স্বপ্নও আমি দেখতে পারি না।'

'আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি নিজের মাথা নষ্ট করতে পারি না।' উদাস মুচকি হেসে তিনি বললেন। 'আমি তো খুব গরীব মানুষ নই। তবে আমি আপনার মোকাবেলায় বেশ অসহায় মানুষ।'

হোটেল আর আমার চেহারাসুরত ও রঙের কারণে তিনি আমাকে আমীর বাবার মেয়ে মনে করছিলেন। আমার আমীরীর মধ্যে তো কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তিনি জানতেন না যে, আমি কত গরীব এবং সে সময় কেমন অভাব অনুভব করছিলাম। আমি আপনাকে বলতে চেষ্টা করেছি যে, এই লোকটিকে কেন আমার কাছে ভালো লেগেছিল। কিন্তু আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না। আমি নিজেও নিজেকে বোঝাতে পারি না যে, আমি এই লোককে সাথে সাথে মনের ভিতর

কেন বসিয়ে ফেলেছিলাম। যেই নিষ্পাপতার সাথে তিনি বললেন, 'আমি আপনার মোকাবেলায় অসহায় মানুষ।' সেই নিষ্পাপতা এত ভালো লাগল যে, আমি নির্দ্বিধায় বলে ফেললাম, 'আমি আপনাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি এবং আপনাকে যেতেই হবে।'

তার অস্বস্তি বেড়ে গেল। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন না। সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছিল। আমরা উঠলাম এবং রওয়ানা দিলাম। তিনি আমার থেকে দুই তিন কদম দূরে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু সেই চেষ্টা আমি কামিয়াব হতে দিলাম না। উপরে উঠতে উঠতে যখন আমরা সড়কে পৌঁছলাম, তখন বিরক্তকরভাবে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে গেল। সড়ক দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। আধা চেহারা নেকাব দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। তিনি আমার চেয়ে কয়েক কদম আগে বেড়ে গিয়েছিলেন। সড়কের অপর প্রান্ত দিয়ে দুই জোয়ান চলে যাচ্ছিল। তারা আমার সাথীকে দেখে হাত নাড়ল এবং একজন বলল, 'হ্যালো ক্যাপ্টেন।' তিনিও হেসে হাত নাড়লেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন?'

'এমন ভাগ্য কোথায় পাব?' তিনি বললেন, 'আমি রাওয়ালপিন্ডির এক হকি টিমের ক্যাপ্টেন। এরা দু'জন আমাকে চেনে।'

আমি তাকে হোটেলে নিজের কামরায় নিয়ে গেলাম এবং বোরকা খুলে ফেললাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না। আপনি এত বড় হোটেলে থাকছেন। আপনি পুরোপুরি মডার্ন ও সোশ্যাল। তারপরও আপনি এই বোরকা কেন চড়িয়ে রেখেচেন?'

'নিজেকে লোকজন থেকে লুকানোর জন্য।'

'এই প্রয়োজন কেন হল?'

'আর কখনও বলব।' আমি আলোচ্যবিষয় বদলে দিলাম।

তিনি কিছুটা চুপসে ছিলেন। আমি তাকে কথাবার্তায় লাগিয়ে দিলাম। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে, আমি শুধু তার সঙ্গ ভোগ করার জন্য তার মধ্যে আকর্ষণ বোধ করেছি। খাবার কামরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য অর্ডার দিলাম। আমি তার ব্যাপারে সবকিছু জানতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমি একটু বেশি খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। যদি তার অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে সেটা যথার্থ ছিল। তার সাথে এমন এক মেয়ের নেকাবমুক্ত হওয়া, যে এত দামী হোটেলে থাকে, একটি বিস্ময় ছিল। খোলামেলা আলোচনার জওয়াবে তিনি আমার থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তার এই দিকটি আমার কাছে খুব পছন্দ হল। তার আচরণ এমনই হওয়া উচিত ছিল।

খাবার ছিল রাজকীয়। খাওয়ার নিয়ম জানতেন তিনি। খাওয়ার আদব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কথাবার্তা বলার কৌশলও জানতেন। তিনি আসলে তেমন গরীব ছিলেন না, যেমনটা তিনি নিজের ব্যাপারে বলছিলেন। খাওয়ার পর তিনি চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, 'কিছু দূর পর্যন্ত আমি সাথে যাব।' তিনি আমাকে সাথে নিতে চাইছিলেন না। কিন্তু আমি বোরকা পরলাম এবং তার সাথে রওয়ানা দিলাম। কিছু দূর তার সাথে যাওয়ার পর তিনি থেমে গেলেন এবং আমাকে ফিরে যেতে বললেন। তখন আমি খুব আবেগাচ্ছন্ন হয়ে বললাম, 'খোদার জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না এবং কাল অবশ্যই দেখা করবেন।' তিনি একই জায়গায় আগামী কাল দেখা করার ওয়াদা করলেন এবং চলে গেলেন।

তার সাথে দেখা হওয়ার আগে আমার যে মানসিক অবস্থা ছিল, তা আপনাকে বলেছি। অবস্থা ছিল এমন, যেন আমার সারা গায়ে যখম হয়েছে এবং তা থেকে অনবরত ব্যথা উঠছিল। এমতাবস্থায় তাকে পাওয়া গেল। তখন ব্যথা থেমে গেল। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। সুতরাং সেই চাপ আবার ফিরে এল। খোদার কসম! মনে হচ্ছিল যেন তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তার এক সৌন্দর্য আমার কাছে খুব মনোহর লাগছিল। তা হল এই যে, তিনি আমার সাথে

স্বাভাবিক হওয়ার পরিবর্তে দুই কদম দূরে থাকার চেষ্টা করছিলেন। যেন আমার সৌন্দর্য আর দেহের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। তবে যেকোন সময় তিনি সেইসব পুরুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, যা আমি অসংখ্য বার দেখেছি- এই একটি আশঙ্কা আমাকে দংশন করছিল। শেষে আমি ভেবে নিয়েছিলাম, এখন এটা আমার জন্য আর কোন শঙ্কা নয়। যদি তিনি এমন কোন আচরণ করেন, অথবা এমন খাহেশ প্রকাশ করেন, তা হলে ফিস বয়ান করে আগাম উসুল করে নিব।

সে রাতে বেশ পেরেশান ও বেচায়ন থাকলাম। এই যুবক লোকটি আমার দৃষ্টির সামনে থাকলেন। বলতে পারব না, কেন যেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, এই লোকটি ওইসব লোক থেকে ব্যতিক্রম, যাদের সাথে আমার মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। এই বিশ্বাস আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল; কিন্তু সেই শঙ্কা, যার কথা আগে বয়ান করেছি, আমাকে তারপরও বেচায়ন করে দিচ্ছিল। এই দোটানার মধ্যেই একসময় আমার ঘুম চলে এল এবং আমি স্বপ্নে তাকে দেখলাম। নারীর প্রাকৃতিক আবেদন স্বপ্নে কাজের মধ্য দিয়ে আমার কাছে ধরা দিল। তিনি বাচ্চা হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমি তাকে নিজের স্তন থেকে দুধ পান করাচ্ছিলাম। আমি তার মাথা ও কচি কচি হাতগুলো চুম্বন করছিলাম। বৃষ্টির গর্জন শুনতে পেলাম। বিজলী চমকাল। সেই চমকে আমার চোখ বুজে এল। যখন আমার চোখ খুলল, তখন আমার কোল ছিল খালি। আমি তখন চেচিয়ে চেচিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। মেঘ গর্জাচ্ছিল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। কামরার মধ্যে নীল রঙের ছোট একটি বাল্ব জ্বলছিল। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলাম। ছাদের উপর মেঘের এমন শোর ছিল, যেন আমি পুলের নীচে দাঁড়িয়ে আছি এবং উপর দিয়ে রেল গাড়ি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

আমার অন্তর ভয়ে খুব জোরে বেজে চলছিল। স্তনের উপর বাচ্চার ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। দিলের মধ্যে ভয় এমন ছিল যে, স্তনে হাত দিয়ে দেখলাম। কেমন যেন আমি বাস্তবেই বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছিলাম। স্বপ্ন তো আমি কতই দেখেছি। স্বপ্নে আমি ভয়ও

পেয়েছি; কিন্তু চোখ খুলতে খুলতে মস্তিষ্ক স্বাভাবিক হয়ে যেত এবং মন এই বলে শান্ত হয়ে যেত যে, এ তো ছিল স্বপ্ন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটাও একটা স্বপ্ন ছিল। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম যে, তার কিছু একটা হয়ে গেছে। আর যদি এটা কোন স্বপ্নই ছিল, তা হলে এর মধ্যে খোদার কোন ইশারা ছিল। ভীষণ বৃষ্টি আর বাতাস বইছিল। একাকিত্বের অনুভূতি আমার ভীতি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি কামরার মধ্যে চার দিকে দেখলাম। আমার বুকের মধ্যে ভালোবাসার এমন তুফান উঠল যে, সেই বৃষ্টির মধ্যেই তার কাছে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন, জানতাম না। রাস্তার মাঝে আমাকে থামিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম; কিন্তু আমার দৃষ্টি থেকে তিনি সরলেন না। এরপর কখন আমার চোখ বন্ধু হয়েছিল বলতে পারব না। যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখন বেলা দশটা বাজছিল। তখনও স্বপের প্রভাব দিল ও দেমাগকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সাথে ছিল অস্থিরতা আর পেরেশানী। কখন গিয়ে দেখব যে, তিনি ভালোই আছেন।

তিনি আমাকে গুপ্তচর মনে করেছিলেন

এই দিনটি ছিল আমার জীবনের অনেক বড় দিন। এ ছিল প্রথম ক্ষেত্র, যেখানে কোন পুরুষের জন্য আমার মানসিক অবস্থা এত অধিক বিগড়ে গিয়েছিল। এক ছিল আমার সেই উপকারী বন্ধু, যে একজন জায়গীরদারের পুত্র ছিল। সে আমাকে এমন সময় আশ্রয় দিয়েছিল, যখন আমার পেটে ছিল বাচ্চা এবং আমি স্বামীর কাছ থেকে তালাক পেয়ে বাড়ি থেকে পালায়ন করেছিলাম। তার উপকারের কথা সারা জীবনে ভুলব না। কিন্তু তার সাথে আমার এমন আন্তরিক ভালোবাসা ছিল না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়ে নিজের সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সচেষ্ট ছিলাম। ঘটনাচক্রে সে ভালো মানুষ প্রমাণিত হল। এরপর ইটালিয়ান ম্যানেজারের পাকিস্তানী সেক্রেটারীকে ভালো লেগেছিল। তাকেও বিয়ে করার জন্য বলতে চাইছিলাম। কিন্তু এই নওজোয়ান, যাকে মারীর রাস্তার মাথায় পাওয়া গিয়েছিল, তিনি আমার আত্মার গভীরে অবতরণ করেছিলেন। তার অপেক্ষায় দিন কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সময়ের আগেই আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে তার আসার কথা ছিল। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পায়চারী করতে থাকলাম। বার বার আমি উপরের দিকে দেখতে থাকলাম। পরিশেষে তাকে দেখা গেল। আমি দৌড়ে দৌড়ে উপরে যেতে লাগলাম। তিনি দ্রুত নীচে নেমে এলেন। যখন তিনি আমার কাছে এলেন, তখন তার হাত দুটি ধরলাম। বিব্রত হলেন তিনি। নিজের হাতের মধ্যে আমার হাতে তিনি চাপ দিলেন না। তার প্রতিক্রিয়া ছিল মন্থর। আমি তার চারদিকে এমনভাবে দেখতে লাগলাম, যেমন কোন শিশু পড়ে গেলে তার মা তাকে পরখ করে দেখেন কোথাও চোট লাগেনি তো?

'আপনি কী দেখছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'নীচে চলো, বলছি।' আমি বললাম। আবেগের আতিশয্যে 'আপনি'র পরিবর্তে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলাম। 'তুমি ভালো আছ তো?'

'এখনও পর্যন্ত ভালো আছি।' তিনি বললেন।

নীচে গিয়ে আমরা বসলাম এবং আমি তাকে রাতের স্বপ্নের কথা শোনালাম। আমি বললাম, আমরা দু'জন একে অপরকে ভালো করে জানি না; কিন্তু আমি দিলের কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করব না। কেননা, জীবনে এই প্রথম বার আমার মানসিক অবস্থা এই রং আর তীব্রতা ধারণ করেছে। তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছ।

খুশি হওয়ার পরিবর্তে তিনি আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন যে, স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে নেই। তিনি আমাকে নিজের কয়েকটি ভয়ানক স্বপ্নের কথা শোনালেন। এরপর কথার পরে কথা বাড়তে থাকল এবং সূর্য ডুবে গেল। আমি তাকে হোটেলে আসার কথা বললে, তিনি টলাতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি তাকে সাথে নিয়ে এলাম। তাকে সুস্থ ও ভালো দেখে আমার স্বস্তি অনুভূত হল। আর যখন দেখলাম যে, তার মধ্যে গতকালের সংকোচ নেই, তখন আমার এমনই আনন্দ লেগেছিল, যা থেকে সবসময় বঞ্চিত ছিলাম। আমি তার সাথে চলতে চলতে ভাবছিলাম, আমি কি এই সমবয়সী লোকটিকে বিয়ে করতে চাই। ইনি কি আমাকে কবুল করবেন?.... না। আমি তাকে ধোঁকা দিব না। আমি তার যোগ্য নই। ইনি যদি আমাকে বিয়ে করার কথা বলেন, তা হলে আমি পরিষ্কার বলে দিব, আমি কে এবং কী। তারপর বলব, এবার ফায়সালা করো।

তিনি আমার সাথে চলতে ইতস্তত করছিলেন। আমার চেয়ে দুইতিন কদম আগে হাঁটতে চেষ্টা করছিলেন। কাছ দিয়ে লোকজন অতিবাহিত হচ্ছিল। তাদের বেশিরভাগ জোয়ান। এরা সবাই আমাকে নিবিড়ভাবে দেখছিল। উর্দী পরিহিত দুএকজন ফৌজীও আমার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন। আমরা মাল রোডের খেলুড়েদের অতিক্রম করে হোটেলের দিকে উপরে উঠতে লাগলাম। আমি ক্লান্ত হয়ে

গিয়েছিলাম। আগে বেড়ে তার বাজু ধরে ফেললাম এবং তার সাহায্যে উপরে উঠলাম। মনে হল, আমি ঠিক সেভাবেই এই পুরুষ লোকটিকে করতলগত করতে চেষ্টা করছি, যেভাবে পুরুষরা নারীদেরকে ফাঁসাতে চেষ্টা করে।

আমরা কামরায় গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ এদিকসেদিকের কথাবার্তা বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্যাপ্টেন! আপনার রেজিমেন্ট কোনটি এবং কোথায়? আপনি পনেরো দিনের ছুটিতে এসেছেন না?

তিনি আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন। চেহারার রং বদলে গেল তার। আস্তে আস্তে উঠে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, তুমি কি মেন্টাল কেস, না কি গুপ্তচর? কোথায় যেতে পছন্দ করবে, মেন্টাল হসপিটালে, না কি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কাছে?

আমি ছিলাম বেশ্যা। এই বিচারে আমার কোন কীর্তি ছিল না। অন্তরীণ দুনিয়ার শাহজাদী ছিলাম; তবে সম্মানিত সোসাইটি থেকে বিতাড়িত। আমি সেই পতিতা, যাকে আপনারা গালি হিসেবে ব্যবহার করেন। আমার অস্তিত্ব নোংরা এবং সস্তা নগ্ন গালি থেকেও বেশি নগ্ন ছিল। কিন্তু আমি গুপ্তচর শব্দটি বরদাস্ত করতে পারলাম না। গুপ্তচর বলতে হিন্দুস্তানের গুপ্তচর ছিল। আমি কখনও ভাবিনি যে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সম্পর্ক কেমন? মাত্র একমাস আগে রানকুচে উভয় দেশের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। আমি পত্রিকায় পড়েছিলাম, হিন্দুস্তানের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রী বলেছেন, এখন আমরা ইচ্ছামত রণাঙ্গন খুলব। আমি পত্রপত্রিকায় লড়াইয়ের সমস্ত খবর পড়েছিলাম। কিন্তু কোন মনোযোগ দেইনি। এই লড়াইয়ের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছিল; স্মাগ্লিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা কবে পরিষ্কার হবে, এই নিয়ে আমরা চিন্তায় পড়েছিলাম। যখন এই ব্যক্তি আমাকে গুপ্তচর বললেন, তখন একমুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক আঠারো বছর পেছনে চলে গেল, যখন আমি আদুরে শিশু ছিলাম এবং পায়ে হেঁটে হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান এসেছিলাম। যেই অগ্নিশিখা আমি আমার গাঁয়ে জ্বলতে দেখেছিলাম, সেটা আমার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল এবং তার মুখে গুপ্তচর শব্দটি শুনে আমি অগ্নিশিখার উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল এবং আমি আবেগে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কখনও দেখেছি। আমি তাকে ধমক দিতে চাইছিলাম। আমার যবান থেকে বের যাচ্ছিল যে, যাও, নিয়ে আসো তোমার মিলিটারি পুলিশ। আমি দেখব, চরবৃত্তির অভিযোগে কে আমাকে গ্রেফতার করার সাহস করে। ব্যাপার হচ্ছে, আমার মধ্যে এমন পাওয়ার ছিল, অথবা বলুন, আমার হাতে এত শক্তিধর অফিসার ছিল যে, কেউ আমাকে গ্রেফতার করলে, তাকে আমি চাকুরি থেকে বের করে দিতাম। কিন্তু যখন তিনি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তখন তার ভরা যৌবনা চেহারার জ্যোতি ও গাম্ভীর্য আমার রগরেশা আক্রান্ত করে ফেলল। তিনি ফৌজের ক্যাপ্টেন এবং তিনি আমাকে গ্রেফতার করিয়ে দিবেন, এই ভয়ে আমি দমিত হয়নি; বরং দমে গেলাম কারণ তিনি আমার ব্যক্তিত্বের উপর ছেয়ে গিয়েছিলেন।

'তুমি যে ক্যাপ্টেন, সে কথা আমি জানতে পেরেছি। কেননা, কাল দুই ব্যক্তি তোমাকে হ্যালো ক্যাপ্টেন! বলেছিল। তুমি আমাকে বলেছিল যে, তুমি হকি টিমের ক্যাপ্টেন। আমি মেনে নিয়েছিলাম। আজ যখন আমরা মাল রোড দিয়ে আসছিলাম, তখন তুমি আমার আগে ছিলে। উর্দী পরিধানকারী দুইজন সৈনিক তোমাকে স্যালুট করেছিলেন এবং তুমি স্যালুটের জওয়াব দিয়েছিলে। এতে আমি জেনে গেলাম যে, তুমি পাক ফৌজের ক্যাপ্টেন। এর সত্যায়ন এভাবেও হয়েছে যে, যখন আমরা হোটেলের পথে উপরে উঠছিলাম, আমি চার-পাঁচ কদম পেছনে ছিলাম, তখন দুই যুবক আমার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল, তারা তোমার নাম নিয়ে বলেছিল, ... ক্যাপ্টেন যাচ্ছেন। অমি বুঝে গেলাম যে, তুমি আমাকে গলদ নাম বলেছিলে এবং তুমি আমার কাছ থেকে নিজের পদ গোপন করতে চেয়েছিলে। তোমার অবয়ব ও তোমার কথাবার্তা বলে দেয় যে, তুমি সৈনিক।'

'এ পর্যন্ত আমি মেনে নিলাম।' তিনি বললেন। 'তুমি আমার বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আমি তোমার সন্দেহ এই বলে দূর করে দিতে চাই যে, ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের লড়াই খতম হয়নি। শুধু রানকুচের লড়াই খতম হয়েছে। আমি চাইলে পনেরো মিনিটের মধ্যে এই হোটেল

সিল করিয়ে দিতে পারি। তুমি যদি ইন্ডিয়ার গুপ্তচর হও, তা হলে এখান থেকে জীবিত ইন্ডিয়া যেতে পারবে না।'

এখনকার প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন কিছু। আসলে আমি নরমাল মেধার মেয়ে ছিলাম না। আমার জগতের কোন মেয়ে, কোন নারী এবং কোন পুরুষ নরমাল মেধার নয়। আমরা অ্যাবনরমাল। অ্যাবনরমাল লোকের প্রতিক্রিয়া তার সাধ্যের বিষয় নয়। আমার অবস্থাও তা-ই ছিল। তিনি যখন আরও একবার ইন্ডিয়ার গুপ্তচর বললেন, তখন আমি পেরেশানী ও বিরক্তিতে আক্রান্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমি ইন্ডিয়ার গুপ্তচর নই; আমি ইন্ডিয়ার মুহাজির। শরণার্থী। আঠারো বছর অতিবাহিত হয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমি আশ্রয় পাইনি। আমি যেটাকে মঞ্জিল ভেবেছিলাম, সেটা মরীচিকা প্রমাণিত হয়েছে। তোমাকে আমার কাছে সাধু মনে হয়েছে। সৈনিক বলেই কথা। কিন্তু একটি দীর্ঘ কাহিনী শোনানোর আগে আমি তোমাকে বাতলে দিতে চাই যে, তুমি যদি এই হোটেল সিল করতে পার, তা হলে আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে সিল ভেঙে দিতে পারি। যেই দেশ অর্জনের ব্যাপারে, তোমার মত নওজোয়ান ও ক্যাপ্টেন জান কুরবানী করে দেন, সেই দেশে শাসক আমার হাতে মুঠোয়। তোমরা সীমান্তে রক্ত ঢেলে দিয়ে থাক, আর আমাদের বাদশা সীমান্তের ভিতরে শরাবের কলসি ঢেলে থাকে।'

'আমার সাথে সাদাসিধা কথাবার্তা বলো।' তিনি বললেন। 'এখানে কোন ফিল্মের শুটিং হচ্ছে না।'

'আমার পাশে বসো।' আমি তাকে বললাম। আমার অশ্রু বের হতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কাছে এতটুকু সময় আছে যে, আমার পুরো কাহিনী শুনতে পারবে? আমি তোমার মত ব্যক্তিকে কেন ফাঁসাতে চাচ্ছি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে কথা শুরু করতে হবে তখন থেকে, যখন আমি পাকিস্তানে দাখিল হয়েছিলাম।'

তিনি আমার সামনে বসলেন। আমি শৈশব থেকে কাহিনী বর্ণনা শুরু করলাম এবং মারীর এই সাক্ষাতের বিবরণের সাথে শেষ করলাম। যেসব কথা আমি আপনাকে শুনিয়েছি, সেগুলো সবই তাকে শুনিয়ে

দিলাম। কোন একটি কথাও গোপন করলাম না। শোনাতে শোনাতে আমি কয়েক বার কাঁদলাম, কয়েক বার হাসলাম। যখন কথা শেষ হল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজছিল। আমি তাকে গত রাতের অবস্থা বর্ণনা করলাম, যখন অসহায়ত্বের অনুভূতি আমাকে দিশেহারা বানিয়ে দিয়েছিল এবং সেই দিশেহীন অবস্থায়ই আমি বাইরে বের হয়েছিলাম এবং আমার এই আবেগাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন এবং সোফা থেকে উঠে কামরার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, তিনি গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি নিজের কথাই চিন্তা করুন। আমার আত্মবিবরণ শুনতে শুনতে তিন-চার বার আপনার চোখে পানি এসে পড়েছিল। আপনি পরিপক্ক বয়সের মানুষ এবং অনুভূতিশীল এডিটর। এজন্য আপনি অশ্রু রোধ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন পাক ফৌজের ক্যাপ্টেন। ফৌজী ট্রেনিং তাকে কঠিনহৃদয় বানিয়ে দিয়েছিল। এজন্য তিনি চোখে পানি আসতে দেননি। কিন্তু তিনি যে চোখের পানি লুকোচ্ছিলেন, সেটা আমার কাছ থেকে গোপন করতে পারেননি। তার সুন্দর ও প্রিয় চোখ দুটি কয়েক টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিল। দুই-তিন বার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে সোফার মধ্যে ঘুষি মেরেছিলেন এবং তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন।

আমি শুনেছি যে, গুপ্তচর মহিলাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে বেদনাদায়ক নানা কাহিনী শুনিয়ে নিপীড়িত হওয়ার কথা প্রকাশ করে এবং নিজেদেরকে নির্যাতিত সাব্যস্ত করে। আমি জানি না, তারা আসলে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে কি না। কিন্তু আমার কাহিনী মনগড়া কোন বিষয় ছিল না। এ ছিল আমার হৃদয়ে লেখা, যা আমি তাকে পড়ে শুনিয়ে দিলাম। এজন্য তিনি কামরার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।

'আমি জানি না যে, আমি এত বড় আমীর মেয়ে হয়ে তোমার মত সাধারণ মানুষ কেন ফাঁসাতে চেষ্টা করছি, এখনও তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি কি না।' আমি বললাম। 'তুমি সৈনিক। তুমি

পাথর। তুমি মোম হলে দেশ রক্ষা করতে পারবে না। তুমি আমার গত রাতের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারনি।'

কামরার মধ্যে পায়চারী করতে করতে তিনি চৌকাঠে হাত রেখে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি বললাম, 'আমি সাহস করে তোমাকে বলে দিলাম যে, আমার সম্পর্ক স্মাগ্লার গ্রুপের সাথে। আমি তোমার ক্যাপ্টেনির ভয়ে অপরাধে লিপ্ত হইনি। এগুলো হচ্ছে কাঁটা, যেগুলো আমার হৃদয় ও আত্মার ভিতর থেকে বেছে বেছে তোমার সামনে রাখলাম। আমি সামান্য সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ সম্পদ জমা করতে পারি যে, তোমার মত আধা ডজন ক্যাপ্টেন খরিদ নিজের পায়ের উপর বসাতে পারি। এই হোটেলে আমি ধনাঢ্য খদ্দেরদেরকে ফাঁসিয়েছি। তোমাকে ফাঁসানোর কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। কেননা, তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ যে, তুমি গরীব মানুষ এবং এই হোটেলে আসার কল্পনাও তুমি করতে পার না। কিন্তু তোমার মূল্য এত বেশি যে, আমি তা পরিশোধ করতে পারব না। আমি তোমাকে সেই পুরুষের কথা বলে দিয়েছি, যাকে আমার কাছে মঞ্জিল মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই মঞ্জিল ছিল ধোঁকা। সে আমার দেহ নিয়ে খেলা করে এবং নিজের রাস্তা আলাদা করে নেয়। আরেক হচ্ছ তুমি, যে আমার আবেগকে ফৌজি বুটের নীচে দলে যাচ্ছ। আমি ইন্ডিয়ার গুপ্তচর নই; ইন্ডিয়ার দুশমন। যদি চরবৃত্তির জন্য তুমি আমাকে ট্রেনিং দিয়ে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দাও, তা হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।'

'পাকিস্তান এমন আত্মমর্যাদাহীন দেশ নয় যে, কোন নারীকে দুশমনের দেশে প্রেরণ করবে।' তিনি বললেন। 'আমি জানি, গুপ্তচর মেয়েরা নিজের সতীত্বের হাতিয়ার ব্যবহার করে। আমরা এখনও জীবিত আছি।' একটু চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি আশা ছিল যে, আমি তোমাকে বিয়ে করব?

'আমার আশা ও উমীদ এতটা আহত হয়ে পড়েছে যে, আমি এখন তা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি।' আমি জওয়াব দিলাম। 'তারপরও আমার অন্তরে একজন নারী এই আশায় জীবিত আছে যে, কোন পুরুষ আসবেন, যিনি আমাকে এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

এখন যখন তোমাকে আমি কী এবং আমার অতীত কেমন, সে কথা বিস্তারিতভাবে বাতলে দিলাম, তখন কীভাবে তোমার মত নওজোয়ানের সাথে আশার আঁচল বাঁধতে পারি যে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

'করব।' তিনি সৈনিকদের এমন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যেমন তারা বলে থাকেন, আমার কাছে রায়ফেল আছে। আমি গুলি চালিয়ে দিব। তিনি আস্তে আস্তে আমার কাছে এলেন। আমি সোফার উপর বসে ছিলাম। তিনি তাঁর দুই হাত আমার গালের উপর রেখে আমার চেহারা উপর দিকে তুললেন। তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর চোখে পানি রয়েছে। আমি উঠলাম এবং পরের মুহূর্তে আমরা একজন আরেক জনের বাজুর মধ্যে ছিলাম। তাঁর বাজুর বেস্টনি আর দৃঢ়তার কারণে আমার পাঁজরের হাড্ডি চড়চড় করে উঠল; কিন্তু আমি কেমন স্বস্তি, কেমন নেশা আর শান্তি অনুভব করলাম, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি পুরুষের বাজু ও দেহের কোন হিস্সার সাথে অপরিচিত ছিলাম না। পুরুষরা আমার দেহ বড় নির্দয়ভাবে চুষেছিল এবং চষেছিল; কিন্তু ইনি ছিলেন প্রথম পুরুষ, যার বেস্টনির মধ্যে হৃদ্যতা আর আদরের তীব্রতা ছিল।

এরপর আমি সোফায় বসে ছিলাম। তিনি সোফায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথা ছিল আমার কোলের মধ্যে। আর আমি তাঁর মুখে বার বার এমন আবেগে চুমু দিচ্ছিলাম, যেন তিনিই ছিলেন আমার সেই বাচ্চা, যাকে আমার উদর জন্ম দিয়েছিল এবং আমি যাকে দেখিনি পর্যন্ত। আমি তাকে বলছিলাম, 'আমি তোমাকে স্বামী বানাতে পারব না।'

'কেন?' কিছুটা বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মনে হচ্ছে তুমি আমার সেই বাচ্চা, যাকে হাসপাতালে জন্ম দিয়ে খ্রিস্টানদের হাওয়ালা করে এসেছি।'

তিনি যেহেতু সৈনিক ছিলেন, আমার মত ফিল্মি ও ড্রামাটিক কথাবার্তা বলতে পারতেন না। এজন্য তিনি বললেন, 'খোদার দোহাই,

তুমি আমাকে হারামী বাচ্চা বানিয়ো না। প্রকৃতপক্ষে আমি হালালযাদা।'

আমার হাসি ছুটল। শিরা-উপশিরায় যে খিঁচুনি ছিল, তা খতম হয়ে গেল এবং আমার মনে পড়ে গেল যে, আমরা তো খাবার খাইনি। রাত তখন সাড়ে বারোটা বাজছিল। এটা ছিল ওইসব হোটেলের একটি, যা দিনে ঘুমায় এবং রাতে জাগ্রত থাকে। আমি ফোন করে খানা কামরায় এনে দিতে বলতে লাগলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু পান করবে, হুইস্কি, বিয়ার...?'

'আমি তো সিগারেটও পান করি না।' তিনি বললেন। 'তুমি পান করতে চাইলে আনিয়ে নাও। আমি তো তোমাকে বাধা দিতে পারি না।' আমি তাকে জানিয়ে ছিলাম যে, আমি কেমন কেমন নেশা করেছি এবং এখন কতটুকু শরাব পান করি। আমি তার কাছে কোনকিছু লুকাইনি। তিনি আমাকে শরাবে অভ্যস্থ মনে করে তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে বাধা দিতে পারি না। আমি তাকে বললাম, 'যদি তুমি বলতে, আমার সামনে পান কোরো না, তা হলে আমার কাছে বেশি খুশি লাগত। আমি পান করব না। ওয়াদা করছি, কখনও পান করব না।'

খাবার এল। আমরা খেলাম। তিনি কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে থাকলেন। হয়তো এজন্য যে, তিনি জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত নাযুক এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফায়সালা করেছিলেন। আমি বুঝে ফেললাম, তিনি এখন দুমুখো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং চিন্তা করছেন যে, তিনি যে রাস্তা নির্বাচন করেছেন, সেই রাস্তায় চলবেন, না কি চলবেন না। আমি তার অনুগত থাকব; ধোঁকা দিব না... এমন নিশ্চয়তা দেওয়ার কোন চেষ্টা করলাম না। আমি কোন কসমও খেলাম না। আমি যেই ধাঁচে তাকে নিজের কাহিনী শুনিয়েছিলাম, সেই ধাঁচ এবং আমার চোখের পানি তাকে নিশ্চিত করেছিল যে, আমি ভিতরগতভাবে কী?

'তোমাকে ফিরে যেতে হবে।' খাবারের পর ঘড়ি দেখে আমি বললাম। 'দেড়টা বেজে গেছে।'

'আমি ছুটিতে আছি।' তিনি জওয়াব দিলেন।

এখানেই ঘুমাও।

তিনি মেনে নিলেন। আমার কাছে তার জন্য কোন পায়জামা ছিল না। আমার একটি রেশমি চাদর তাকে দিলাম। পাতলুন খুলে তিনি সেটা বাঁধলেন। শার্ট ছেড়ে গেঞ্জি পরে থাকলেন। তিনি সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমি স্বাচ্ছন্দ্যে তার বাজু ধরে তুললাম এবং পালঙ্কের উপর শুইয়ে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সোফার উপর শোবে?' আমি জওয়াব দেওয়ার বদলে তাঁর পাশে পালঙ্কে শুয়ে পড়লাম। আলাদা শোয়ার জন্য তিনি জিদ করলেন, যা আমি পুরো হতে দিলাম না। তিনি হাসতে হাসতে একটি কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন, 'আমি জানি না, এই কাহিনী সত্য, না কি আফসানা। যাই হোক, আমার কাছে ভালো লাগে। নেপোলিয়ান যখন রাশিয়ার উপর হামলা করেন, তখন তার একটি ব্যাটালিয়ান (পল্টন) রাশিয়ান এরিয়ার এক জঙ্গালের মধ্যে ক্যাম্প করে। সন্ধ্যার পর এক খুবসুরত রাশিয়ান যুবতী মহিলা নেপোলিয়ানের এক ব্যাটালিয়ানের কমান্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করে। তাকে দেখতে গ্রাম্য মনে হতে থাকে। সে নির্যাতিতা নারীর ভান করে ব্যাটালিয়ানের কমান্ডারকে জানায় যে, যুদ্ধ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার স্বামী, তার ছেলেমেয়ে এবং তার জীবজন্তু মারা পড়েছে। ব্যাটালিয়ানের কমান্ডার তার কোন উপকার করতে পারতেন না। তিনি সমবেদনার খাতিরে মহিলাকে কাছে বসান এবং তাকে তোয়াজ করতে থাকেন।...

মহিলা কমান্ডারের সাথে অন্তরঙ্গা হয়ে যায় এবং তাকে সূক্ষ্ম কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে শুরু করে। যেমন, এখন তার ব্যাটালিয়ান কোথায় যাচ্ছে এবং এখন নেপোলিয়ানের ইচ্ছা কী? কমান্ডার সাথে সাথে বুঝে ফেলেন যে, এ তো গ্রাম্য মহিলা নয়; বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা গুপ্তচর। কমান্ডার মহিলাকে বলেন, তুমি তো গুপ্তচর। আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব। মহিলা কাকুতি মিনতি করতে থাকে যে, তিনি তাকে শুধু সন্দেহের উপর গুলি করবেন। সে তো আগেই বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আলোচনা পর্যালোচনার পর কমান্ডার

তাকে বলেন, আমি এক বছর থেকে ব্যাটালিয়ানের সাথে বন-জঙ্গাল আর পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং লড়াই করছি। শিরা-উপশিরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া এক বছরের মধ্যে আমি কোন নারীর শরীর স্পর্শ করিনি। আমি তোমাকে এই শর্তে ছেড়ে দিতে পারি যে, আজ রাত তুমি আমার সাথে অতিবাহিত করবে।...

মহিলা জওয়াব দিল, তা হলে আমারও একটি শর্ত মানো। আমি একের পরিবর্তে দুই রাত তোমার সাথে থাকব। বিনিময়ে তুমি আমাকে নেপোলিয়ানের হামলার নকশা আমাকে দেখাতে হবে। কমান্ডার সাথে সাথে তাকে নেপলিয়ানের হামলার সমস্ত পরিকল্পনা জানালেন এবং নকশাও দেখালেন। রাশিয়ান মহিলা প্রকৃতপক্ষেই গুপ্তচর ছিল এবং কমান্ডার যা বললেন, সেটাই তার জানার ইচ্ছা ছিল। এর বিনিময়ে সে কমান্ডারের তাঁবুতে রাতযাপন করল। সকালে সে বিদায় নেওয়ার অনুমতি চাইল। ব্যাটালিয়ানের কমান্ডার রিভলবার বের করলেন এবং মহিলাকে বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার সাথে রাতযাপন করো, সকালে তোমাকে ছেড়ে দিব; গুলি করব না; কিন্তু তুমি নেপোলিয়ানের হামলার সমস্ত পরিকল্পনা এবং নকশা দেখানোর শর্তে আমার ইচ্ছা পূরণ করেছ। আমি তোমার শর্ত পুরা করেছি। এখন যেহেতু তোমার কাছে আমার একটি সামরিক ভেদ রয়েছে এবং তুমি শত্রুপক্ষের নারী, এজন্য আমি তোমাকে গুলি করব। একথা বলে তিনি রিভলবার তাক করলেন এবং রাশিয়ান মহিলাকে গুলি করলেন।

এই কাহিনী তিনি রসিকার ছলে আমাকে শোনালেন। আমি তাকে বললাম, আমি তোমার কাছে কোন গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করছি না। তোমার কাছে নেপোলিয়ানের ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের খাহেশও তুমি প্রকাশ করছ না, তা হলে আমাকে গুলি করবে কেন?

আমরা হাসিমজাকের মুডে এসে পড়লাম। আপনার হয়তো বিশ্বাস হবে না, আমরা এমনভাবে একই পালঙ্কে শুয়ে হাসতে খেলতে এবং গপশপ করতে থাকলাম, যেন ছয় সাত বছরের দুটি শিশু একসাথে শুয়ে আছে। আমরা ঘুমিয়ে গেলাম এবং পরের দিন বেলা এগারোটার

দিকে সজাগ হলাম। আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ হচ্ছে পুরুষ, যার আকাঙ্ক্ষা আমার। আপনি কি এমন কোন পুরুষ দেখাতে পারবেন, যে এক জোয়ান ও খুবসুরত মেয়ের সাথে সারা রাত শুয়ে থাকবে এবং কোন অশ্লীল আচরণ করবে না?

গোসল আর নাস্তা সেরে তিনি চলে গেলেন। বলে গেলেন, বিকালে দেখা হবে; প্রথম দিন যেখানে দেখা হয়েছিল।

পাকফৌজের ক্যাপ্টেনের সাথে কয়েক দিন

তার চলে যাওয়ার পর আমি কামরায় বসে পড়লাম। তাঁর ব্যাপারে ভাবতে লাগলাম। কখনও একীন হতে থাকল যে, তিনি আমাকে কবুল করেছেন। আবার কখনও এই ভেবে পেরেশান হতে থাকলাম যে, না; তিনি আমার সাথে খেলা করছেন। ছুটির বাকি দিনগুলো কাটানোর পর চলে যাবেন। তারপর আর কখনও দেখা হবে না। কখনও মনে হচ্ছিল যে, তিনি আমাকে ধোঁকা দিয়ে জানতে চাচ্ছেন যে, আমি আসলে গুপ্তচর কি না। এই ধারণাটি সুদৃঢ় হচ্ছিল। কেননা, সেই মেয়ের উপর এমন প্রথিতযশা ক্যাপ্টেন কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারে, যে এই বয়সেই পরিপক্ক সোসাইটি গার্ল, মদখোর ও স্মাগ্লার বনে গিয়েছিল। কিন্তু আমার কাহিনী শুনে তার চোখে পানি এসেছিল। আমার উপর তার বিশ্বস্ততা এসে পড়েছিল।... এমনই উল্টা-সিধা চিন্তাভাবনা আমাকে পেরেশানও করতে থাকল এবং সান্তনাও দিতে থাকল। বাকি দিন এই অস্বস্তির মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেল।

বোরকা পরে আমি সেখানে চলে গেলাম, যেখানে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সেখানে পায়চারী করছিলেন। আমরা বসলাম। আমি কী অস্বস্তির মধ্যে লিপ্ত আছি, আগে সে কথা তাকে জানালাম। এ কথা আমি বেশ মার্জিত ধাঁচে শুরু করেছিলাম; কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি অস্থির হয়ে তার দুই হাত ধরে ফেললাম এবং অশ্রুনিমজ্জিত চোখ তার চোখের উপর রেখে ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'খোদার দোহাই, তুমি আমাকে

জানিয়ে দাও যে, তুমি আমার সাথে কেমন খেলা খেলছ? তুমি যদি আমাকে গুলি করিয়ে দিতে চাও, তা হলে একটু জলদি করো। আমার মন মাতিয়ে চলে যেতে চাইলে একটু জলদি চলে যাও।'

'আমি তোমার সাথে মন মাতাতে চাইনি।' তিনি বললেন। 'কিন্তু খোদার কসম! আমি তোমার মন মাতাব; তবে তোমার মন ভাঙব না। এই আশঙ্কা আমার করা উচিত ছিল; তোমার নয়। আমিও সারা দিন এই আশঙ্কায় লিপ্ত ছিলাম, তুমি যা নিয়ে পেরেশান রয়েছ। আমি বুঝতে পারছি না, তুমি যে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না, সে ব্যাপারে আমি কীভাবে আশ্বস্ত হয়ে গেলাম।... আমি তোমাকে যীবী বললে কি তুমি পছন্দ করবে?'

'কেন? যীবী কেন?'

'এই নামটি আমার কাছে ভালো লাগে।' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'অনেক দিন আগে নামটি শুনেছিলাম। তখনই আমি ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে স্ত্রীকে যীবী বলে ডাকব।'

তার কথা বলার ভঙ্গি ছিল শিশুর মত। আমি খুব নিরীক্ষণের সাথে তার চেহারা দেখলাম। কে জানে, কেন যে দিলের মধ্যে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, এটা আমার ছেলের চেহারা। তিনি আমার প্রাকৃতিক শূন্যতা পূরণ করেছিলেন।

'শোনো যীবী!' তিনি বললেন। 'আমি সৈনিক। আমাদের প্রশিক্ষণ এমন কায়দায় হয়ে থাকে যে, আমাদের অভ্যাস বদলে যায়। সৈনিক কোন কাজ করলে তার সবগুলো দিক ভেবে নেয়। আত্মতৃপ্তি আমাদের অভ্যাস থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমরা আশঙ্কার প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখি। পরিকল্পনা করি। সবদিক থেকে বিষয়টি পরখ করি। তারপর যবান খুলি, অথবা কাজ করি। আমরা আবেগের কাছে পরাস্ত হই না। তুমি এমন ট্রেনিং পাওনি। তোমার জীবন ডিসিপ্লিনের নামই শোনেনি। বরং বলা দরকার যে, তুমি শাহযাদী। তুমি আবেগাপ্লুত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তুমি বৈবাহিক জীবনের নিয়মনীতির উপর বিরক্ত হয়ে নিজের সিদ্ধান্তের উপর আফসোস করবে। আমার বেতন সীমিত। আমার

জীবন এমন এক বাস্তবতা, যা তোমার মত স্বাধীনচেতা মেয়ের কাছে পছন্দ হবে না। আজ রাতে এসব সত্য সামনে রাখবে এবং ভাববে। হতে পারে, তুমি নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলবে।'

আমি তাকে আবার সেই কথাবার্তাই বলে দিলাম, যেগুলো গতরাতে বলে ফেলেছিলাম। আমি তাকে আরও বললাম, 'আমাকে পুনরায় চিন্তা করার জন্য বলবে না। হতে পারে, আমি বিগড়ে যেতে পারি। আমার অতীতকে মরে যেতে দাও। তাকে মারার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করো।'

এমন অনেক কথাই তাকে বলেছিলাম। তাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে, তাকে বিয়ে করব, অথবা নিজেকে নিঃশেষ করে দিব।

সূর্য ডুবে গেল। রাতের আঁধার আচ্ছন্ন করতে লাগল; কিন্তু আমরা সেখানে বসে কথাবার্তা বলতেই থাকলাম। এরপর আমি তার রানের উপর মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম, আর তিনি আমার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে থাকলেন। আমি সেই তৃপ্তি অনুভব করলাম, যা ক্লান্ত পথিক মঞ্জিলে পৌঁছনোর পর লাভ করে। আমি অনেক দীর্ঘ দূরত্ব আর কঠিন পথ মাড়ানোর পর মঞ্জিলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ঘুম পেতে লাগল আমার। তিনি আমাকে কোন কথা শোনাচ্ছিলেন, যা আমি স্বপ্নের মত শুনে যাচ্ছিলাম। এরপর তিনি বললেন, 'চলো, এখন ছুটি করি।'

আমি জাগ্রত হলাম।

সেই রাতে তিনি আমার হোটেলে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। বলছিলেন, 'প্রতিদিন তোমার কাছে খানা খাওয়া খারাপ দেখা যায়।' আমি জিদ করে তাকে নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম না যে, আমি হোটেলে বিনামূল্যে থাকি এবং খানার বিলও পরিশোধ করি না। যদি হোটেলের ভাড়া আর খানার বিল দিতে হত, তা হলে আমার কাছে পয়সার অভাব ছিল না। ব্যাংকে অনেক পয়সা পড়ে ছিল। ওই পয়সার উপর আমার ঘৃণা শুরু হয়েছিল। তখন একটিই খাহেশ ছিল, সংসার সাজাব এবং নিজের প্রকৃতির দিকে ফিরে যাব।

তার কাহিনী

রাতের আহার শেষ করে আমি তাকে বললাম, 'তুমি কি পিতা-মাতার কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি নিবে? আমার ব্যাপারে তাদেরকে কী বলবে?'

'আমার পিতা-মাতা নেই।' তিনি জওয়াব দিলেন।

'মারা গেছেন?'

'মা মারা গেছেন।' দীর্ঘ শ্বাস ফেলে খুব উদাস কণ্ঠে তিনি বললেন। 'বাবা জীবিত আছেন; কিন্তু আমি বলে থাকি যে, তিনিও মরে গেছেন।' মুখ ফেরালেন তিনি। এরপর পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ পরিষ্কার করলেন। তিনি যে চোখের পানি মুছলেন, তা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হল না।

তার চোখের পানি ছিল আমার বরদাশতের বাইরে। আমি বলের মত লাফিয়ে উঠলাম। দৌড়ে গিয়ে তার মাথা ধরলাম এবং বুকের সাথে লাগালাম। তার চোখের পানি অনবরত বের হচ্ছিল। আমি ওড়না দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিলাম এবং দিশা হারিয়ে তার ভেজা চোখে চুমো দিতে লাগলাম। তিনি তো ছিলেন পুরুষ। সামলে গেলেন; কিন্তু আমি সামলে উঠতে পারলাম না। আমি সেই জোয়ান পুরুষকে ঠান্ডা ছায়া মনে করতাম; কিন্তু সেই ছায়া কোন দুঃখে তপ্ত ছিল। এমন সুঠাম পুরুষের চোখের পানি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিল। একই সাথে আমার মাথায় খেয়াল চাপল যে, আমার চেয়ে দুঃখী আর কে হতে পারে? যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে আমি তার দুঃখও নিজের বুকে ধারণ করব। তখন আমার মানসিক অবস্থা

ছিল মায়ের মত। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি যুবতী মেয়ে এবং ইনি আমার বয়সের যুবক। আমি তার মুখ উপর দিকে তুললাম। দেখলাম, তার ঠোঁটে মুচকি হাসি রয়েছে। কিন্তু সেই মুচকি হাসির মধ্যে তিনি আঁসুর দরিয়া আটকে রেখে ছিলেন।

আমি তার ছোট ছোট চুলের মধ্যে আঙুল সঞ্চালন করতে করতে বললাম, 'তুমিও আমার মত কেঁদে ফেললে? তুমি না পুরুষ?'

'কয়েক বছর পর চোখে পানি এসেছে।' তিনি বললেন এবং দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। আরও বললেন, 'আমি কারও সাথে কখনও সমবেদনা প্রকাশ করিনি। কেউ আমার জন্য সমবেদনা দেখাক, তা আমি চাইতামও না। আমি মহব্বত ও ভালোবাসার শুধু নাম শুনেছিলাম। কোথাও মহব্বত দেখিনি; কোথাও ভালোবাসা পাইনি। আমার অন্তরের মধ্যে সীমাহীন ভালোবাসা আছে; কিন্তু তা শুধু পাকিস্তানের জন্য; খাকি উর্দীর জন্য। আমার মহব্বত অস্ত্রের সাথে এবং আমার জোয়ানদের সাথে। আমার জীবনের মিশন হচ্ছে পাকিস্তানের সুরক্ষা এবং সীমান্তের কোথাও জীবন দিয়ে দেওয়া। যদি আমার অন্তরে এই মিশন ও আবেগ সৃষ্টি না হত, তা হলে আমি এখন জেলে থাকতাম। মানুষের পকেট কাটতাম। তালা ভাঙতাম। অথবা কোন রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করে হাই স্টান্ডার্ড গুন্ডা বনে যেতাম। আমাদের দেশে বঞ্চিত শিশুদের ভবিষ্যৎ এমনই হয়ে থাকে।

আমি তার আত্মকথা বুঝে ফেলেছিলাম। জালেম বাবার সন্তানের মানসিক অবস্থা এমনই হয়ে থাকে, যা তিনি বর্ণনা করছিলেন। তার এই অবস্থা দেখে আমার ভালো লাগল। কারণ, যেমনইভাবে আমি অ্যাবনর্মাল মস্তিষ্কের মেয়ে ছিলাম; তেমনইভাবে তিনিও নর্মাল ছিলেন না। একথা ভিন্ন যে, তিনি নিজের পেশায় দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলে যাচ্ছিলেন; আমি শুনে যাচ্ছিলাম। আমি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম না। সিয়া কালো ধোঁয়ার মত তার বুক থেকে কথাবার্তা বের হচ্ছিল। আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম। তার বর্ণনার ছন্দপতন ঘটতে পারে, এজন্য আমি তাকে কোন প্রশ্ন করলাম না। আট-নয় বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও তার একেকটি শব্দ

আমার মনে আছে। তার কোন্ কথায় দীর্ঘ শ্বাস বের হয়েছিল এবং কোন্ কথায় অশ্রু বের হয়েছিল, তা-ও মনে আছে। তার ভাষায়ই আমি তার কাহিনী শুনিয়ে দিচ্ছি। আপনিও তার শব্দমালায়ই লিখবেন। আমি আস্তে আস্তে বলব, যাতে আপনি তার প্রত্যেকটি কথা সেভাবেই লিখতে পারেন, যেভাবে তার যবান থেকে বের হয়েছিল।

'যদি তুমি আমাকে ভালোবাসার ঝলক না দেখাতে, তা হলে আজও চোখের পানি বের হত না। পুরুষের চোখে অশ্রু ভালো দেখায় না। তোমার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, তোমার সৌন্দর্য, তোমার যৌবন আমাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। আমাকে প্রভাবিত করেছে তোমার কাহিনী আর তোমার ভালোবাসা। আমি তোমাকে প্রথম দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এতে তুমি হয়তো বুঝে নিতে পার যে, এই দেশের যুবকদের মত আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। তোমার সাথে কথা বলার কারণ ছিল এই যে, তোমার বয়সের মেয়ে মারীর মাল রোডের জাঁকজমক ছেড়ে এত দূরে এমন বিরান জায়গায় ঘুরে বেড়ালে তার অর্থ ভিন্ন কিছু। আমার অভিজ্ঞতা এমনই। আমিও একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমিও মারীর জাঁকজমক থেকে পালিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম। তুমি একা কেন, তা জিজ্ঞেস করার জন্য মনের ভিতরে এক আবেদন অনুভব করছিলাম। আমি আসলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে, কোন্ বেদনা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।'

'আমার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আমি সৈনিক এবং দায়িত্বশীল সৈনিক। যখন আমি একজন সাধারণ মানুষের রূপে উপস্থিত হই, তখন আমার আবেগ আমাকে পেরেশান করে দেয়। কিন্তু যখন আমি সৈনিক থাকি, তখন নিজের আবেগ চূর্ণ করে দিই। তুমি আমার উভয় রূপ দেখে ফেলেছ। তুমি নিজের জীবনের যে শূন্যস্থান দেখিয়েছিলে, তা আমার জীবনেও বর্তমান ছিল। তোমার মহব্বত উভয়ের শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে। এই শূন্যতাই ছিল আমার অনেক বড় দুর্বলতা। ... এই শূন্যতা, এই দুর্বলতা, এই তৃষ্ণা আমার মায়ের মৃত্যু সৃষ্টি করেছিল। তখন আমার বয়স এগারো বছর কয়েক

মাস। আমার বড় এক ভাই ছিল, যার বয়স ছিল পনেরো বছর। সেই বেচারা মায়ের মৃত্যুর সাত মাস পরে মারা গেছে। সে ভাগ্যবান ছিল, এজন্য মায়ের কাছে চলে গেছে। আমি একা থেকে গিয়েছি। এ হল আরেক দুঃখ, যা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।...'

'আমার ঘর ছিল অত্যন্ত প্রিয় ঘর। সেখানে মহব্বত ছিল; আনন্দ ছিল; হাসিখেল ছিল। আমার বাবা ছিলেন প্রাণবন্ত মানুষ। আমি সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং প্রতিপালিত হয়েছিলাম। যেসব ঘরে আদর-ভালোবাসা নেই, সেখানে শিশুরা কীভাবে জীবিত থাকে, তা আমি জানতাম না। পড়ালেখা করার বড় সখ ছিল আমার। আমি পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। যখন পাকিস্তান হয়, তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তাম। আমাদের মহল্লায় হিন্দুদের দশবারোটি ঘর ছিল। তারা সবাই ইন্ডিয়া চলে গেল। মহল্লার মুসলমানরা তাদের আসবাবপত্র নিয়ে গেলেন। যে যেটা হাতের নাগালে পেলেন, নিয়ে গেলেন। অল্প কিছুদিন পর এসব ঘর আবাদ হতে লাগল। দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুর অনুভূতি এতটা জাগ্রত থাকে না; কিন্তু হিন্দুদের খালি বাড়িতে যেসব মুসলমান এসে আবাদ হলেন, তারা সেই বয়সেই আমার অনুভূতি জাগ্রত করে দিলেন। আমার এখনও মনে আছে এবং সারা জীবন আমি মনে রাখব যে, এসব লোক কী অবস্থায় এবং কেমন চেহারায় আমাদের মহল্লায় প্রবেশ করেছিলেন। এরা ছিলেন ইন্ডিয়ার মুহাজির। তাদের সাথে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশের উর্দিপরা দুইতিন জন লোক এবং শহরের আরেক ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে তাদেরকে আবাদ করার জন্য আনা হয়েছিল।...'

গলির মধ্যে হট্টগোল শুরু হলে আমি দৌড়ে বের হয়ে গেলাম। ছোট একটি কাফেলা আসছিল। আগে আগে যেসব লোক ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তার একটি হাত ছিল মাথার উপর। কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত পট্টি জড়ানো ছিল। তার সবগুলো পট্টি রক্তে লাল ছিল। আরেক জনেরও মাথায় পট্টি ছিল এবং পা দুটি যখম ছিল। তিনি ভালো করে হাঁটতে পারছিলেন না।

তার পেছনে তিনটি শিশু ছিল আমার বয়সের। আরও তিনটি শিশু ছিল তাদের চেয়ে ছোট এবং তাদের মধ্য থেকে দুটি ছিল মেয়ে শিশু। একটি মেয়েকে দুটি শিশু ঠেঁস দিয়ে রেখেছিল। তার জামা ছিল ফাটা এবং রক্তে লাল। তার একটি পায়ে পট্টি জড়ানো ছিল। অঝোরে কাঁদছিল সে। তাদের সঙ্গে ছিল সাত জন মহিলা। সবাই কাঁদছিল। শুধু দু'জনের মাথায় দুটি পট্টি। তাদের সবার মাথায় ছিল মাটি মাখানো। চেহারা তাদের লাশের মত শুকিয়ে গিয়েছিল। তাদের সাথে যুবতী মেয়েরাও ছিল, যাদের চেহারা ছিল ওড়না দিয়ে ঢাকা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা হাঁটতে পারছিল না। কাঁদছিল তারাও। ফোঁপাচ্ছিল। দু'জন যুবককে অপর দু'জনকে পীঠে বহন করছিল। তাদের হায় হায় আজও আমার মনে আছে।...'

'তাদের মধ্যে বুড়ো মানুষও ছিলেন। তাদের পেছনে আবার মহিলা ছিল; শিশু ছিল। এক মহিলা একটি শিশুকে বুকে লাগিয়ে রেখেছিলেন। তার বয়স এক বছরের চেয়ে কম হবে। সব শিশুটির পুরো মাথা তার মা ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন এবং ওড়না ছিল রক্তে লাল। পরে জানা গেল, শিশুটি ছিল মৃত। শিখরা এই নিষ্পাপ শিশুর মাথা ছোরা দিয়ে দুই ভাগ করে দিয়েছিল। মা মৃত বাচ্চাকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। ... এই কাফেলা পিঁপড়ার মত মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছিল। সেই মহিলা ফুপিয়ে কাঁদছিলেন, যিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুর লাশ বহন করছিলেন। অন্য মহিলারাও কাঁদছিলেন এবং পুরুষদেরও অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাদের চোখেমুখে ভীতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। মহল্লার লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে যার যার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহিলারা প্রাচীরের উপর দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখছিলেন এই দৃশ্য। মুহাজিরদের এই কাফেলা অসহায় আর সন্ত্রস্ত নেত্রে সবাইকে দেখছিল এবং পা হিঁচড়ে এগিয়ে চলছিল। হিন্দুদের বাড়িগুলোতে ভাগ হয়ে গেল এই কাফেলা এবং অদৃশ্য হয়ে গেল গলি থেকে।...'

'আমি পরে জানতে পেরেছি, এরা কারা এবং কোত্থেকে এসেছেন। তখন আমি মনে করেছিলাম, এরা কোন জায়গার নির্যাতিত লোক। জালেমরা, সম্ভবত ডাকাতরা এদের কাফেলা লুট করেছে এবং

এদেরকে যখম করে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই বয়সে আমি এতটুকুই বুঝতাম যে, মানুষের উপর জুলুম শুধু ডাকাতরাই করে থাকে। আমি ছিলাম শিশু। আমার মধ্যে কোন আবেগ উঠেছিল, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনেক অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। ছোট ছোট শিশুদের যখম আমার হৃদয়কে যখম করে দিয়েছিল। আমি তখন মনে মনে বলেছিলাম, আমি বড় হয়ে অনেক শক্তিশালী হব এবং ডাকাতদেরকে মেরে ফেলব।'

সন্ধ্যায় যখন আমার বাবা ঘরে এলেন, তখন তাঁকে ওই লোকগুলো সম্পর্কে এত প্রশ্ন করলাম যে, তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন; কিন্তু আমার অস্থিরতা আর উত্তেজনা তিনি এড়াতে পারলেন না। তিনি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি আমাকে বাতালেন যে, এই দেশ, যেখানে আমরা থাকি তা হল পাকিস্তান। পাকিস্তান হচ্ছে খোদা, রসুল ও কুরআনের দেশ। আমরা ছোট ছোট শিশুরা চাঁদ-তারার পতাকা হাতে নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতাম। কিন্তু এ ছিল আমাদের খেলা। আমরা বড়দের সমাবেশ দেখে তাদের অনুসরণ করতাম। তখনও আমরা পাকিস্তানের গুরুত্ব বুঝতাম না। আমার বাবা যখন আলোচনা করলেন যে, ইন্ডিয়ার হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের ঘরবাড়ি লুট করেছে; জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। আর এরা যারা আমাদের মহল্লায় হিন্দুদের বাড়িতে এসে উঠেছেন, তারা ইন্ডিয়া থেকে জান বাঁচিয়ে এসেছেন। তখন আমার কাছে মনে হল যেন আমার শরীরে কোন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে এবং আমি ভষ্ম হয়ে গেছি।'

বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। আমি তার চেহারা দেখলাম। তাতে রাগ আর উদ্বেগের রং এসে পড়েছিল। তিনি হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করলেন এবং অস্থির হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। সোফার উপর বসে ছিলেন তিনি। সোফার উপর ঘুষি মেরে এবং দাঁত পিষে তিনি বললেন, 'হিন্দু আর শিখরা ওই নিষ্পাপ শিশুগুলোকে যখম করেছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে হত্যা করেছিল তারা। যীবী! আমি খুব ছোট ছিলাম। আমি কিছুই করতে পারতাম না। আমি বড়দের কথাবার্তা

বুঝতেও পারতাম না। কিন্তু আমার মধ্যে জযবা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমি হিন্দু আর শিখদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি এবং আমি সবকিছু বুঝতে পারি। আমার এও মনে হয়েছিল যে, আমাদের মহল্লার হিন্দু আর শিখরা বড় আরামে এখান থেকে চলে গেছে। আমাদের মহল্লার মুসলমানরা তাদের সাথে সামান্য দুর্ব্যবহারও করেননি। তারপরও হিন্দু আর শিখরা ইন্ডিয়াতে তাদেরকে হত্যা করল কেন? তাদেরকে যখম করে ওখান থেকে কেন বের করে দিল?'

তিনি আমাকে নতুন কোন কথা শোনাচ্ছিলেন না। তিনি পাকিস্তানে মুহাজিরদেরকে দেখেছিলেন। আর আমি ছিলাম সেই মুজাহির, যে হিন্দু ও শিখদের পাষণ্ডতার শিকার হয়ে এসেছিল। দাঁত পিষে পিষে তিনি বলছিলেন, আর আমি শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, 'আমার মহল্লার লোকজন মুহাজিরদের অনেক খাতিরতোয়াজ করলেন। তাদেরকে বাসনকোসন, বিছানাপত্র ও কাপড়চোপড় দিলেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন ঘর থেকে তাদের ঘরে খাবার-দাবার যেতে থাকল। তাদের শিশুরা আমাদের সাথে মিলে মিশে গেল। কিছু আমাদের স্কুলে ভর্তি হল। তাদের উপর দিয়ে কী অতিবাহিত হয়েছিল, আমরা স্থানীয় শিশুরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, তখন তারা এমনসব ঘটনা শোনাত, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। প্রথম দিকে কিছুদিন এমন অবস্থা ছিল যে, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, তারা কীভাবে এসেছে, তখন ভয়ে কোন কোন শিশুর চিৎকার বের হয়ে পড়ত। কোন কোন শিশু কাঁদতে শুরু করত। আর যেসব শিশু কিছুটা সাহসী ছিল, তারা অনুনয় করে বলত, জিজ্ঞেস কোরো না। আমাদের উপর দিয়ে যা অতিবাহিত, তা শোনানোর মত নয়।...'

'তুমিও যীবী! ওই বয়সেই এসেছিলে না? তুমি আমাকে হিন্দু আর শিখদের অত্যাচারের যেসব কাহিনী শুনিয়েছিলে, তার চেয়েও ভয়ানক কাহিনী আমাদেরকে ওই শিশুরা শুনিয়েছে। এক শিশু বলেছিল, শিখরা তার সামনে তার যুবতী বোনকে তুলে নিয়ে গেছে। প্রত্যেক শিশুর পরিবারের দুইতিন জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনটি শিশু ছিল

এমন, যাদের মধ্য থেকে দু'জনের দুগ্ধপোষ্য ভাইদেরকে শিখরা জ্বলন্ত বাড়ির অগ্নিশিখার মধ্যে জীবিত নিক্ষেপ করেছিল।' বলতে বলতে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং আচানক আমাদের মত ফুপিয়ে উঠে বললেন, 'দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে যীবী! আমাদের শিশুদেরকে ইন্ডিয়ার কাফেররা আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।' তিনি নিজের হাতের তালুতে ঘুষি মেরে বললেন, 'আমি ভুলতে পারব না। আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমি যেই ফৌজের ক্যাপ্টেন, সেই ফৌজ ভুলতে পারে না যে, ইন্ডিয়াওয়ালারা আমাদের অবুঝ শিশুদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। শিশুদের মাথা ছোরা আর বর্ষা দিয়ে ভাগ করেছিল। আমাদের যুবতী বোনদেরকে শিখরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অমৃতসরের বাজারে মুসলমান মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে মিছিলের আকারে ঘুরানো হয়েছিল।'

এ সময় তার আওয়াজ খুব তেজস্বী আর উঁচু হয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, লড়াই হচ্ছে মনে করে কেউ কামরার মধ্যে এসে পড়বে না তো? তিনি নিজে মুহাজির ছিলেন না; কিন্তু মুহাজিররা তাকে দিওয়ানা করে দিয়েছিল। তার আবেগের এই টগবগে অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে পড়ল। তার সুন্দর চোখ দুটি লাল হয়ে গিয়েছিল। খুব তীব্রভাবে আমার নিজের হিজরতের কাহিনী মনে পড়েছিল।

তিনি বলছিলেন, 'সেই বয়সেই আমার মধ্যে প্রতিশোধের আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। আমি আবেগের উপরই বড় হতে থাকলাম।... আমি সপ্তম শ্রেণিতে উঠেই সিয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন এক মুহাজির সহপাঠী আমাকে তার হিজরতের কাহিনী শোনাল। তাদের কাফেলার উপর শিখরা হামলা করেছিল এবং অসংখ্য মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। শিশুরা ফসলক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিছু কিছু নারীকে শিখরা ওখানেই লাঞ্ছিত করতে শুরু করেছিল। আচানক পাকিস্তানের দিক থেকে ফৌজী ট্রাক উপস্থিত হয়। তা থেকে সৈনিকরা নেমে শিখদের উপর গুলি চালানো শুরু করে। এক সিপাহী শিখদেরকে কঠিনভাবে মারধর করেছিলেন। তাদের উপর সৈনিকরা মেশিনগান ফায়ার করেছিলেন। যেসব মুহাজির শিখদের নাগাল থেকে বেচে

গিয়েছিলেন, তাদেরকে সৈনিকরা ট্রাকে ভরে পাকিস্তানে নিয়ে আসেন।...'

'আমি পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম যে, এ ছিল পাক সেনাবাহিনীর এক বালুচ রেজিমেন্ট, যারা মুহাজিরদেরকে নিজের হেফাযতে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল। অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এই রেজিমেন্ট। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর যখন আমি শুনলাম যে, আমাদের সৈনিকরা মুহাজিরদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের খুনের বদলাও নিয়েছেন, তখন আমি নিজেকে তৎক্ষণাৎ খাকী উর্দীতে দেখতে শুরু করলাম। পড়াশোনার আগ্রহ আগের চেয়ে বেড়ে গেল। এই আগ্রহ বৃদ্ধির পেছনে আমার বাবার অনেক বড় হাত ছিল। আমি তাঁর কাছে ইন্ডিয়া, হিন্দু ও শিখদের সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করতাম। তাঁকে আমি বলতাম, আমি সৈনিক হব। বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন, বেটা! মন দিয়ে পড়ো, তা হলে তুমি সেনাবাহিনীর অফিসার হতে পারবে। তিনি আমার মস্তিষ্কে বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দু আর শিখ আমাদের বড্ড পুরনো দুশমন এবং তারা আমাদের দেশ জয় করে ইন্ডিয়ার সাথে মেলাতে চায়। আমি হিন্দু ও শিখদেরকে কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতে লাগলাম এবং আমি আজও তাদেরকে কুকুরের সমকক্ষই মনে করি।...'

'কিন্তু যীবী! সেই বাবা, যিনি আমাকে বলতেন যে, হিন্দু তোমাদের দুশমন, তিনি নিজে আমার দুশমন হয়ে গেলেন। এই বিবর্তন ঘটে এভাবে যে, আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিশ দিন অসুস্থ থাকার পর মারা যান। এতে আমার ভালোবাসা মারা যায়; আমার শৈশব মারা যায়। নির্জনে আমি মাকে খুঁজতাম। আমি কাঁদতাম। আমার হেঁচকি বন্ধ হয়ে যেত। বাবা আমাকে বুকে চেপে ধরতেন। তিনি আমার মায়ের শূন্যতা পূরণ করার জন্য অনেক চেষ্টা করতেন। কিন্তু মায়ের বিকল্প মা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আমার বড় ভাইয়ের বয়স ছিল পনেরো বছর। তাকে মনে হত স্তব্ধতা পেয়ে বসেছে। সে কাঁদতও না এবং কথাও বলত না। হাস্যোজ্জ্বল দূরন্ত

ছেলেটি সবসময় চুপ থাকত। আমি কাঁদলে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিত। আমার মাথায় হাত বোলাত; কিন্তু কিছু বলত না। কখনও কখনও আমার মুখে চুমো দিত।...'

এই নীরবতার মধ্য দিয়ে ছয় মাস চলে গেল। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সে। বাবা তাকে শক্তিবর্ধক বিভিন্ন ওষুধ খাওয়ালেন। অনেক ডাক্তার দেখালেন। কিন্তু দুঃখের চিকিৎসা কোন ডাক্তার করতে পারে না। এক সকালে সে খাট থেকে উঠলই না। চোখ মেলে আমাদেরকে দেখছিল। তার চোখ ছিল শুষ্ক। চেহারায় ব্যথা অথবা কষ্টের কোন চিহ্ন ছিল না। বাবা তাকে উঠানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার তাকে একটি ইনজেক্শন দিলেন। কিন্তু তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। মহল্লার এবং আমাদের সমাজ ও খান্দানের মহিলারা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভিতর থেকে আমি বাবার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে মহিলাদেরও কান্নার রোল শুরু হয়ে গেল। আমি দৌড়ে ভিতরে গেলাম। মহিলারা ভাইয়ের খাটের চারদিক ঘিরে রেখেছিল। আমি ভিড় ঠেলে সামনে গেলাম। এক মহিলা আমার ভাইয়ের চোখ বন্ধ করছিলেন। তখন আমার ভাইয়ের প্রাণপাখি উড়ে গিয়েছে।'

তার চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল। তিনি বলতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু আওয়াজ বের করতে পারলেন না। এরপর তিনি ফোপাতে লাগলেন এবং সোফা থেকে উঠে আস্তে আস্তে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে ছিল অন্ধকার। কিছুক্ষণ তিনি আঁধারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি কোন নারীর সামনে কাঁদতে চাইতাম না; কিন্তু যীবী! তুমি আমাকে এমন ভালোবাসা দিয়েছ, যার মধ্যে মায়ের ভালোবাসার অনুভব আছে। হয়তো এর ফলেই বন্ধন ছিঁড়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ছে।'

'চোখের এই পানি বের হয়ে যেতে দাও।' আমি বললাম, 'আমিও চোখের পানি বন্ধ করে রেখেছিলাম; কিন্তু তা অঙ্গার হয়ে আমাকে ভস্ম করে ফেলছিল।'

'আমার জীবন তিন জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। ঘর, স্কুল ও কবরস্তান।' তিনি বললেন। 'ঘরের উপর আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাবা আমাকে একা থাকতে দিতেন না; কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। আমি আর ভাইকে ভুলতে পারতাম না। আমি জানতাম না যে, সবর কাকে বলে, আর জবর কী জিনিস?...'

আমি কারও ছেলে নই

'সাত আট মাস পরে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। বিয়ে করলেন এক যুবতী মেয়েকে। বিয়ের পর আমাদের ঘরে সেই ড্রামা শুরু হয়ে গেল, যা তুমি হাজার বার শুনে থাকার কথা। সৎ মা আমাদের সোসাইটির এমন সম্পদ, যার ব্যাপারে কেউ অনবগত নয়। আমার সৎ মায়ের মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ ছিল না যে, যে দেখবে তার উপর প্রাণ উৎসর্গ করবে। একজন সাধারণ নারী ছিলেন তিনি। কিন্তু নিজেকে অনেক বেশি খুবসুরত মনে করতেন। এ ছিল এক সমস্যা। আরেক সমস্যা আমার বাবার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। মহিলার চেয়ে বাবা আঠারো বিশ বছরের বড় ছিলেন; কিন্তু তার মোকাবেলায় বাবা নিজেকে বুড়ো মনে করতেন। বাবা প্রথম দিন খুব আদর করে বলেছিলেন, বেটা! দেখো, আমি তোমার জন্য নতুন মা এনেছি। আমার হৃদয় প্রথম দিনই তাকে গ্রহণ করল না। সব শিশুদের মত আমি নিজের মাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি খুবসুরত ও প্রিয় মনে করতাম। সৎ মা বেগানা লোকের মত মাথায় হাত বোলালেন এবং তিনি পুরো ঘর নিয়ন্ত্রণে নিলেন।...'

'কিছু দিনের মধ্যে তিনি আমার বাবাকেও কব্জা করলেন। যে বাবা ঘরে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, এখন তিনি বাইরে থেকে এসে নতুন স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসতেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। তিনি অভ্যাস অনুযায়ী আমাকে প্রথাগত আদর করতেন। যত দিন গড়াতে থাকল, এই প্রথাও খতম হতে থাকল। একদিন আমি তাদের কামরায় গেলাম। তারা একই পালঙ্কে বসে আঙুর খাচ্ছিলেন। সৎ আমাকে কয়েকটি আঙুর দিয়ে বললেন, যাও; খেলো গে। যীবী!

আমি তোমাকে বলতে পারব না যে, আমার ভিতরে কেমন তুফান বয়ে গেল। আমি আঙুর নিলাম না এবং সেখান থেকে নড়লামও না। বাবা আমাকে বললেন, যাও। এখান থেকে যাও। খেলো গে। আমি আঙুর না নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম। দেমাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হলাম এবং চলতে লাগলাম। মন-মস্তিষ্কে এমন দুঃখ সোয়ার হল, আমি কোথায় যাচ্ছি, সে কথা ভাবতেই পারছিলাম না। গলার মধ্যে কোন জিনিস আটকে গিয়েছিল।...'

'চলতে চলতে নির্ভাবনা আর অনিচ্ছায় আমি মায়ের কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমার চেতনা জাগ্রত হল। মায়ের কবর দেখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে একসময় মায়ের কবরের উপর শুয়ে পড়লাম। সেখানেই চোখ লেগে গেল। ঘুম ভাঙলে দেখলাম সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আমি এত সময় কখনও বাইরে থাকিনি। আমি দৌড়ে ঘরে এলাম। বাবা আমাকে শাসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে? আমি বলে দিলাম যে, মায়ের কবরে। বাবা আর কিছু বললেন না। তবে সৎ মা বললেন। এত লম্বা সময় মায়ের কবরে কি কুরআন পড়ছিলে? আমি পরশু দিনও আপনাকে বলেছিলাম যে, এই ছেলেটি আওয়ারা হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা কথাও বলে। আমি মিথ্যার অপবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কেননা, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি। আমি ছিলাম শিশু। ধৈর্য ও সহনশক্তি ছিল কম। আমি ক্ষোভে বললাম, মিথ্যা তুমি বল। কও তো, আমি কবে মিথ্যা বলেছি?...'

'সৎ মা রুষ্ঠ হয়ে বাবাকে বললেন, আপনি দেখলেন তো? আপনি বাইরে গেলে এ আমার সাথে এভাবে বদতমিযী করতে থাকে। বাবা জানতেন যে, আমি এমন বদতমিয নই। কিন্তু তিনি খুব জোরে আমার মুখে থাপ্পড় মারলেন। এটা ছিল বাবার প্রথম থাপ্পড়। এরপর থাপ্পড় বাবার প্রতিদিনের আমলে পরিণত হয়ে গেল। আমি তখন বুঝতে পারতাম না যে, আমার সাথে সৎ মায়ের কীসের শত্রুতা ছিল। বড় হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। শত্রুতার এক কারণ ছিল এই যে,

আমি তার কিছু হতাম না। আর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমার বাবার সামান্য কিছু জমী এবং এই বাড়িটি ছিল। সৎ মা নিজের ছেলেমেয়েকে এগুলোর মালিক বানাতে চাইতেন। এর পন্থা ছিল একটাই। তা হল ঘরকে আমার জন্য জাহান্নাম করে তোলা এবং বাবাকে আমার দুশমন বানিয়ে দেওয়া। যাতে আমি ঘর থেকে পালিয়ে যাই, অথবা বাবা আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেন। এসবই হল। তার স্কিম পুরোপুরি কামিয়াব হল।...'

'জাহান্নামেও হয়তো কোন স্বস্তি পাওয়া যাবে। বাড়িতে আমার কোন স্বস্তি থাকল না। সৎ মা বাবার মনমস্তিষ্ক ও রগরেশার উপর সোয়ার হলেন। সৎ মা আমাকে ঘরের চাকর বানালেন। আমার চাকুরির চিত্র ছিল এই যে, আমি ঘরও ঝাড়– দিয়েছি; বাসনকোসনও ধুয়েছি এবং যখন সৎ মায়ের প্রথম বাচ্চা হয়, তখন আমি তার নোংরা কাপড়চোপড়ও ধুয়েছি। আমাকে যদি ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা না হত, তা হলে চাকরের এসব কাজ খুব খুশি ও আনন্দের সাথে করতাম। কিন্তু আমাকে এমন চাকরের স্তরে নামানো হয়েছিল, যে কামচোর এবং শাসন, মারপিট ও গালাগালি ছাড়া কাজ করে না। আমার মস্তিষ্কে আমার মায়ের স্মৃতি দিনদিন তাজা হচ্ছিল এবং ভালোবাসার তৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছিল। আমি খোদার লাখ লাখ শোকর আদায় করছি। কেননা, এমনসব পরিস্থিতিতেও আমার অন্তর থেকে পড়াশোনার আগ্রহ বের হয়ে যায়নি। আমি আমার মত শিশুদেরকে দেখেছি, যারা মায়ের মৃত্যুর পর সৎ মায়ের রোষানলে পড়ে আওয়ারা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বভাবগত অপরাধী হয়েছে। কিন্তু আমি স্কুল আর বইপুস্তকের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিলাম এবং জুলুম-অত্যাচার সইতে সইতে দশম শ্রেণি পাশ করলাম। আমি তোমাকে সব কাহিনী বললাম না। অন্যথায় দুইদিন লাগাতার শোনাতে থাকলেও আমার কাহিনী শেষ হবে না।...'

'আমি কলেজে ভর্তি হতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু সৎ মা অনুমতি দিলেন না। এজন্য বাবাও পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দিলেন এবং বললেন, কোথাও চাকুরি অনুসন্ধান করো। আমি এই নাদিরশাহী হুকুম মানতে

অস্বীকার করলাম। ফলাফল স্পষ্ট। বাবা আমাকে মারপিট করলেন। সৎ মা জ্ঞানী মানুষের মত আমাকে উপদেশ ও নসিহত করলেন। বললেন, দেখো, তোমার বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। এখন চাকুরি করো এবং বাবার সহযোগিতা করো। এরা দু'জন চিন্তাই করতেন না যে, ষোলো বছর বয়সে কোথায় চাকুরি পাওয়া যেতে পারে। এ নিয়ে ঘরে অনেক শোরগোল হল। একদিন সৎ মা ঘরে একা ছিলেন। তিনি আমাকে চাকুরি খুঁজতে বললে আমি পরিষ্কার ভাষায় নিজের ফায়সালা শুনিয়ে দিলাম। বললাম, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বার বার এই কথা আমি বলব না। আপনি আমাকে কোন হুকুম দিবেন না। আপনার আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এই ঘর থেকে চলে যাব। আমাকে যে বাপের সহযোগী হতে বলছেন, তিনি আমার বাপ নন; আপনার স্বামী। আজ সন্ধ্যায় যখন তার কাছে আমার অভিযোগ পেশ করবেন, তখন তাকে একথাও বলে দিবেন যে, এখন এই ছেলে জোয়ান হয়েছে। এখন তার উপর হাত তুললে সে তোমার হাত ভেঙে দিবে।...'

'হতভাগা মহিলা ভয় পেয়ে গেলেন। আমি তাকে বললাম, আপনাদের দু'জনের কাছ থেকে নিজের হক ছিনিয়ে নিতে আমাকে মজবুর করবেন না। আপনি আমার মায়ের জায়গা দখল করেছেন। আমার মায়ের কাপড় পরিধান করেছেন। আমার মায়ের গয়না-অলঙ্কারের মালিক হয়ে বসেছেন। আমার ঘরে থাকেন, আর আমাকে ভয় দেখান? এভাবে আমি তাকে হয়রান পেরেশান করে বাইরে বের হয়ে গেলাম। আমার খালা ছিল। খুব আদর করতেন। খালু বেনজির ইনসান। তারা আমাকে কয়েক বার বলেছিলেন, আমি যেন তাদের কাছে থাকি। কিন্তু নিজের মায়ের চৌহদ্দি থেকে বের হতে চাইতাম না। আমি খালার কাছে চলে গেলাম। খালু ঘরেই ছিলেন। আমি তাদেরকে একথা শোনালাম। তারা উভয়ে বললেন, যদি এরা তোমাকে কষ্ট দেন, তা হলে আমাদের কাছে চলে এসো। ওখানে সাহস পেলাম।...'

'আমি হাঁটতে হাঁটতে আরও দূরে চলে গেলাম। একটি মাঠে দুটি টিম ফুটবল খেলছিল। একটু উপরে কয়েক জন নওজোয়ান ব্যায়াম

করছিল। তাদের ওয়েট ছিল, ডাম্বেল ছিল এবং ব্যায়ামের অনেক আসবাব ছিল। আমি সেখানে চলে গেলাম। এটা ছিল ক্লাব। আমার মস্তিষ্কে শৈশবের স্মৃতি তাজা হয়ে গেল। আমি সৈনিক হওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। আমি এই ক্লাবের মেম্বারশিপ নিলাম এবং সেখানে ব্যায়ামের জন্য যেতে লাগলাম। খেলতে লাগলাম ফুটবলও। একই সাথে ক্লাবের এক মেম্বারের নির্দেশনায় এফএ'র প্রাইভেট প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। সতেরো পেরিয়ে তিনচার মাস হয়ে গেল আমার বয়স। ঘরে বাবার সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকত। সৎ মাকে আমি নিজের প্রভাবের বলয়ে এনে ফেলেছিলাম। তিনি এখন আর আমার উপর শাসন চালাতেন না। তবে দংশন করতেও ছাড়তেন না। আমি ঘরের কামকাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাবার সাথে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তা হলে ঝগড়া হত।...'

'একদিন আমি সৎ মার কাছে পাঁচ টাকা চাইলাম। তিনি টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বকা দিলেন। আমি তাকে তার চেয়েও চেতা বকা দিলাম। বাবা অন্য কামরায় ছিলেন। তাকে শোনানো এবং তাকে খেপানোর জন্য সৎ মা কাঁদতে শুরু করলেন। গালাগালিও করতে থাকলেন। বাবা দৌড়ে বাইরে এলেন। সৎ মা মিথ্যা বললেন যে, তোমার এই বদমায়েশ ছেলে আমাকে নগ্ন গালাগালি দিয়েছে। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। আমার দেহে তখন শক্তি ছিল। আমি সৎ মায়ের মুখে খুব জোরে থাপ্পড় মারলাম। তিনি ঘুরতে ঘুরতে দরজার সাথে গিয়ে ধাক্কা খেলেন এবং পড়ে গেলেন। বাবা ছিলেন আমার পেছনে। তিনি আমার মাথার চুল মুষ্ঠিবদ্ধ করে ধরলেন এবং ঠাস করে আমার মুখের উপর থাপ্পড় মারলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, তিনি আমার বাবা। যেমন তুমি বলেছিলে, আমি কারও মেয়ে নই, তেমনইভাবে আমিও 'আমি কারও ছেলে নই' বলে মনকে শক্ত করেছিলাম। আমি সর্বশক্তি ব্যয় করে বাবার মুখে একটা ঘুষি মারলাম। এটা ছিল সেই যুবকের ঘুষি, যে এক বছর শারীরিক কসরত করেছিল। তা ছাড়া এই ঘুষি আর সেই থাপ্পড়, যা আমি সৎ মায়ের মুখে মেরেছিলাম, তার মধ্যে পাঁচ বছরের ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল।...'

'সৎ মা মেঝেতে শুয়ে চিৎকার করছিলেন। তার দুটি বাচ্চা কাঁদছিল। আর বাবাকে দেখলাম, তিনি উঠছিলেন। তিনি বললেন, আমি এখনই তোমাকে হাজতে আটকে দিচ্ছি। আমি চুপ ছিলাম। আমার হাত, আমার ঠোঁট এবং আমার সারা দেহ কাঁপছিল।'

এসব কথা বলতে বলতে তার আওয়াজ কান্নার মধ্যে ডুবে গেল। ক্ষীণ আওয়াজে তিনি বললেন, 'আমি নিজের বাপকে মেরেছিলাম। নিজের বাপকে...। যীবী! কখনও কখনও যেমন ঘুষি বাবাকে মেরেছিলাম, তেমন ঘুষি নিজের হৃদয়ের উপর পড়তে থাকে এবং পাপের অনুভূতি আমার অবস্থা খারাপ করে দেয়। বাপের উপর হাত তোলা অনেক বড় গুনাহ। কিন্তু আবার যখন ভাবি, বাবা আমার সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন, তখন মনে হয়, যা করেছিলাম ঠিকই ছিল।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন তিনি এবং দীর্ঘ শ্বাস ফেলতে লাগলেন। 'এখন ওই ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমি ঘর থেকে বের হলাম। কিছু দূর পর্যন্ত সৎ মায়ের চিৎকারের আওয়াজ ও গালাগালি এবং তার বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ কানে আসতে থাকল। মহল্লার কয়েক জন মহিলাকে দেখলাম, তারা দৌড়ে আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। আমি দ্রুত পা ফেলে গলি পার হয়ে গেলাম। খালার বাড়িতে গিয়ে হাযির হলাম। আমি কী করেছি, সেকথা তাকে জানালাম। কারণও তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। তাকে বললাম, 'আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমি কোথাও চাকুরি খুঁজতে যাচ্ছি। খালা আমাকে যেতে বাধা দিলেন এবং আমাকে তার কাছে থাকতে বললেন। কিন্তু আমি মানলাম না। খালা আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন এবং আমি একটি জামা আর পায়জামা পরে নিজের শহর থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।...'

'মস্তিষ্ক ছিল আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মানসিক অবস্থা ছিল অগ্নিশিখার মত। কখনও আমার চোখে পানি আসছিল এবং রাগ হচ্ছিল। তখন ছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সামরিক আইনের যামানা। আমি শুনেছিলাম, সেনাশাসন সবার সাথে ইনসাফ করে। আমি এই ইচ্ছায় রাওয়ালপিন্ডির টিকিট নিলাম যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে

যাব এবং তার কাছে গিয়ে বলব, একজন সৎ মা যিনি আপনার শাসনকালে আমাকে সম্পত্তি থেকে, আমার বাবা থেকে এবং বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। আমি পড়তে চাই; কিন্তু আমাকে ঘরের চাকর বানানো হচ্ছে। এ ছিল মূর্খতাসুলভ ইচ্ছা। ওই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবেই ভাবতেন। আমিও এমনই কিছু ভাবলাম এবং রাওয়ালপিন্ডিগামী গাড়িতে চড়ে বসলাম।...'

'ওই বগিতে চারজন সৈনিক ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন নায়েক ছিলেন। আমি তাদের পাশে বসলাম। সাথে সাথে আমার মস্তিষ্ক শৈশবে গিয়ে পৌঁছল। মুহাজিরদের ছেলেমেয়েকে দেখে আমি বলেছিলাম, বড় হয়ে সৈনিক হব এবং হিন্দু ও শিখদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব। আমি কিছু স্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম এবং দেমাগ স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি সৈনিকদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। কথা বলার কৌশল আমার আয়ত্তে ছিল। খোদা দেহও দান করেছিলেন সুন্দর। আমি তাদেরকে বললাম, আমি ফৌজে ভর্তি হতে চাই। আমি তাদেরকে একথাও বললাম যে, আমি শুধু চাকুরি চাই না। আমার মধ্যে একটি আবেগ আছে। আমি তাদেরকে শৈশবের কথাবার্তা বললাম এবং মুহাজির শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করলাম। সৈনিকদের মধ্যে দু'জন মুহাজির ছিলেন। তারা আমার কথা শুনে প্রভাবিত হলেন। নায়েক বললেন, তুমি সিপাহি র‍্যাংকে কেন ভর্তি হবে। চেষ্টা করো এবং সোজা কমিশন নিয়ে ফেলো।...'

'আমার তো কিছুই জানা ছিল না যে, ফৌজে দাখিল হওয়ার কী কী পন্থা আছে। নির্দেশনার জন্য আমি তাদেরকে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তারা বললেন, কমিশনের পরীক্ষা যোগ্যতার বিচারেও পাশ করা যেতে পারে এবং সুপারিশের জোরেও। আমি তাদেরকে বললাম, আমি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছি। তাদেরকে সব কথা জানিয়ে দিলাম। আমার কথাবার্তা আর ভঙ্গিতে কোন ডর, ভয়, সংকোচ ও বিনয় ছিল না। স্বনির্ভরতা ও সাহসের সাথে কথাবার্তা বলছিলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে পুরো কাহিনী শোনাব।...'

'হেসে ফেললেন তারা। বললেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব নয়। রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছতে পৌঁছতে তারা চার জন আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। স্টেশন থেকে বাইরে আসতে লাগলে নায়েক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কোথায় যাব? আমি তাদেরকে জানালাম, আমার কোন ঠিকানা নেই। একথা তো চিন্তাও করিনি। আকস্মিকতা দেখো, সেই নায়েক এখন আমার ব্যাটালিয়নের হাবিলদার মেজর। তুমি হয়তো এসব পদ বোঝ না। তিনি আমার অধীন। রাওয়ালপিন্ডিতে আমার কোন ঠিকানা নেই শুনে তিনি আমাকে বললেন, রেল স্টেশনের সাথে ছোট ছোট যে হোটেলগুলো আছে, সেখানে রাত কাটাও এবং কাল আমার কাছে এসো। তিনি ঠায়ঠিকানা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন এবং তারা চার জন চলে গেলেন।...'

'সেগুলো হোটেল আর কী ছিল? ছিল রুটি বিক্রেতাদের দোকান। তারা দোকানের সামনে খাট ফেলে রেখেছিল। আমি একটি দোকানে রুটি খেলাম এবং সড়কের পাশে খাটে শুয়ে পড়লাম। সকালে নাস্তা সেরে ছাউনিতে চলে গেলাম। রাস্তায় চলতে চলতে নায়েকের ব্যারাকের ঠিকানা দেখিয়ে দেখিয়ে এবং রাস্তা জিজ্ঞেস করে করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তুমি যীবী! সৈনিকদের ব্যাপারে তুমি জান না। তারা খুব অতিথিপরায়ণ এবং যবানে পাকা। তিনি আমার খাতিরতোয়াজ করলেন নিজের সুবেদার মেজরের কাছে নিয়ে গেলেন। এই সুবেদার তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। নায়েক তাকে আমার ব্যাপারে সমস্ত কথা জানিয়ে বললেন আমাকে কমিশনের পরীক্ষায় বসিয়ে দিতে। সুবেদার মেজর তার এক অফিসারের সাথে কথা বললেন এবং আমাকে ভর্তিদপ্তরে পাঠালেন। আগে আমার মেহনত ছিল। যার ফলে আমার মধ্যে কিছুটা যোগ্যতা এসেছিল।...'

'তিন দিন পর আমাকে পরীক্ষার জন্য ডাকা হল। এরপর এক মেজর আমার পরীক্ষা নিলেন। তিনি প্রশ্ন তা-ই করলেন, যা হয়তো প্রত্যেক প্রত্যাশীকে করা হয়। কিন্তু আমি নিজের বুকের সমস্ত ধুলো তার সামনে রাখলাম। তার একটি কথা আমি সবসময় মাথায় রেখেছি। তিনি বললেন, দেখো ছেলে! আমি তোমার সমস্ত কথা শুনেছি। কিন্তু

নিজের মনোভাবের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করো। তোমার মনোভাবের মধ্যে অনেক বেশি আবেগ রয়েছে। সৈনিক হিসেবে এটা একটা ত্রুটি। আবেগ আমাদের থাকা চাই; আবেগে ভরা উচ্ছ্বাস থাকা চাই না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। আমরা যাকে ডিসিপ্লিন বলে থাকি। সেনাবাহিনীর জন্য এমন ব্যক্তি ক্ষতিকর, যার রাস্তার মধ্যে কুয়া এসে গেলে সে দায়িত্ব আদায়ের আবেগে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দেয়। সেনাবাহিনী ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করে, যে লম্ফ দিয়ে কুয়ার ওপারে চলে যায় এবং রাস্তা অবলম্বন করে।...'

'তার উপদেশ আমার অনেক উপকার করেছে। আমি টেস্ট পাস করলাম; কিন্তু সিলেক্শন বোর্ডের কল আসার জন্য আমাকে রাওয়ালপিন্ডিতে বড় কষ্টকর ও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হল। তিনচার দিন রুটির দোকানে কাটাতাম এবং তিনচার দিন নায়েকের মেহমান থাকতাম। এভাবে সময় কটিল এবং একদিন নায়েকের মাধ্যমে আমার কল এল। আমি তারই ঠিকানা দিয়েছিলাম। সিলেক্শন বোর্ডের টেস্ট আজব ধরণের এবং কঠিন। সেখানে মানসিক ফূর্তির প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল দৈহিক ফূর্তিরও। আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন। আমি পরীক্ষা পুরোপুরি উতরে গেলাম। যখন সিলেক্শন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে আমার ইন্টারভিউ হয়, তখন আমি তাকে নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে দিই। যা হোক, আমি নির্বাচিত হয়ে গেলাম। চব্বিশ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে শুধু আমরা তিন নির্বাচিত হলাম।...'

'কাকুল একাডেমীতে গেলাম। এরপর আমার সব অসুবিধা দূর হয়ে গেল। ট্রেনিং এত কঠিন ছিল যে, কোন কোন ক্যাডেট, যারা আমীর ঘরানার শাহযাদা, কেঁদে ফেলতেন। কিন্তু এই ট্রেনিঙে আমি এক মানসিক স্বস্তি অনুভব করতাম। আমি পড়াশোনা অব্যাহত রাখলাম এবং দৈহিকভাবে নিজের মধ্যে ঘোড়া আর বানরের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করলাম। আমার আর কোন আকর্ষণ ছিল। মঞ্জিলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ট্রেনিঙের সময় বাবার কথা বারবার মনে পড়ত। মায়ের স্মৃতি তো সবসময় মস্তিষ্কে জাগ্রত থাকতই। একদিন আমি বাবাকে পত্র লিখলাম এবং তাকে সুখবর দিলাম যে, আমি সেনাবাহিনীর

অফিসার হতে চলেছি। যদি তিনি আমাকে মাফ করে দিয়ে থাকেন, তা হলে ট্রেনিঙের পর বাড়ি আসব। তার জওয়াব পড়ে মনে হচ্ছিল যে, সৎ মা কথা বলছেন। বাবা লিখেছিলেন যে, তার ঘরে আমার কোন ঠাঁই নেই। তিনি এই বক্তব্যের মাধ্যমে পত্র শেষ করেছিলেন যে, 'আমার জন্য তুমি মরে গিয়েছ।'...'

'তিনি ঠিকই লিখেছিলেন। তার ছেলে মরে গিয়েছিল। আমি তখন জাতির সন্তান হয়েছিলাম। কিন্তু যীবী! এ ছিল শুধুই আবেগ। আমি নির্জনে কয়েক বার অনুভব করেছি যে, আবেগ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু মহব্বত ও ভালোবাসা ছাড়া জীবন কোন জীবন নয়। কাকুলে ক্যাডেটদের সাথে দেখা করার জন্য তাদের বাপ-চাচা আসতেন। মায়েরা আসতেন। বোনরাও আসতেন। কিন্তু আমার কেউ আসত না। আমার ভিতরে শূন্যতা সৃষ্টি হতে থাকে। সেই শূন্যতা, যা তুমি নিজের প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছিলে। এ থেকে মনোযোগ ফেরানোর জন্য আমি ফৌজী ট্রেনিঙে লিপ্ত হয়ে যেতাম।...'

আল্লাহ আমাকে সেই দিন দেখিয়েছেন, যেদিন ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল। আমি একটি হোটেলে কয়েক দিন ছুটি কাটিয়ে নিজের রেজিমেন্টে চলে গেলাম। এরপর আমি কোথায় গেলাম, কী হলাম, তার প্রতি তোমার কোন আগ্রহ থাকা উচিত নয়। কারও সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব নেই। কেউ আমার অতীত সম্পর্কে অবগত নয়। সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ওঠাবসা করি। কিন্তু কেউ জানে না যে, আমি ভিতরগতভাবে ভষ্মিভূত। আমার দৃষ্টি শুধু ইন্ডিয়ার উপর নিবদ্ধ। একটি ক্ষেত্র অতিবাহিত হয়েছে। রানকুচে যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু আমার রেজিমেন্টকে ওখানে পাঠানো হয়নি। যুদ্ধ শেষ হলে আমাদেরকে বলা হয়েছে, যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। প্রস্তুত থাকো। আমি প্রস্তুত আছি।...'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'একটা বেজে গেছে। এত কথা আমি কখনও বলিনি।'

বিয়ে, দায়িত্ব ও সাড়ে ছয় হাজার টাকা

আমি স্বস্তির দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বললাম, 'এর মতলব দাঁড়াল এই যে, শাদী করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। যদি তুমি পছন্দ করো, তা হলে আমরা জলদি শাদী করে নিতে পারি।'

'করব; কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়।' তিনি বললেন। 'তোমাকে শাদী করতে আমাকে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার একটি মিশন আছে। সেটা পূর্ণ হতে দাও।'

'কেমন মিশন?'

'একথা বলতে পারব না।' তিনি জওয়াব দিলেন। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, নিজের র‍্যাংক ছাড়া আর কিছুই তোমাকে বলব না। একথাও বলব না যে, আমার রেজিমেন্ট কোথায় এবং ছুটি শেষ করে আমি কোথায় যাব?'

'মিশন পূর্ণ করে আসবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আমাকে কতদিন অপেক্ষা করাবে?'

'সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারবে?' মুচকি হেসে বললেন তিনি। 'আমার মিশন এমন যে, জলদিও আসতে পারি। অনেক সময়ও লাগতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তুমি যতদিন জীবিত আছ, আমার অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'সারা জীবন অপেক্ষা করাবে?' আমি বোজা বোজা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'জীবিত থাকলে আসব।' তিনি বললেন। 'এই আশা করি না যে, তোমাকে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে। আমি তোমাকে বন্দী করে যাচ্ছি না। এই ওয়াদা অবশ্যই করব যে, যদি জীবিত থাকি, তা হলে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরে আসব। যেখানেই চলে যাও, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব। আমি তোমাকে ধোঁকা দিব না। আসতে না পারলে তুমি আমার পক্ষ থেকে সংবাদ পাবে যে, আমি কোথায় আছি।'

আমি তার জযবা বুঝে ফেলেছিলাম। এজন্য তার মিশনও কিছুটা বুঝে নিলাম। তিনি বলেছিলেন, রানকুচের লড়াই খতম হয়েছে; যুদ্ধ শেষ হয়নি। হিন্দুস্তানের প্রধান মন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন যে, এখন হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনী মর্জিমত রণক্ষেত্র তৈরি করবে। তার বক্তব্য অনুযায়ী তার রেজিমেন্টের কমান্ডার বলেছিলেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। তিনি ছিলেন সৈনিক। লড়াই তাকে করতেই হত এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল স্পষ্ট। আমি চিন্তা করলাম, এই সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বলেছেন যে, হয়তো তোমাকে সারা জীবন অপেক্ষা করতে হবে। আমার দিল এবং আমার আকল স্পষ্ট করে দিয়েছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি, যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি তার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করব। তারপরও আমি তাকে বললাম, 'আমাকে বিস্তারিত বলতে হবে না। একটু ইঙ্গিত দাও যে, তোমার মিশন কী? তোমার কি লড়তে যেতে হবে?

'তা ছাড়া আর কী হবে?' তিনি বললেন। 'ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে ফুটবল ম্যাচ তো হবে না।' স্বস্তির সাথে দীর্ঘ শ্বাস নিলেন তিনি এবং নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'ইন্ডিয়া; হিন্দু।' আচানক তিনি হাতের তালুতে ঘুষি মেরে বললেন, 'জানি না, আমাদের গভর্নমেন্ট কেন অপেক্ষা করছেন। এই পলিটিক্যাল লিডাররা সবসময় ফৌজকে অপদস্থ করেছে।'

তিনি নিশ্চয় এ্যাবনর্মাল মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি সাধারণ কিসিমের সৈনিক ছিলেন না। তাকে তো আমার কাছে ভালো লাগতই; কিন্তু হিন্দুস্তানের বিপক্ষে তার এই জযবা দেখে গর্ব অনুভূত

হতে লাগল যে, এই ব্যক্তির সাথে আমার মহব্বত রয়েছে এবং ইনি আমার। হিন্দুস্তানের দুশমনী নিয়ে কথা বলছিলেন তিনি, আর আমার মধ্যে প্রতিশোধের সেই জযবা জাগ্রত হচ্ছিল, যা তাকে দিওয়ানা বানিয়ে রেখেছিল। আমি এমন কথা কখনও চিন্তা করিনি। আমার যবানে এমন কথাবার্তা আসেনি। শরাব আর গুনাহে আমি ডুবে গিয়েছিলাম। সেখানে কোন দেশ আর সীমান্ত ছিল না। সেখানে কোন জযবা আর আর মিশন ছিল না। কিন্তু এই লোকের কথাবার্তা এবং আবেগাচ্ছন্ন ভাব আমার মধ্যে তার মত চেতনা জাগ্রত করে দিল। আমি তার কাছে রানকুচের লড়াই সম্পর্কে কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। তিনি যখন রানকুচের কিছু কাহিনী বললেন, তখন মনে হল আমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমি বদলে যাচ্ছি। তারপর আমি এমনও অনুভব করলাম যে, আমার ব্যক্তিসত্তা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে এবং আমার নিজের কোন সত্তা, কোন স্বাতন্ত্র্য এবং কোন অবস্থান থাকছে না।

কথা বলতে বলতে আমরা পালঙে একসাথে শুইলাম এবং ঘুমিয়ে গেলাম। পরের দিন দুপুরের খাবার খেয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি পণ করলাম, এই লোকের জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করব। কিছু বিরূপ বাস্তবতাও ছিল, যেগুলো নিয়ে আমি একটুও ভাবলাম না। যেমন, তিনি চলে গেলে আমি কোথায় থাকব? ওই হোটেলে শুধু পেশাদার নারীহিসেবে থাকতে পারতাম। এখন তো ম্যানেজার এই লোভে আমাকে মুফ্‌ত রেখেছিলেন যে, আমি পুরোপুরিভাবে তার কাছে এসে পড়ব। কিন্তু আমি এখন এই পেশায় ফিরে আসতে চাচ্ছিলাম না। যা হোক, এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা ছিল না। কেননা, আমার ব্যাংকে যথেষ্ট অর্থ ছিল।

পরের দিন তিনি আমার কামরায় এলেন এবং বললেন যে, আগামী কাল তার ছুটি শেষ হয়ে যাবে এবং কাল দুপুরনাগাদ তিনি চলে যাবেন। তিনি কোথায় যাবেন, তা জানালেন না। শুধু বললেন, 'মাসে একদুই দিনের জন্য আসব।' পকেট থেকে তিনি শ' শ' টাকার নোটের বান্ডেল বের করে আমার সামনে রাখলেন এবং বললেন, 'এ

হচ্ছে আমার সারা জীবনের পুঁজি, সাড়ে ছয় হাজার টাকা। এগুলো আমানত নয়। প্রয়োজন হলে তুমি খরচ করতে পারবে।'

এই অর্থ আমি রাখতে চাচ্ছিলাম না। কেননা, আমার দেহের সাথে টাকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অর্থকে আমি সবসময় দেহের পারিশ্রমিক মনে করি। জানতাম যে, তিনি আমাকে দেহের পারিশ্রমিক দিচ্ছেন না এবং তিনি আমাকে বাগদত্তা বানিয়েছেন। তারপরও আমি টাকাগুলো দেখে চমকে উঠলাম এবং পেছনে সরে এসে বললাম, 'উঠাও এসব টাকা। এগুলো আমি ঘৃণা করি।'

'তা হলে আর কাকে দিব?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি এই অর্থের মালিক হতে চাও না?'

আমি সাথে সাথে সতর্ক হলাম এবং কেন টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলাম, তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করলাম। এরপর টাকার বান্ডেল উঠালাম। বলতে পারব না, আমার কী হয়েছিল? আমি জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারলাম না যে, এ কি আনন্দের অশ্রু ছিল, না কি অসহায়ত্বের। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ইনি ছিলেন প্রথম পুরুষ, যিনি আমার দেহের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেননি। তার বাহুর মধ্যে আমি এমন স্বস্তি অনুভব করলাম, যেন তিনি আমাকে জিন, ভূত আর হিংস্র পশুর থাবা থেকে উদ্ধার করে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছেন। আমি অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা বাইরে চলে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে কাশ্মীর পয়েন্টে পৌঁছলাম এবং একটি উঁচু জায়গায় বসলাম। আমার চোখে মারীর সৌন্দর্য ফিরে এসেছিল। বরং পাকিস্তানের এই ভূখণ্ড আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বেশি দৃষ্টিনন্দন মনে হচ্ছিল। আমি তাকে কিছু একটা বললাম; কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না। তিনি কাশ্মীরের সেই পাহাড়গুলো অপলক নেত্রে দেখছিলেন, যেগুলোর চূড়ার উপর সাদা সাদা বরফ জমে ছিল। তার চেহারার ভাবই বদলে গিয়েছিল এবং তিনি কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আমি কিছুক্ষণ তাকে দেখতে থাকলাম। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমি তার পাশে বসে

আছি। আমি তার কাঁধের উপর হাত রাখলাম; তবুও তিনি চিন্তামগ্নই থাকলেন। আমি তার কাঁধের উপর মাথা রাখলাম। তিনি একটি হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরলেন। এর চেয়ে বেশি ভ্রূক্ষেপ তিনি করলেন না।

শেষে আমি তাকে ধাক্কা দিলাম। তখন তিনি চমকে উঠে আমার দিকে দেখলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?'

'কাশ্মীরের ওই পাহাড়গুলোর মধ্যে।'

'সাদা সাদা বরফ নীল আসমানের সাথে খুব ভালো লাগে।' আমি বললাম।

'সাদা নয়।' দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন। এই বরফ মানুষের রক্তে লাল। দূর থেকে সাদা মনে হয়। আমি কাছে গিয়ে ওগুলো দেখব।

'কবে?'

তিনি চমকে উঠলেন এবং বললেন, 'ও পর্যন্ত যাওয়া তো সহজ নয়। এমনিতেই বলছি।'

কিন্তু তার ভাবভঙ্গি বলছিল যে, তিনি আমার কাছ থেকে কোন কথা লুকোচ্ছিলেন, অথবা তিনি যা ভাবছিলেন, তা আমাকে বলতে চাচ্ছিলেন না। বরফঢাকা চূড়াগুলো তিনি কেন তন্ময় হয়ে দেখছিলেন, সেই রহস্য দুই মাস পরে প্রকাশ পেয়েছিল।

এখন আমি বরফ পরিহিত চূড়াগুলো তারই মত করে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকি; কিন্তু কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না, ওই চূড়াগুলো কেন এমন তন্ময় হয়ে দেখছ?

এবং তিনি চলে গেলেন

সে রাতে তিনি আমার কাছে থাকলেন। আমরা শিশুদের মত হাসতে খেলতে থাকলাম। স্বচ্ছ কথাবার্তা বললাম এবং রাতে একই পালঙ্কে ঘুমালাম। সূর্য ওঠার অনেক আগে তিনি জাগ্রত হলেন। আমাকেও জাগালেন। জলদি জলদি প্রস্তুত হয়ে তিনি নাস্তা করলেন। কোন কথা বললেন না। যাওয়ার সময় আমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বুকের সাথে মেলালেন। যদি আমার সাধ্য থাকত, তা হলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। আমরা একজন আরেক জনকে বাহুর মধ্যে আবদ্ধ রাখলাম। তার চোখ থেকে পানি পড়ছিল। এরপর তার বাহুর বন্ধন ঢিলা হতে থাকল; কিন্তু আমার বন্ধন হতে থাকল দৃঢ়। তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে আমার বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন এবং কোনকিছু না বলে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হোটেলের পাহাড় থেকে নীচে নামার রাস্তা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেলাম। চিড় গাছের সারিগুলোতে গিয়ে তিনি থামলেন। পেছন দিকে তাকালেন। আমি হাত নাড়লাম। তিনিও হাত নাড়লেন। এরপর তিনি অশ্রুর আবছায়ার মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম এবং তাকালাম। লম্বা লম্বা গাছের সারি ঠিকই ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন না।

তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছিলাম না। কিন্তু মনকে একথা বলে সান্ত¡না দিলাম যে, আমি সেই লোককে পেয়ে গেছি, যিনি আমাকে ধোঁকা দিবেন না। তিনি পুরোপুরিই ছিলেন আমার ভালোবাসা। রসিকতা করেও তিনি কোন বেহুদা কথা বলেননি। আমার পাশে ঘুমিয়েও তিনি কোন ফালতু আচরণ করেননি। আমি ভবিষ্যতের

ভাবনায় মগ্ন হয়ে গেলাম এবং তার কথা কল্পনা করে মনকে সান্ত¡না দিতে থাকলাম।

কয়েক দিন পর আমার স্যাগ্নারের সংবাদ এল। তিনি আমাকে জলদি যেতে বলছিলেন। আমি জওয়াব দিলাম যে, আরও একমাস এখানেই থাকব। হোটেলের ম্যানেজার আলাদা জোর দিয়ে দিয়ে বলছিলেন, আমি যেন হোটেলেই থাকি এবং চলে না যাই। আমি তাকে জওয়াব দিলাম, আমাকে একটু স্বস্তি নিতে দিন। পরে সিদ্ধান্ত নিব। আমি তাকে মিথ্যা সান্তনা দিলাম যে, আমি এখানেই থাকতে চেষ্টা করব। আমি নির্জনতা থেকে বাঁচার জন্য হোটেলের সম্মিলনে শামিল হতে আরম্ভ করলাম। কিছু কিছু লোক, যাদের মধ্যে বিদেশীও ছিলেন, আমাকে বন্ধু বানাতে চেষ্টা শুরু করলেন। আমি তাদেরকে টলাতে থাকলাম এবং আরও একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল।

আচানক তিনি এসে পড়লেন। আমি কামরায় ছিলাম। অস্থির হয়ে আমরা মিলিত হলাম। শুধু এক রাতের জন্য তিনি এসেছিলেন। নিজের সার্ভিস সম্পর্কে শুধু এটুকু জানালেন যে, মিশনের সময় কাছে এসে পড়েছে। তিনি খুশি ছিলেন। আবেগাচ্ছন্ন হয়ে তিনি আমাকে কাছে টানছিলেন এবং আচানক তার মুড বদলে যাচ্ছিল। রাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই, তা হলে তুমি কী করবে? আমাকে ভুলে যাবে?'

আমি তার জীবনের এই দিকটি নিয়ে কখনও চিন্তাই করিনি। আমি ভাবতে পারতাম না যে, তিনি শহীদ হয়ে যেতে পারেন, বা তার উভয় পা অথবা দুটি বাহু কাটা যেতে পারে, কিংবা তিনি দৃষ্টিশক্তি থেকে মাজুর হয়ে যেতে পারেন। যখন তিনি বললেন, 'যদি আমি মারা যাই' তখন আমি বেসামাল হয়ে তাকে নিজের দুই বাহুর মধ্যে চেপে ধরলাম এবং তার মাথা নিজের বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলাম, যেমন মৃত্যু কোন মায়ের কাছ থেকে তার বাচ্চা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললাম, 'খোদার দোহাই, এমন কথা বোলো না; তুমি মরতে পার না।'

তিনি আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে আলাদা হলেন। আমার চেহারা দুই হাতে ধারণ করে কাছে নিলেন এবং বললেন, 'আমার চোখের দিকে দেখো যীবী!' আমি তার চোখের দিকে তাকালে তিনি বললেন, 'আবেগ থেকে বেরিয়ে আসো। আমি মরতে যাচ্ছি না; তবে বাস্তবতা বাস্তবতাই। সিপাহী আর মৃত্যুর গর্তের মধ্যে বড় বন্ধুত্ব রয়েছে। হতে পারে আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে পারব না; আমার মৃত্যুর সংবাদ পাবে। আবার এও হতে পারে যে, আমি নিজের মিশন পুরা করে হাসতে হাসতে তোমার কাছে এসে পড়ব। তবে একথা তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই যে, পাকিস্তান আমার কাছে প্রাণ চাইলে অস্বীকার করতে পারব না। আমি এই চিন্তা করব না যে, যীবী আমার জন্য অপেক্ষা করছে; আমি মরব না।'

আমি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে নীরব হয়ে গেলাম। তিনি কয়েক বার আমার চোখে চুমু দিলেন এবং আমাকে ধরে শুয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন খুব শক্ত প্রাণের যুবক। দুইচার মিনিটের মধ্যে তিনি গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলেন। আমি জেগে থাকলাম। আস্তে আস্তে আমি তার বাহু থেকে বের হলাম। এত আস্তে, যেন তার চোখ খুলে না যায়। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন। আমি নিজের হাত ছাড়ালাম না। আমি উঠে বসে পড়লাম। কামরার মধ্যে হালকা নীল ডিম লাইট জ্বলছিল। হালকা নীল নীল আলোতে আমি তার চেহারা দেখতে লাগলাম। ঘুমের মধ্যে তাকে একেবারে শিশুর মত মনে হত। আমার বাচ্চা তো একটাই, যাকে আমি জন্ম দিয়েছিলাম; অথচ তার চেহারাও দেখিনি। তার চেহারার উপর শিশুর মত নিষ্পাপতার ছাপ ছিল।

'আমার চোখের দিকে দেখো যীবী!' কামরার মধ্যে আমি তার আওয়াজ শুনতে লাগলাম। 'পাকিস্তান আমার কাছে প্রাণ চাইলে অস্বীকার করতে পারব না।' আমি খুব কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। অন্যথায় আমি তাকে বাহু দিয়ে ধারণ করে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে যাচ্ছিলাম। যদি মাঝখানে পাকিস্তানের নাম না আসত, তা হলে আমি তাকে যেতে দিতাম না। পাকিস্তানের প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল। আমি তো পাকিস্তানকে দেমাগ থেকে নামিয়ে দিয়ে

বসেছিলাম। তিনিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান আমাদের দেশ। হিন্দু আমাদের দুশমন। কয়েক সাগর রক্তের কুরবানী পেশ করে আমরা এই ভূখণ্ড হাসিল করেছি। আমার মাথায় এই তিক্ত খেয়াল অবশ্যই এসেছিল যে, যদি পাকিস্তান এমন নিষ্পাপ জানের নজরানা না চায়, তা হলে কি এই দেশ টিকে থাকবে না? আমি মনে মনে খোদার কাছে অনুনয় করলাম, যদি এই ভূখণ্ডের জন্য একটি প্রাণেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হলে আমার প্রাণ নাও। কিন্তু আমার প্রাণ হয়তো খুব বেশি নাপাক হয়েছিল। এজন্য খোদার কাছে এই প্রাণের কুরবানী মঞ্জুর ছিল না।

আমি তাকে দেখতে থাকলাম। তিনি ঘুমের মধ্যেই আমার হাত মজবুত করে ধরে রাখলেন। তার শৈশব আমার সামনে উপস্থিত হল। আমার চোখে পানি এল। ভাবতে লাগলাম যে, ইনি কত সাজা ভোগ করে জোয়ান হয়েছেন এবং কত পবিত্র মানসিকতা নিয়ে জোয়ান হয়েছেন। তার সহজ-সরল চেহারার উপর ধোঁকাফেরেবের সামান্য আভাসও আমার নজরে পড়ল না। এরপর আমি ভাবতে লাগলাম, তার মিশন কী, যা তিনি আমাকে বলতে চান না। একবার মনে হল, হয়তো চরবৃত্তির জন্য হিন্দুস্তান যাচ্ছেন। তিনি তো আমাকে গুপ্তচর মনে করেছিলেন। এ থেকে আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর এবং তিনি হয়তো হিন্দুস্তান যাবেন। এরপর তার মিশন নিয়ে চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, তিনি কোথায় যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করব না। তার বুকের মধ্যে যে ফৌজী ভেদ লুক্কায়িত আছে, তা আমি তার বুকেই থাকতে দিব।

কতক্ষণ বসে বসে তাকে দেখলাম এবং চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকলাম, তা একটুও মনে নেই। চোখ খুললে দেখলাম আমি তাকে বাহু দিয়ে ধরে আছি এবং তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তখন মনে পড়ে গেল রাতে বৃষ্টি পড়ছিল।... তিনি জেগে উঠলেন। খুবই প্রফুল্ল মুডে ছিলেন। অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল। কেন যে আমার মাথায় একটি প্রশ্ন এল। আমি সেটা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বন্ধুরা হয়তো

জেনে থাকবেন যে, তোমার অতীত জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং তুমি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছ।'

'না।' তিনি জওয়াব দিলেন। 'কেউ জানে না। আমার সাথী অফিসাররা জানেন যে, আমি .... এর অধিবাসী। আমার মা-বাবা আছেন এবং আমি ধনাঢ্য ও নামী-দামী খান্দানের সন্তান। আমাদের সোসাইটিতে একটি অভিশাপ হচ্ছে এই যে, মানসিকতা আর ঈমানের বিচারে নয়; বরং খান্দানের উচ্চতা-নীচুতার বিচারে মানুষকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এজন্য আমি অতীতের জীবন সম্পর্কে কখনও কাউকে অবহিত করিনি।'

দুপুরের আহার সেরে তিনি চলে গেলেন। আর এখনকার আমি অনুভব করি যে, তিনি আমার বুক থেকে হৃদয়টা বের করে নিয়ে গেলেন।

শেষ সাক্ষাৎ

তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, বিশ-পঁচিশ দিন পর আসবেন। আমি এদিক-ওদিক মন বসাতে সচেষ্ট হলাম। বোরকা পরে বাইরে বের হয়ে যেতাম। কখনও সন্ধ্যা কাটাতাম হোটেলের সম্মিলনে এবং কখনও কখনও ম্যানেজারের সাথে গপশপে লিপ্ত হতাম। তিনি আমাকে আমার ক্যাপটেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম। তাকে বললাম না যে, তিনি ক্যাপটেন এবং তার সাথে আমার পবিত্র সম্পর্ক রয়েছে। একদিন আইয়ুব সরকারের অনেক বড় এক কর্মকর্তা আমাকে হোটেলে দেখে ফেললেন। তার ঠোঁটের কোণা খুশিতে নাচতে লাগল। স্মাগ্লিঙের সূত্রে আমি তিনতিন বার তার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি রাতে আমার কামরায় থাকার খাহেশ প্রকাশ করলেন। আমি ভিতরের ব্যথার অজুহাত দিয়ে তাকে সরাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি মানতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন অনুগ্রহের খোটা দেওয়া শুরু করলেন এবং তার প্রস্তাব না রাখার কারণে হুমকি দিয়ে চলে গেলেন।

গরমের মৌসুম ছিল। মারীতে ছিল অফুরন্ত সৌন্দর্য ছিল। সরকারী অফিসার আর রাজনৈতিক নেতারা কয়েক দিনের জন্য মারী আসছিলেন এবং এই হোটেলেই অবস্থান নিচ্ছিলেন। আমি একই অজুহাত পেশ করতাম যে, অভ্যন্তরে ব্যথা রয়েছে এবং চিকিৎসা করার জন্য এসেছি। ডাক্তাররা পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।... এসব লোক এমন বিশ্রীভাবে আমার পিছু নিতেন যে, আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে, এরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পিছু ছাড়বেন না, যতক্ষণ আমার মধ্যে সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকবে। আমার খুশির বিষয়

ছিল এই যে, আমি ক্যাপটেনকে আমার ব্যাপারে সবকিছু বলে দিয়েছিলাম। তাকে ধোঁকার মধ্যে রাখিনি।

বিশ-বাইশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তিনি আচানক এসে পড়লেন। আমি কামরায় অবস্থান করছিলাম। আমি তার সাথে কেমন পাগলের মত মিলিত হলাম, সেই প্রসঙ্গ এখন ছেড়ে দিন। আপনি যদি এমন কোন মাকে দেখে থাকেন, যার ছেলে হারিয়েছে এবং অনেক দিন পর আচানক পাওয়া গেছে, তা হলে আপনি বুঝবেন যে, আমি কেমন জযবার সাথে ক্যাপটেনের সাথে মিলিত হয়ে থাকব। কিন্তু তিনি আমাকে এমন কড়া পরীক্ষায় ফেললেন, যা ছিল আমার সহ্যের বাইরে। আমার জযবা কেঁপে কেঁপে জড়ো হয়ে গেল। আহার শেষ করে তিনি আমাকে পাশে বসালেন এবং বললেন, 'যীবী! ১৯৪৭'এর আগস্টের কথা স্মরণ করো। ইন্ডিয়া থেকে নিজের হিজরতের কাহিনী মনে করো।' নীরব হয়ে গেলেন তিনি। তার কণ্ঠ আর ভাব আমাকে চমকে দিল। আমি কিছুই বললাম না। তিনি বললেন, 'আমার চোখের দিকে দেখো।' আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।

'আমি সেই মাসুম শহীদদের খুনের বদলা নিতে যাচ্ছি, যাদেরকে ১৯৪৭ এ হিন্দু আর শিখরা শহীদ করেছিল।' অত্যন্ত নির্মল কণ্ঠে তিনি বললেন। 'একজন সৈনিক হিসেবে একদম বলা উচিত নয় যে, আমি কোথায় যাচ্ছি; কিন্তু তুমি আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছ, তার দাবি হচ্ছে তোমাকে অন্ধকারে না রাখা...। আমি কমান্ডো এবং আমি অধিকৃত কাশ্মীরে যাচ্ছি।'

তখন আমার মনে পড়ে গেল যে, কয়েক দিন থেকে সংবাদপত্রগুলোতে খবর আসছে, অধিকৃত কাশ্মীরে রহস্যময় অভিযানের ধারা শুরু হয়েছে। হিন্দুস্তান পাকিস্তানের উপর অভিযোগ আরোপ করছে যে, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো ও গরিলা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যারা ওখানে সেতু, গোলাবারুদের ভাণ্ডার ও সেনানিবাস ধ্বংস করছে। আমি একদিন অলইন্ডিয়ার খবরও শুনেছিলাম। তাতেও হিন্দুস্তান এ-ই মাতম করছিল যে, পাকিস্তানের

অনুপ্রবেশকারীরা অধিকৃত কাশ্মীরে চোরের মত গোপনে ঢুকে পড়েছে। আমি ক্যাপটেনকে নিয়ে খুব বেশি মগ্ন ছিলাম। এজন্য তাকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি যে, এ কেমন অভিযান। এখন তিনি বললেন যে, তিনি কমান্ডো এবং কাশ্মীর যাচ্ছেন। সুতরাং সব খবর আমার মাথায় তাজা হয়ে গেল।

'বহু দিন থেকে আমি এই মিশনের অপেক্ষায় ছিলাম।' তিনি বললেন। 'এখন অপেক্ষা শেষ। আমি আগামী কাল যাচ্ছি।'

'আমার অপেক্ষা কবে শেষ হবে?' আমি পাগলামীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'জলদি।' তিনি বললেন। 'আমি এসে পড়ব, অথবা আমার সংবাদ এসে পড়বে।' তিনি একজন মেজরের নাম বললেন, যার নাম আমি আপনাকে বলব না। তিনি বললেন, 'এই মেজর তোমাকে আমার সংবাদ অথবা পয়গাম দেওয়ার জন্য নিজে আসবেন।'

আমি তাকে অনেক বার জিজ্ঞেস করলাম, তার মিশন কী? তিনি কীভাবে অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করবেন এবং কীভাবে ফিরে আসবেন? কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর শুধু এটুকু দিলেন যে, 'আমি বলতে পারব না।' এরপর আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না। আমি আবেগী কথাবার্তা বলতে লাগলাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে আবেগাচ্ছন্ন কোরো না। আসো, আমরা বাস্তবতা নিয়ে কথা বলি।' আমার দু চোখ থেকে অশ্রু ছাপিয়ে পড়ছিল, যা তিনি হাস্যরসের কথা বলে বলে থামিয়ে দিচ্ছিলেন। শেষে তিনিও আবেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার আবেগের মধ্যেও সত্যের রং ছিল। তিনি নিজের অতীত জীবনের দুঃখকষ্ট স্মরণ করলেন এবং আমার শোকর আদায় করলেন। কেননা, (তার ভাষায়) আমি তাকে সেই ভালোবাসা দিয়েছি, যার তৃষ্ণা তার হৃদয় ভস্ম করে ফেলেছিল।... তার এমন কথাবার্তা আমাকে বেসামাল করে দিল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলাম।

সন্ধ্যা ছয়টা বাজছিল। তখন তিনি নিজেকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন এবং বিদায় হতে লাগলেন। আমি বোরকা পরিধান করলাম

এবং তার সাথে বের হলাম। আমি আস্তে হাঁটতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি প্রায় দৌড়াচ্ছিলেন। আমি একবার তার বাজু ধরে বললাম, 'একটু আস্তে চলো।' তিনি হেসে বললেন, 'খাকী উদীর সাথে যখন দিল লাগিয়েছ, তখন দৌড়ের প্রাক্টিস করো। আমরা সেখানে পৌঁছলাম, যেখানে গিয়ে শুধু বললেন, 'খোদা হাফেয।'

থামলেন না তিনি। আমার দিকে দেখলনেও না। আমার উত্তরের অপেক্ষাও করলেন না। ঢালু থেকে এত দ্রুত নামলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেলেন। তিনি হয়তো দৌড়াচ্ছিলেন, যাতে আমার চোখের পানি তার মিশনকে ব্যর্থ করে না দেয়। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কয়েক মিনিট পর চিড় গাছের সারির মধ্য দিয়ে তাকে অতিবাহিত হতে দেখলাম। তিনি থামলেন। আমার দিকে দেখলেন। হাত উপরে তুলে নাড়লেন। এরপর সামনে চললেন এবং বাড়ির আড়ালে গিয়ে আমার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেলেন। আমি সেখানেই দাড়িয়ে থাকলাম। সূর্য ডুবে গেল। চিড় গাছের সারি এবং মারীর সবুজ পরিবেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ওই দিনের পর আমার জীবনের প্রত্যেকটি দিন কাশ্মীর পয়েন্টের একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে বসে বসে এবং কাশ্মীরের বরফঢাকা চূড়া দেখে দেখে অতিবাহিত হতে লাগল। উদাস হয়ে গেল আমার সন্ধ্যা। বিরান হয়ে গেল রাত। আমি সবসময় তার নিরাপত্তার জন্য দোআ করতে লাগলাম। কামরার মধ্যে আমার অবস্থা হয়ে গেল এই যে, বাইরে কারও পায়ের আওয়াজ শুনলে আমার ক্যাপটেন আসছেন, এই আশা না করে মনে করতাম যে, সেই মেজর আসছেন, তিনি যার গায়েবী পরিচয় করিয়ে গেছেন। পায়ের এসব আওয়াজ আমাকে ভয় ধরিয়ে দিত। ধুকপুক করতে থাকত অন্তর। কেন যেন আমার মনে খটকা লাগছিল যে, ক্যাপটেনের পরিবর্তে মেজর আসবেন এবং তিনি কোন ভালো সংবাদ আনবেন না। (আগস্ট ১৯৬৫) সেই দিনগুলোতে হিন্দুস্তানের কিছু খবরের কাগজও এখানে আসত। সেগুলোর মধ্যে ইংরেজী খবর 'স্টেট্সমেন' এই হোটেলে আসত। আমি এই পত্রিকা

নিয়মিত দেখা শুরু করলাম। তাতে আমাদের কমান্ডোর তৎপরতার খবর প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় আযাদ কাশ্মীর বা পাকিস্তান আর্মির এক ক্যাপটেন ও তিন কমান্ডো জোয়ানের ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকৃত কাশ্মীরে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের চোখে ছিল পট্টি আর হাতে ছিল হাতকড়া।

সেই ক্যাপটেনের ছবি দেখে আমি নিজের ক্যাপটেনের ছবির মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

আমার মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছিল। কেননা, আমার ক্যাপটেনের প্রতি যতটা ভালোবাসা ছিল, ততটাই প্রিয় হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান। উভয়ের নিরাপত্তার জন্য আমি দোআ করছিলাম। আমি কখনও ভাবতাম না যে, পাকিস্তানকে নিজের ক্যাপটেনের উপর কুরবান করে দিব।

ক্যাপটেনের খবর নিয়ে এলেন মেজর

শেষে একদিন পায়ের সেই আওয়াজ, যা আমি প্রতিদিন শুনতাম এবং যা আমার দরজা ছাড়িয়ে যেত, আমার দরজায় এসে থেমে গেল। দরজায় হালকা কড়া নাড়বার শব্দ হল। আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সুদৃঢ় দেহের এক মেজর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। উর্দী পরিহিত ছিলেন তিনি। ক্ষীণ আওয়াজে তিনি বললেন, 'যীবী?'

'জি!' আমি বললাম। 'বলুন। আপনি তার কোন খবর এনে থাকবেন?'

তিনি দৃঢ়পদে হেঁটে কামরায় প্রবেশ করলেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। বললাম, 'বসুন।' তিনি বসলেন না। আমার দিকে ফিরলেন। তার চোখ ছিল শুষ্ক। তার চেহারায় কোন উদাসভাব ছিল না। তার চেহারায় সেই গাম্ভীর্য আর রওনক ছিল, যা সৈনিকদের চেহারায় থাকে। তারপরও তার চেহারায় এমন প্রতিক্রিয়া ছিল, যা লেখার মত স্পষ্ট ছিল। তিনি আমার দিকে দেখলেন এবং নীরব থাকলেন। আমি নিজের দেহের মধ্যে ভূমিকম্পের ঝটকা অনুভব করলাম। আমি দ্রুত সামনে এসে তার বাহু ধরলাম। সবরের আঁচল ছুটে গেল। আমি তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে পাগলামীর কণ্ঠে বললাম, 'বলে দাও, তিনি শহীদ হয়েছেন। বলে দাও মেজর! আমি এই খবর শোনার জন্য প্রস্তুত আছি।'

তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন এবং বললেন, 'তার শেষ পয়গাম হচ্ছে এই যে, যীবীকে বলবে, সে যেন না কাঁদে।'

'কাঁদব না।' আমি মাথা ঝটকা দিয়ে বললাম, 'কাঁদব না।' এরপর আমার চিৎকার বেরিয়ে পড়ল। নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। তিনি আমাকে চুপ করাতে চেষ্টা করলেন না। বলতে পারব না, আমি কতক্ষণ পর্যন্ত ফোঁপাচ্ছিলাম। তিনি জানালার সামনে আমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

'লাশ কোথায়?' অনেক পরে সামলে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কমান্ডোর লাশ পাওয়া যায় না।' তিনি আমার দিকে ফিরে গাম্ভীর্যের সাথে বললেন। 'তারা সোজা খোদার কাছে চলে যান।' আস্তে আস্তে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তার বয়স ত্রিশ বছরের চেয়ে কম মনে হচ্ছিল। জোয়ান মানুষ ছিলেন। বলতে লাগলেন, আমিও কারও কিছু লাগি। এখন আমার পালা। যদি আমাদের মায়েরা, বোনেরা, মেয়েরা, স্ত্রীরা, বাপ, ভাই ও ছেলেরা আমাদের শাহাদতের খবর শুনে কাঁদতে বসে পড়ে, তা হলে একদিন কওমের কাছে কান্না ছাড়া কিছুই থাকবে না। তুমি কি এমন কওম পছন্দ করবে, যারা হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে।' কথাগুলো তিনি খুব ক্রিয়াশীল কণ্ঠে বলতে থাকলেন, যা আমার হৃদয়ের ব্যথা কমিয়ে দিল।

তিনি জানালেন, আমার ক্যাপটেন দশ জোয়ানের একটি দল নিয়ে অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। তার মিশন ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের মধ্য থেকে কারও ফিরে আসার আশা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত টার্গেটের কাছাকাছি যাওয়ার পর দুশমনের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং তারা ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। জোয়ানরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দুশমনকে বিক্ষিপ্ত করে দেন এবং ক্যাপটেন এক জোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে টার্গেটে পৌঁছে যান। তিনি মিশন পুরা করেন। দুশমন তাকে দেখছিল। জানা নেই যে, কত অস্ত্রের নল ওই দুই জনের দিকে তাক হয় এবং তারা টার্গেটের সাথেই উড়ে যান। মেজর জানালেন, এই দলের মাত্র একজন জোয়ান ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, হয়তো আরও এক জোয়ান বের হয়েছিল; কিন্তু তিনি কোনদিকে পালিয়ে গেছেন।

'আপনি আমাকে সেই জোয়ানের সাথে মেলাতে পারবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না।'

'আমি তার কাছে ক্যাপটেনের শেষ সময়ের কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' আমি বললাম। 'তিনি কেমন বীরত্বের সাথে শহীদ হয়েছেন, সেকথা আমি বিস্তারিত জানলে হয়তো আমার দুঃখ গর্বে বদলে যাবে।'

'ফৌজী বিধান অনুমোদন করে না।' তিনি বললেন। 'সেই বিবরণ তো আমিই আপনাকে শোনাতে পারি; কিন্তু শোনাব না। আমি আপনাকে কখনই বলব না যে, তার মিশন কী ছিল, টার্গেট কোথায় ছিল, সেখানে দল নিয়ে তিনি কীভাবে পৌঁছেন এবং ঘেরাওয়ে পড়ে যাওয়ার পরও তিনি কেমন বুদ্ধিমত্তার সাথে লড়েন যে, মিশন পরিপূর্ণ হয়ে যায়।... এই জোয়ানের সাথে আপনি কখনই মিলতে পারবেন না। শেষ কথা, তিনি একজন সিপাহী। আবেগে পড়ে হয়তো এমন কথা বলে বসবেন, যা কোন সৈনিকের হৃদয়ের বাইরে আসা উচিত নয়।... বীবী! বুঝতে চেষ্টা করুন।' তিনি পাতলুনের পকেটে হাত দিলেন এবং ভাঁজকরা একটি কাগজ আমাকে দিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে তার শেষ পয়গাম।'

আমি কাগজ খুলে পড়লাম। (পত্রটির ফটোকপি দেখুন।) মেজর বললেন, 'এই পত্রও একটি কাহিনী। যেই জোয়ান ফিরে এসেছেন, তিনি জানিয়েছেন যে, ক্যাপটেন এই পত্র টার্গেটের সামান্য দূরে বসে লিখেছিলেন। এটা হামলার রাতের কয়েক ঘণ্টা আগে লিখিত। পত্র লিখে ক্যাপটেন তার দলকে বলেছিলেন, আমি শহীদ হয়ে গেলে এই পত্রটি আমার পকেট থেকে বের করে মেজর সাহেবকে দিয়ে দিবে। যখন দল টার্গেটের দিকে এগিয়ে যায়, তখন দুশমনের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যায়। এই জোয়ান ক্যাপটেনের কাছেই ছিল। ক্যাপটেন পত্রটি হাবিলদারকে দেন এবং বলেন, আমি সামনে যাচ্ছি, দলের নেতৃত্ব নিয়ে নিন। ক্যাপটেন সামান্য এগিয়েছেন মাত্র, তখন গুলি

এসে হাবিলদারের গর্দান ভেদ করে বের হয়ে যায়। পত্র তার হাতেই ছিল। সেটা এই জোয়ান নিয়ে নেয় এবং তার কাছেই থেকে যায়।'

কিছুক্ষণ পর মেজর চলে গেলেন। আমি এই পত্র শত বার পড়ার চেষ্টা করেছি। শুধু এক ছতর পড়তে পড়তেই বাকি পত্র অশ্রুর আঁধারে হারিয়ে যায়। খোশবু মেখে পত্রটি এটাচ্‌ড কেসে রেখে দিয়েছি। আমার সারা জীবনের অর্জন এই কয়েকটি শব্দ, যা ভালোবাসার এক পিপাসু শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমার উদ্দেশে লিখেছিলেন। মেজর চলে গেলে চিন্তা-ভাবনা আর জল্পনা-কল্পনা আমার মস্তিষ্কের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অন্ধ চামচিকার মত আক্রমণ করল। সেই চিন্তা আর কল্পনাগুলো আমার মস্তিষ্কে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন এগুলো বিষাক্ত চিতায় পরিণত হয়েছে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, জাতির কত ভালো ভালো যুবক, কত ভালো ভালো মেয়ের তামান্না, আরজু, ভালোবাসা এবং কত সোহাগ ও বাগদান কাশ্মীর ও পাকিস্তানের উপর কুরবান হয়েছে। কেন? কেন? শুধু এজন্য যে, দুশমন আমাদের দেশের অর্ধেক ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই মেজরকে পরে আর কখনও দেখিনি। আজ পর্যন্ত কোনদিন নজরে পড়েনি। তিনি বলছিলেন যে, এখন তার পালা। হয়তো তিনিও আমার শহীদ ক্যাপটেনের পেছনে পেছনে চলে গিয়ে থাকবেন। কখনও ফিরে না আসার জন্য।

তবে আমার লিডারদের কাছে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার নেই। কেননা, আমি পতিতা। সমাজে আমার কোন স্থান নেই। কিন্তু এই এক শহীদের কথা মনে করে কাঁদলে কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না, যিনি আমার ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করে বজ্র হয়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার শাহাদতের খবর পাওয়ার পর আমার যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল, সেটা সংক্ষিপ্ত কথায় এভাবে বর্ণনা করতে পারি যে, আমি মেন্টাল কেইসে পরিণত হয়েছিলাম। কখনও কখনও আমি নিজেও চাইতাম যে, আমাকে পাগলাগারদে বন্দী করা হোক। এমন অবস্থা ছিল একমাস। তারপর আমি চিন্তা করার উপযুক্ত হই এবং বাস্তবতা সামনে রাখতে শুরু করি। শাদীর প্রশ্নই

উঠতে পারত না। আমার কাছে যথেষ্ট পয়সা ছিল। আমি একদিন হোটেলের ম্যানেজারকে জানালাম, তিনি তো আমাকে এই আশায় হোটেলে মুফ্‌ত রেখেছেন যে, আমি স্মাগ্লারদের সম্পর্ক ছিন্ন করে তার কাছে এসে পড়ব। কিন্তু আমি এখন কোনও কাজেই আসতে পারব না। তিনি যেন এখন আমার কাছ থেকে হোটেলের বিল উসুল করতে শুরু করেন।

হোটেলের ম্যানেজার ভালো মানুষ ছিলেন। যিনি আমার সাথে দেখা করতে আসতেন, তিনি কে ছিলেন এবং তিনি শহীদ হয়ে গেছেন, সে কথা আমি ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে অনুগত করতে অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু আমি মানলাম না। আমি যখন ইচ্ছা করলাম যে, সম্মানজনক কোন জীবনোকরণ অনুসন্ধান করব, তখন পেছনের সব অভিজ্ঞতা সামনে এসে পড়ল। তার সাথে আরও একটি বাস্তব সত্য সামনে এল। আমার আশা-আকাক্সক্ষার উপর পানি পড়ল এবং ভবিষ্যতের উপর অন্ধকার ছেয়ে গেল। কেননা, আমার স্মাগ্লার বাদশা কয়েক বার ফিরে যাওয়ার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমি ভাঁড়াচ্ছিলাম। একদিন তিনি এলেন এবং বললেন, 'তুমি এই হোটেলের জীবন কেন পছন্দ করছ, আমাকে পরিষ্কার জওয়াব দাও।'

আমি তাকে জওয়াব দিলাম এবং আমি কোন্ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি, সেকথা আমি তাকে জানালাম। আমি তাকে এও জানালাম যে, আমি মানসিকভাবে বেকার হয়ে গেছি। এজন্য এখন আমি তার কাজে আসতে পারব না। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে কাঁদলাম। তিনি বুঝলেন যে, প্রকৃতপক্ষেই আমি এখন তার কাজের উপযুক্ত নই। তার তো তেজস্বী ও হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে দরকার ছিল। কিন্তু তার সমস্যা একটা দেখা দিল। তার অনেক ভেদ আমার বুকের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। এ ধরণের স্মাগ্লারদের সংবিধান হচ্ছে তাদের কোন সাথী কোন ভেদতত্ত্ব নিয়ে পালায়ন করলে তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়। আমার পরিণতিও এমনই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আমার উপর

আস্থাশীল ছিলেন। তবে এতটুকু বলে গেলেন, যদি আমি তাকে ধোঁকা দিই, তা হলে আমাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হবে না।

আমি পতিতাবৃত্তির পেশা থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম; কিন্তু খুব দ্রুত আমাকে ধারণা দেওয়া হল যে, আমি শুধু স্বপ্ন দেখছি। সেইসব অফিসার, যাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছিলেন; কিন্তু আমি তাদেরকে অসুখের বাহানা করে ভাঁড়াচ্ছিলাম। তারা আমাকে ফাঁসাতে লাগলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন একদিন আমার কামরায় ঢুকে পড়লেন। আমি তাকে ক্যাপটেন শহীদ সম্পর্কে বললাম এবং কেঁদে কেঁদে তার কাছে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করলাম যে, শহীদের ভালোবাসা আমি নাপাক হতে দিব না। কিন্তু আমার কান্না তার উপর কোন প্রভাব ফেলল না। তার কামুক দৃষ্টির মধ্যে শহীদের কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি যখন বললেন, 'শহীদ কেমনে? সে ছিল কওমের চাকুরে। বেতন পেত। ডিউটি পালন করতে গিয়েছিল এবং মারা গেছে। কথা শেষ হয়ে গেছে।' তখন আমি ডাইনির মত তার গলাবন্ধ ধরে ফেললাম। মুখে যা এল বকে দিলাম। কিন্তু তিনি হাসতে থাকলেন এবং আমি যখন নীরব হলাম, তখন তিনি বললেন, আজকাল কারও দিকে ইশারা করে যদি বলে দিই যে, এ হচ্ছে গুপ্তচর, তা হলে বিনা মোকদ্দমায় তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমি যেকোন সময় তোমাকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচরের অপবাদ দিয়ে বন্দী করিয়ে দিতে পারি। চিন্তা করো।' একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

পরের দিন শুধু তার নয়; বরং আরও দু'জনের হুমকি এল। আমার মানসিক অবস্থা আগেই বিগড়ে গিয়েছিল। তারা আমাকে একেবারে পাগল করে দিল। এই পাগলপন অবস্থায় আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমার কামরায় ডেকে নিয়ে বললাম, 'আমি উন্নত মানের পতিতা। আমি কোন স্মাগ্লারের দেওয়া উৎকোচ নই। আমার ফিস হচ্ছে এই। আগে পরিশোধ করো।'

আমাকে এমন জালে ফাঁসানো হয়েছিল, যা থেকে আমি বের হতে পারছিলাম না। আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি না যে, আমি এদিক

থেকে পালিয়ে কোথায় গেলাম এবং ওদিক থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়ে দম নিলাম। আমি সেই জাল থেকে বের হওয়ার জন্য হাতপা অনেক ছুড়লাম; কিন্তু ছিলাম একা। ছোট্ট একটি মাছ, যাকে খাওয়ার জন্য বড় বড় মাছে সাগর ভরা ছিল। আমি এমনভাবে ডুবেছিলাম যে, উঠতে পারলাম না। এখন তো আমি উঠতে চাইও না। উচ্ছ্বাস মারা গেছে; ইচ্ছা মারা গেছে; আমার শহীদের বীবী মারা গেছে। এক পতিতা বেঁচে আছে, যার ভাইও তার খদ্দের হয়ে আসে এবং যার বাপও তার খদ্দের হয়ে আসে।

আমি কারও বোন নই।

আমি কারও মেয়ে নই।

শহীদের পত্র

আমার যীবী!

ভালোবাসা ও সালাম গ্রহণ করো। দুশমনের মাথার উপর বসে তোমাকে এই শেষ কথাগুলো লিখছি। আমার জোয়ানদেরকে বলেছি, আমি শহীদ হয়ে গেলে এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছে দিতে। জানি না, তোমার কাছে আমার শেষ শব্দগুলো পৌঁছবে কি না। আমি একজন সৈনিক। আমার কাছে শব্দের ঝঙ্কার নেই। সাদাসিধা কথা বলব। একে ভালো করে বুঝে নিয়ো। একেবারেই কাঁদবে না। শেষ সময়ে খোদাকে স্মরণ করছি, না কি তোমাকে। একটু পরেই আমার জোয়ানদেরকে নিয়ে দুশমনের উপর বজ্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। অধিকৃত কাশ্মীরে এমন শোরগোল হবে, যা দিল্লীতেও শোনা যাবে। আমি এই মিশনের জন্য জীবিত ছিলাম। তোমার জন্য জীবিত থাকতে চেষ্টা করব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে নিজের মিশন তোমার চেয়েও অধিক প্রিয়। আমি ফিরে না এলে আমার জন্য কাঁদবে না এবং আমাকে ভুলে যাবে। নিজেকে আমার স্মৃতি থেকে আযাদ করে নিবে। কারও সাথে বিয়ে করে নিলে অনেক ভালো হবে।

আমি অবশ্যই নিজের মিশনে কামিয়াব হব। তোমার ভালোবাসা আমাকে অনেক সাহস দিয়েছে। কাশ্মীরে যখন আমার রক্ত প্রবাহিত হবে, তখন তাতে তোমার ভালোবাসার খোশবু থাকবে। এটাই বুঝে নাও যে, তুমি নিজের ভালোবাসা কাশ্মীরের উপর কুরবান করে দিয়েছ।

খোদা হাফেয যীবী!
শুধু তোমার

....

میری زیبی

میری محبت اور میرا سلام قبول کرو۔ دشمن کے سر پر بیٹھ کر تمہیں
یہ آخری کاغذ لکھ رہا ہوں۔ اپنے جوانوں سے کہہ دیا ہے کہ میں شہید
ہو جاؤں تو یہ خط تم تک پہنچا دیں۔ معلوم نہیں تم تک میرے
آخری الفاظ پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ میں خوش ہوں۔ میرے پاس
الفاظ نہیں ہیں۔ سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ اس کو اچھی طرح
سمجھ لینا۔ ورنہ بالکل نہیں۔ آخری وقت دل میں خدا کی یاد
ہے یا تمہاری یاد ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے جوانوں کے ساتھ
دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ عنقریب کشمیر میں ایسا دھماکہ ہوگا
جو دلی میں دلی والوں کو ہلا دے گا۔ میں اس مشن کے لیے زندہ تھا۔
تمہارے لیے زندہ رہنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس وقت اپنا مشن
تم سے زیادہ پیارا ہے۔ میں واپس نہیں آیا تو رونا نہیں
اور مجھے بھول جانا۔ اپنے آپ کو میری یاد سے آزاد کر لینا۔
کسی کے ساتھ شادی کر لو تو بہت اچھا ہوگا۔

میں مشن میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ تمہارے پیار نے مجھے
بہت حوصلہ دیا ہے۔ کشمیر میں جب میرا خون بہے گا تو اس میں تمہارے
پیار کی خوشبو ہوگی۔ یہی سمجھ لو کہ تم نے اپنی محبت کشمیر پر قربان
کر دی ہے۔

خدا حافظ زیبی

صرف تمہارا

লেখক পরিচিতি

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশের জন্ম ১৯২০ সালের পহেলা নভেম্বর। জন্মস্থান পাঞ্জাবের গুজারখান। ১৯৩৬ সালে মেট্রিক পাশ করেই তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে চাকুরি নেন। চাকুরির সুবাদে বার্মা যান জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে। ১৯৪৪ সালে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়ে যান। কিন্তু বন্দীশালা থেকে পালাতে সক্ষম হন। এরপর বার্মার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান দুই বছর। পরে ফিরে আসেন নিজ দেশে। আবার ঢোকেন সেনাবাহিনীতে। চলে যান মালেশিয়ায়। মালেশিয়ানদের স্বাধীনতার স্পৃহা দেখে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চাকুরি ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনতাকামীদের দলে যোগদান করেন। ইংরেজরা ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তিনি ১৯৪৮ 'এ দেশে ফিরে আসেন এবং পাকিস্তান এয়ারফোর্সে ভর্তি হন।

বিমানবাহিনীর চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি হাতে কলম ধারণ করেন এবং মাসিক সাইয়ারা ডাইজেস্টে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাহিনী লিখতে শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন কাহিনী লিখে তিনি রাতারাতি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষত ১৯৬৫ 'এর সময়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি বই লিখে খ্যাতির চূড়ায় আরোহন করেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করেন মাসিক হেকায়েত। তার দক্ষ সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রটি ৭০ ও ৮০ 'এর দশকে উর্দু ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রে পরিণত হয়।

নিজের নাম ছাড়াও বিভিন্ন ছদ্ম নামে এনায়েতুল্লাহ সংবাদপত্রে লিখতেন। যেমন, আলতামাশ, ওয়াক্কাস, মাহদী খাঁ, গুমনাম খাতুন, মিম আলিফ, আহমাদ ইয়ারখান, সাবের হোসাইন রাজপুত ইত্যাদি। ঐতিহাসিক উপন্যাস, যুদ্ধকাহিনী, আত্মকাহিনী ইত্যাদি ছিল এনায়েতুল্লাহর প্রিয় বিষয়বস্তু। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় ১০০।

১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর উর্দুর ভাষার এই সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরে তাঁকে দাফন করা হয়।